পূর্বভাষ

গতবছর 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় আমার সম্পাদনায় 'কমলকুমার মজুমদারের দুর্লভ রচনা' এই শিরোনামে তাঁর কিছু অগ্রন্থিত লেখা ছাপা হয়। সে-সব সংগ্রহ রইল এখানে।

এ ছাড়াও সংগৃহীত হ'লো বিভিন্ন সাময়িকীর পৃষ্ঠা থেকে কয়েকটি গল্প আর প্রবন্ধ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রইল ব্যক্তি ও লেখক কমলকুমার মজুমদার বিষয়ে অন্যান্যদের কয়েকটি রচনা।

সুব্রত রুদ্র

সূচিপত্র

কমলকুমার মজুমদারের রচনা

গল্প

প্রবন্ধ

একটি চিত্রনাট্যের খসড়া

অন্যান্যদের রচনা ও স্মৃতিকথা

কমলকুমার মজুমদারের রচনা

মাধবায় নমঃ তারা ব্রহ্মময়ী মাগো, জয় রামকৃষ্ণ! ঠাকুর করুন, যাহাতে আমরা অতীব গ্রাম্য—আমাদের নিজস্ব জীবনের ঘটনা সরলভাবে লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি; ইহা ১৯৩০ এর আগেকার সময়ের কথা। ইহার স্থান, কলিকাতার দক্ষিণে ২৪ পরগণা অঞ্চলে, ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের দক্ষিণভাগের যে তিনটি শাখা বিস্তৃত, তাহারই একটির, সর্বশেষ ইষ্টিশানের কিছু মাইল দূরে অবস্থিত।

বালকটি অটল রহিয়াছিল; এই সময়তে সে গাত্রস্থিত সার্টটিকে আপন দেহেতে যথাযথ ভাবে বসাইয়া লইতে বিবিধ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা চেষ্টা করিতে আছিল; তৎসহ সে দেখিতেছিল, ঐ সুবিশাল ফাঁকা জমি, কোথাও গ্রাম, পথ, বৃক্ষ, উড়ন্ত পাখীসকল, এ সমস্ত কিছু তাহার দেহ মধ্যে ছিল আর সে বিশেষ উত্যক্ত হওয়াতে ঐ সবকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে—কোথাও তাহার ঘাম, কোথাও তাহার গাত্রগন্ধ এখনও লাগিয়া আছে—অধুনা সে এই চরাচরের সহিত কোন সম্পর্ক আর রাখে নাই।

ঐ লোকটি দুই হাতে লম্বাটে দুইটি কাপড়ের থলি লইয়া, বেসামাল পদক্ষেপে, কখনও হাঁপাইতে থাকিয়া, থপথপ করিয়া আসিতেছে সঙ্গে ঐ মেয়েটি এখন উহার ডাহিনে পরক্ষণেই বামে ছোটাছুটি করিতেছিল। বালকটির এতটুকু মায়া হয় নাই বরং ঐ দৃশ্যকে মহা তামাসার বলি বোধ হয়! আশ্চর্য ইহার কারণে সে নিজেরে ধিক্কার পর্যন্ত দেয় নাই। একবারও মনে করে নাই ঐ লোকটি কে? এরূপ বিজাতীয় ঘৃণায় তদীয় স্বাভাবিক বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে।

বরং মা যদি যাহা সে দেখিতেছে তাহা প্রত্যক্ষিত তাহা হইলে, কুরুক্ষেত্র বাধাইতো, যদি মা ইহা শোনে, তবে নিশ্চয় বলিত, তুই উহাদের ফেলিয়া চলিয়া আসিলি না কেন? এখন মা যেটুকু শুনিয়াছে তাহাতে এখনও শেলসম নিষ্ঠুর বচন সকল উচ্চারিতেছিল, তোমাকে কি ঠাকুর গরু ভেড়ার বুদ্ধিও দেন নাই, ফাঁসির আসামীও রয়ে বসে খায়, নোলা তোমার সুকসুক করিতেছিল, হঠাৎ ইহার পরেই তিক্তিক্ষি কর্কশস্বরে—কেন না বাবা কি যেন

বলিল—ঝাঁঝিয়া জবাব দিল, মরে যাই! তিনি তোমায় সাতজন্ম পেটে ধরিয়াছিলেন, ছাড়! উহারা বলিল আর তুমি গিলিতে বসিলে, তোমার লজ্জা করিল না, তুমি না বল, গীতায় ভগবান বলিয়াছেন পরিমিত আহার! তোমার গীতা পড়ার মুখে ঝাড়ু। মনে পড়িল না যে আমার একটা মান মর্যাদা আছে! ছাঁদা বহিলে।

বাবা স্নান করিবার পর এখন একটু ভাল, গম্ভীরভাবে তক্তাপোষে বসিয়া আছে; বোন শুইয়া ছিল। বালক মায়ের গঞ্জনা শুনিতেছিল। এই সময়ে বাবা মৃদু স্বরে কহিল, নে শুইয়া পড় তুই! হঠাৎ মেয়েটি কহিল, মা ঢের হইয়াছে এইবার উঠ! উঠ!

ক্রমাগত মায়ের খেদোক্তি ঝিঁঝি রবের সহিত মিলিত হইয়া এক বড় করুণ ধ্বনি সূচিত হইতে আছে। একটি শব্দ বারংবার শ্রুত হয় যে আমরা গরীব! এবং বালক প্রতিজ্ঞা করিল, বড়লোক হইতেই হইবে, এবং সে অঙ্গুলি মটকাইল। প্রতিজ্ঞা করিল; কিন্তু সেই সাবরেজিস্ট্রী অফিসের কর্মচারী পুত্র বলিয়াছিল, তোমার ব্যারিস্টার হওয়া ঠিক নয়, আমাদের ডাক্তার হওয়া উচিত ইহাতে দেশের উপকার! ইহাতে ধন্দ লাগিল! অবশ্য ডাক্তারীতে পয়সা আছে। মাকে টায়রা সে কিনিয়া দিবে তৎসহ বোম্বাই বেঁকি চুড়ী— ইহাই চমৎকার। এবং সে সর্বসময় দিনের আতঙ্কদায়ী ঘটনা ঠেকাইতে বহু কিছু ভাবিতে চাহিল।

লোকটি গায়ে আর কোট পর্যন্ত রাখিতে অস্থির হইল. ইতঃপূর্বে সে উড়নি লইয়া ঠিক এমনই আতান্তরে পড়িয়াছিল, উড়নি লইয়া কি যে করিবে তাহা বুদ্ধিতে কুলায় নাই; অবশেষে অল্পবয়সী কন্যা যাহার মুখে শ্রী হাস্যকর কিম্ভূত—চোখের কাজল এখানে সেখানে. পানের দাগ দুই কষময়, পিক্ বেসামালে ফ্রকে, কহিল, আমারে দাও!

লোকটি তৎক্ষণাৎ নালিশের ছাঁদে স্বীয় মনঃক্ষোভ প্রকাশিল, দেখ হতচ্ছাড়া দেখ, ছোট বোনকে দেখিয়া শিক্ষা কর। নির্লজ্জ বেহায়া! ভাবিয়াছে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছি ত আর কি, আমার দায় দায়িত্ব আর নাই, সব ঋণ কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিলাম! এই পর্যন্ত বেচারী মহা শ্বাসকষ্টের সহিত ভাঙা শব্দক্রমে উচ্চারিল।

ও বাবা তুমি কেমন করিতেছ…ছাঁদাটা…এই দাদা! মরণ দশা! ধরনা!

না না, তোমার দাদা কেন লইবে! তিনি লইলে তাঁহার মান যাইবেক!

এই পর্যন্ত কোন রকমে অভিনেতার ভঙ্গিতে বলিয়া লোকটি, বেশ বুঝাইল যে, শ্বাস কষ্টে চলিবার শক্তি হারাইল, ইহারই মধ্যে একবার কাতর দৃষ্টিতে আপন পুত্রকে দেখিতে কালে কন্যাকে বিশেষ আর্ত কণ্ঠে কহিল, একটু জল আনিতে পারিবি, মুখে চোখে দিব। কিসে করিয়া আনিবি মা!

কেন কচু পাতায়। বাবা তুমি কথা বলিও না, এই দাদা লজ্জা করিতেছে না তোর! ছোট লোক।

বালকটি রাগে অপমানে পুড়িতেছিল, পিতার কষ্টে সে ঈষৎ মাত্র নরম হইল না, বরং ইতরের মত ভগিনীকে উত্তর দিল, দেখ বেশী বাড়াবাড়ি করিবি না! এবং ইহার সহিত নিজ ছোট দেহ কম্পিত করত মহাদুঃখের এক শ্বাস ফেলিয়াছে। মনে তাহার ইস! শব্দটি কেবলই বারংবার ধোঁয়াইয়া উঠিতে আছিল; সমস্ত নিমন্ত্রিতরা যদিও দেখিল লোকটিকে মহা আদরে গৃহিণীগণ খাওয়াইআছেন, তবু কত যে বিদ্রূপ করিল তাহা বলা যায় না, কেহ বলিল পোস্ট বক্স! (যাহাতে কখনও চিঠিতে পূর্ণ হয় না) সকলেই তাহার দিকে তর্জনী সঙ্কেতে ব্যক্ত করিল, এই ছেলেটি নিম্ন প্রাইমারীতে প্রথম হইয়াছে— ঐ ভদ্রলোক ইহারই পিতা! ঐ বুদ্ধিদীপ্ত বালকই উহার পুত্র। কেহ চিন্তার ভানে টিট্টিকার দিল, দেখ এখন তো খাইতেছে পরে কি ঘটে।

নিশ্চয় আমার জামা কাপড়ের কোথাও ছেঁড়া, এবং সে সপ্রতিভ হওয়ত খুঁজিল।

কেহ বিস্ময় প্রকাশিল, মাইরী এত সব কোন গহ্বরে যাইতেছে! লোকটি কি মরিবে?

বালক মাটিতে যেমন মিশিয়া যাইতে চাহিল; কখনও মনে ভাবিল আমার মূর্খ হওয়া লাস্টবয় হওয়া উচিত।

গৃহিণী কহিলেন, দিদি তখনই বলিয়াছিলাম, পাঁচ চোখের সমক্ষে ইহারে, মহাশয়কে খাইতে বসাইও না। দেখ গোমস্তা মহাশয় আর খাইতে নারাজ! পাতা বদলাইতে দিবেন না, ও 'অমুকের মা', তুমি হাঁ করিয়া বাছা দাঁড়াইয়া রহিলে কেন! দিদিকে ডাক দেখি।

এখন কেহ এই কথা বলিতেছে, এ সময় ব্রাহ্মণ এত খাইল যে, সে পঙ্‌ক্তির পাশেই শুইয়া পড়িল; লোকে, ঐ অবস্থা দর্শনে, মহা চিন্তিত হইল; ভাবিল, ব্রাহ্মণ বুঝি মারা যায়। পুণ্যাত্মা গৃহস্থ তখনই—এই পর্যন্ত বিশদিয়া বক্তা থামিলেন, কেন না পরিবেশনকারী মাছের কালিয়া হাঁকিতে আছে, সে প্রস্থান

করিতেই—খেই ধরিলেন, গৃহস্থরা ডাক্তারকে খবর দিল ; ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া দুটি বড়ি খাইতে দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই বড়ি কোন মতে চোখ চাহিয়া দর্শনে কহিল, রে মূঢ় ডাক্তার ঐ দুটি বড়ির মধ্যে একটিও যদি খাইবার জায়গা পেটে থাকিত ত আমি দুইটি লাড্ডু খাইয়া ফেলিতাম।

গৃহিণী চারিদিকে বিশেষ উদ্‌গ্রীব হওয়ত নেত্রপাতে স্বীয় স্বামীকে খুঁজিলেন, অথচ এক মুহূর্ত আগে তিনি, অবলোকিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী জোড়হস্তে প্রতি নিমন্ত্রিতকে আদর আপ্যায়ন করিতে কানে নিবেদিতেছিলেন যে, লজ্জা করিয়া খাইও না—. এইসব প্রায়ই পাঁচ বাড়ির গৃহিণী,—যাঁহারা আমার বড় শ্রদ্ধার পাত্রী, যাঁহারা আমার এ দায় স্বেচ্ছায় উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন! তাঁহারা হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়াছেন।

এত আয়োজন! খাওয়া কি সোজা কথা! ইহা শুধু আমাদের শাস্তি দিতে। আমরা ত দ্বারকার দশ সেরী বিশ সেরী বামুন নহি! এত রকম মাছ! কোনটি ফেলিয়া কোনটি খাই!

নিম্ন কণ্ঠে পার্শ্ববর্তীকে একজন কহিল, উপরোধে ঢেঁকি গিলিতে হইবে। লোক কি করিতেছে!

মা গো তুমি শোন, সবই ঠাকুরের ইচ্ছা—উচ্চারিয়া বৃদ্ধ গায়ের উড়ানিতে চোখ মুছিলেন, পুনরায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রকাশিলেন, আমার মা যাইবার আগের দিন, হিক্কা উঠে নাই—ঐ যাহা ভোর রাত্রিতে একবারই উঠে।—যাইবার আগের দিন কি কি রান্না হইবে, কাৎলার মুড়া আর রুই মুড়া মিশ্রিত যেন ডালে দেওয়া না হয় ; মাছ ছয় হইতে বড় জোর সাত সেরই! এমনই কত কথা! কে কহিবে তাঁহার ছিয়ানব্বই বছর বয়স হইয়াছিল, যাইবার সময় হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ রাম নাম,…কি তোমার পাত যে খালি! পেট ভরিয়া খাও!

এমত ক্ষণে দিদি আসিলেন, গৃহিণীর নালিশ শুনিয়া ধমকিয়া উঠিলেন, দেখ, খেলা করিও না, আমার মা প্রায়ই বলিতেন, তুমি নিজ কানে শুনিয়াছ, যে তুমি পেট ভরিয়া খাইলে তিনি শান্তি পাইবেন! ধ্যান্‌পানা করিয়া আবার কোটের বোতাম দেওয়া হইয়াছে—খোল বোতাম! পেটের উপরে অমনধারা আঁট রাখিলে মানুষে খাইতে পারে!

দিদি আপনার পা ছুঁইয়া শপথ করি! আর জায়গা নাই!

অথচ মাছ এখনও স্পর্শ করে নাই, ডাল পর্যন্ততেই হাত গুটাইতেছে!

দিদি, বল কি আমি ঐ দিকে ব্যস্ত, সর্বনাশ। ডাল খাইবে না কেন, যেমন বলিয়াছিলে মা'কে—দালচিনিগুলি না বাটিয়া টুকরা করিয়া দিতে—ঠিক তেমনই হইয়াছে। তাই তুমি খাইলে। তুমি মরিতে ঐ দিয়াই অত ভাত খাইলে কেন। না দাদা ও বলিলে চলিবে না।

বৃদ্ধাকর্তা ভোজনের পূর্বাহ্নে জানাইয়াছিলেন, যে আমরা পোলোয়া (পোলাও) করি নাই, কারণ ইতিপূর্বে আমাদের বাবুর কন্যার বিবাহতে যে ভিয়ানের বামুন আসিয়াছিল সে বাবুকে বলিতেছে, বলিতেছেই বা বলি কেন, বলা ভাল বুদ্ধি দিতেছে, পোলোয়া করুন উহাতে নিমন্ত্রিতদের মুখ মারিয়া দিবে, আর যাহা সব পদ হইবে তাহা খাইতে রুচি চলিয়া যাইবে—নেবু খাক্ আর যাই খাক্।

আপনারা জানেন, আমার বাবু যিনি আমার অন্নদাতা, তাঁহারা মুঘোল আমল হইতে জমিদার, দশশালা ব্যবস্থার কোম্পানীর তৈয়ারী উট্‌ক জমিদার নয়। ভিয়ানের বামুনের কথা শুনিয়া রাগে অপমানে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, এত বড় আস্পর্ধা আমাকে ঐ উঞ্ছ বুদ্ধি দেওয়া, বেটা ভাবিয়াছে কি!

ভিয়ানের বামুন আপন প্রমাদ বুঝিল, কহিল বাবু মহাশয়, কলিকাতায় সবাই জজ ব্যারিস্টারদের···।

তৎশ্রবণে বাবু আরও রাগিয়া উত্তর করিলেন, সেই হারামজাদাগণকে চাপকাইয়া সোজা করিতে হয়। যাহারা জ্ঞাতি আত্মীয়র প্রভেদ কি জানে না—দায় বিদায়ে সাহেব নিমন্ত্রণ করে, যাহারা নিজ সর্বস্ব ভাবে, শালারা স্বার্থপর—! সেই বেটাদের সঙ্গে আমাকে এক করা—দারওয়ান এই বেটাকে পাঁচ জুতি মারিয়া ফটকের বাহির কর!

পরে একটু ঠাণ্ডা হইতে আমাদের বাবু কহিলেন, ঐ হারামজাদাগণ শুনিয়াছি তোমাকে এক রেকাব খাবার দিল, তুমি কিছু ফেলিয়া রাখিলে; অমনই সেই রেকাবের খাদ্য অন্য আগতকে দেয়! ছি ছি। আর আমাদের!··· তোমরা দেখিলে, জ্ঞাতি কুটুম্ব খাইবে, তাহাদের মুখ মারিয়া দিতে হইবে। কি কথার ছিরি। কলিকাতা নষ্ট হইয়া গেল। লোকে যদি টের পায় আমার সামনে, ভিয়ানের পাচক বেটা ইহা বলিয়াছে, ছি ছি। অথচ দেখিয়াছে, যেক্ষেত্রে শুনিতেছে যে, লুচি দুধ-জলের বদলে দুধ দিয়া মাখা হইবে—যাহাকে লুচি বলিত তেমনই হইবে। কোথায় পাবনা হইতে গব্য ঘৃত আনাইতেছি—যশোহর খাটাল তেমন নহে। বলিয়া—পুনঃ রাগত প্রকাশিলেন

বেটাকে কয়েদ করা উচিত ছিল। 'মুখ মারিয়া দিব' শুনিয়া আমার গা কাঁটা দিয়া উঠিল। বাবুর নিকটে আমরা বিভিন্ন মহালের নায়েবরা মনুষ্য চরিত্রের বিকৃতি ঘটিয়াছে জানিয়া—তাহাও উচ্চশিক্ষিত ধনীদের মধ্যে জানিয়া ত্রাস করিলাম।

বৃদ্ধকর্তা, নিজ জমিদারবাবুর মানসিকতা চমৎকারভাবে বিবৃতিয়া যোগ দিলেন, আমাকে ঠাকুর! বাবুর কথা স্মরণ করাইয়া বাঁচাইয়াছেন, ইহা আমার মা'র কাজ, পিতৃদায়ের পর এইটি একটি পরম নিষ্ঠায় সম্পন্ন করিবার ক্রিয়াকর্ম—তাহার মধ্যে কপটতা করিব এ যেন আমার অধস্তন কোন পুরুষের কেহ না ভাবে!

পঙ্‌ক্তির সকলে ধন্য ধন্য করিলেন, বলিলেন, আপনি অতীব সততা ও সাধুতার পরিচয় অদ্যই নহে চিরকাল দিতেছেন, এই পরগণায় আপনার মত সজ্জন নায়েব কেহ কখনও দেখে নাই, অতি বেয়াড়া প্রজাও স্বীকার করে—মানুষ ত ঐ একটি! অতএব আপনার পোলোয়া না করার কৈফিয়ৎ দিবার কোন অপেক্ষা রাখে না!

এখন তাহা হইলে বসিতে আজ্ঞা হউক! বৃদ্ধকর্তা বলিলেন, আমি সর্বোত্তম টেবিল রাইস যাহা বড়লাট ছোটলাট আদি গণ্যমান্য ইংরাজ রাজপুরুষগণের, শুধু এখানেই নয় ইংলণ্ডে পর্যন্ত, অতীব প্রিয় সেই চাউল আমি সংগ্রহ করিলাম, যাহাতে আমার মায়ের নিয়মভঙ্গের কাজে ব্যবহার করিতে পারি! ইহা, এই চাউল, আরব আগত, বা পেশোয়ারী হইতে যারপরনাই উপাদেয়। তৎসহ লুচিও করা হইয়াছে—তবে ময়দা এতৎদেশীয়,—রুলের (এন্‌ড্রু ইয়ুল। লোক মুখে, রুল), ইংলণ্ডের ময়দার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আপনারা জানেন এখন স্বদেশীর হাঙ্গামা! গতকল্য ব্রাহ্মণগণ প্রীত হইয়াছেন অদ্য আপনারা হইলে আমার মা শান্তি লাভ করিবেন।

বালক তেমনই দাঁড়াইয়া গাছের পাতা ছিঁড়িতেছিল, এখন অসম্ভব রোদ, চারিদিক জনমানব শূন্য, সে দেখিল ছোট বোন কচু পাতা ছিঁড়িয়া রাস্তার ঢালুর নীচে খাল হইতে, যেখানে কিছু শামুক আছে তন্নিকটে জল আনিতে যাইতেছে, মেয়েটি ভয়ে আড়ষ্ট, হঠাৎ একবার মুখ ফিরাইয়া কহিল, দাঁড়াও না বাড়ি চল আমি সব মাকে বলিয়া দিব! ছোট লোক!

বেশ দিবি ত দিবি! এবং ইহার সহিত আরও কতকগুলি অভব্য শব্দ সে উচ্চারণ করে যাহা তাহার নিজের কানে ঢুকিতে অর্থাৎ শুনিতে লজ্জা হয়!

বেচারাতে হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান, মান্য গুরুজন, শ্রদ্ধেয় আদি উচ্চবর্ণ উচিত মর্যাদা বোধ আর ছিল না—তাহা অপহৃত হইয়াছে, দেহ বিষাইয়া উঠিয়াছে ; লাঞ্ছনাতে তাহার বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডলকে লাল করিয়াছে, কেন না খাওয়ার পর পুকুরে মুখ ধুইবার সময়ে, কয়েকটি অসভ্য বালকরা যখন মুখ প্রক্ষালনের জল লইয়া ইতর আমোদের একসা করিতে আছিল, তখন সে বেচারী ঘাটের উপরে বয়সীদের মধ্যে ছিল, এইবার ঐ খেলা শেষ হইল তখন একজনে তে কহিল, ঐ সব লোককে কিছুমিছু খাইতে দিতে হয়, তাহা হইলে টের পাইত। এহেন রসিকতা করিয়া সকলের মুখের প্রতি তাকাইল।

তোর বিবাহতে উহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া কিছুমিছু খাওয়াইবি ত !

কিছুমিছু গল্পটি ভারী মজার, ইহা বহুদিনের, ইহার চরিত্রগুলির মধ্যে বিক্রেতা বাদে কোথাও মা শাশুড়ী, কোথাও দিদি ইত্যাদি এবং কোথাও জামাই বা পুত্র বা ভাই রূপে বদল হইয়াছে। মা পুত্রকে একটি টাকা দিয়া কহিল, বাছা শ্বশুর বাড়ি যাইতেছ, পথ অনেক, যাইতে কালে যদি ক্ষুধা পায়, এই টাকা দিয়া কিছুমিছু কিনিয়া খাইও। পুত্র অনেক পথ অতিক্রম করিবার পর এক হাটে পৌঁছাইল। প্রায় প্রতি দোকানে খুঁজিল কিছুমিছু পাওয়া যায় কি না। কিন্তু কোথাও কিছুমিছু পাওয়া গেল না, ইহা হাট দূর হইতে নূতন পসরা আসিতেছে —সে পুনরায় নূতন পসরাতে খুঁজিল, এক হাটুরে পসারী একটি বুনো ওল দেখাইয়া, কহিল, এই ত কিছুমিছু কতটা চাই। পুত্র কহিল, এক টাকার। হাটুরে পসারী তাকে বুনো ওলটি দিল। এবং সে ঐ ওল লইয়া এক বৃক্ষের তলে বসিয়া খানিক খাইতে বাপরে মারে করিয়া উঠিল ! ওলটিতে গলা বিষাইয়া উঠিল।

বিবাহের ঢের দেরী গোমস্তাবাবু ততদিন থাকে কি না···তাহা হইতে তোর ঠাকুরদাদার অবস্থা ত এখন তখন নাভিশ্বাস !

উহার ঠাকুরদাদার অবস্থা বছরে একবার করিয়া ঐরূপ হয়···মরিলেই হইল ?

যাহার ঠাকুরদাদা সে সত্বর কহিল, তোমাকে বলিয়াছে, বলিয়া আর তর্কে না গিয়া তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিল।

অন্যান্যরা হাসিল একজনে জ্ঞাত করিল, আমি সব জানি, উহার বাবা এক পয়সা খরচ করে না, বলে, বাবার অসুখ সারিবার নয়, টোটকাতে তবু ভাল কাজ করে। ডাক্তারের কর্ম নহে! উহার বাপ ভবল কঞ্জুস!

অথচ দেখিবি শ্রাদ্ধে খুব ঘটা করিতেছে, 'বাঁচলে দিবে না দানা পানি। মরলে দেবে ছানা চিনি॥'

বলে না, 'জীয়লে দেবে না তুণ্ডে। মলে দেবে— বেনা গাছের মুণ্ডে॥'

উঁহার বাপ সে পুত্র নহে—বরং সকলকেই কিছুমিছু খাওয়াইবে।

যে লোকটি খাইতেছে তাহাকে গিয়া বল না—উঠিবেন না কিছুমিছু আছে।

তাহাও হয়ত হজম করিবে।

বালকের মধ্যে, যে এখনও গাছের নিকটে আছিল, কি ভাবে যে মান চেতনা, সাধারণের তুলনায় একটু বেশী যাহা, গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ঠাকুরই জানেন। শ্রাদ্ধ বাড়ির নিয়মভঙ্গের নিমন্ত্রিতদের বাক্যের শ্লেষ তাহারে কণ্টকিত করিয়াছিল! ইহা সত্য তাহার মায়ের শাসন ও মর্যাদা জ্ঞান তাহাকে প্রভাবিয়াছে; যদি কখনও খাওয়ার দেরীতে সে ক্ষুণ্ণমনা হইল, তখনই তাহার মা বলিয়াছে, সব যেন বালুর ঘাট হইতে এখানে আসিয়াছে, (বালুর ঘাটে ১৯২৫/৩০ র মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয়) আবার খাদ্য অপচ্ছন্দ তাহার হইলে মা কখনও কটাক্ষিয়াছে, এখানে সব মরিতে আসিলে কেন? বড়-লোকের ঘরে জন্মাইতে পারিলে না। গরীবের ঘরে যখন জন্মাইয়াছ, তখন সব সহিতে হইবে, ইহা ভাল লাগিতেছে না উহা মন্দ, ইহা বাসি, এইসব ভিরকুটি করিলে ভগবান রাগ করেন।

এই নিমন্ত্রণে আসিবার সময়ে মা পৈ পৈ করিয়া পড়াইছিলেন, দেখ, এমন খাইবে না যাহাতে লোকে হাঘর হইতে আসিয়াছে বলিতে সাহস করে, যাহা দিবে তাহা খাইবে নষ্ট করিবে না, নষ্ট করিলে ঠাকুর অসন্তুষ্ট হন, মা লক্ষ্মী তাহাকে ছাড়িয়া যান—কখনও যত ভালই লাগুক্ দ্বিতীয়বার চাহিবে না, পান একটা খাইতে পার তবে দেখিও পিক না জামাতে পড়ে! ভুলিও না তোমরা গরীব মানুষের ছেলেপিলে, এতটুকুতেই বদনাম হইবে। প্রথমই হও আর যাহাই হও।

বালকটির মনে এই সব কথা নিশ্চয়ই রেখাপাত করিতেছিল, ইহাও মন্তব্যিয়াছিল, কৈ বাবাকে ত একটা কথাও বলিল না। নিজেই উত্তর করিতে, এইটুকু ভাবিয়া থামিয়া কহিল আমি একবার বাড়ি যাই না, বলিব আমাদের ত সাত সতেরো লেকচার দিলে, বাবাকে ত একটি কথাও বলিলে না, বরং বলিয়াছিল যে, এইটা খাইব না, উহা নহে; দেখ যেন উঁহারা খুশী হয়েন, দুর্গা দুর্গা। আর আমার জন্য কিছু দিতে চাহিলে কিছুতেই লইবে না। আমার

দিব্য রহিল, এমন কি সন্দেশ ইত্যাদি পর্যন্ত নহে ; উহাদের আত্মীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব বাড়ি পূর্ণ, আমি না যাইলে যে খাদ্যদ্রব্য সকল ফেলা যাইবে এমন নহে ! হাঁদা লইয়া আসিলে মঙ্গল হয় না। লোকেই বা কি বলিবে, হাভাতের ঘর হইতে আসিয়াছে, না হইলে ছাঁদা বাঁধে !

ঐ ঢালু সবুজ ঘাসের প্রসারে বাবা পা ছড়াইয়া পশ্চাতের দিকে দুই হাতে ঠেস দিয়াছে এবং উর্দ্ধে মুখ তুলিয়া আঃ আঃ শব্দ করিতে আছে। আর ছোট বোন কাতর দৃষ্টিতে ঐ দশা দেখে।

ঐ পর্যন্ত মননের শেষে, মর্মে নিপীড়িত বালক সুবিস্তৃত দিক চরাচরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল. সর্ব স্থান তাহারই গাত্রদাহের উত্তাপে ঝলসাইয়া গিয়াছে, এমন যে পাখীর ডাকগুলি অবধি নিস্তার পায় নাই, মধুর গান সকল পুড়িয়া ফর্‌ফর করিয়া ফিরিতে আছে ; সে চোয়াল শক্ত করিয়া পুনঃ এইদিকে অর্থ রাস্তার দিকে নজর করিল, দেখিল, কোথা হইতে এক গোবর কুড়নী বুড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তদ্দর্শনে তাহার, বালকের, দেহে অদ্ভুত সিঞ্চিড়া লাগিল, ইহারই মধ্যে সে বিশেষভাবে তাহারে নিরখিল।

ঐ বৃদ্ধার চেহারা হাড়সার, পরণে মলিন ছিন্ন অপটু সেলাই করা কাপড়, যাহার আঁচল ভাগ, দড়ির মত ডান কোমরের আঁটন হইতে বাম স্কন্ধ পার হইয়াছে, বাম হস্তের কব্জি একটি বেশ বড় চ্যাঙারী-ঝুড়ী কাঁকে চাপিয়া আছে ; বৃদ্ধা প্রস্তরীভূত ; উহার দৃষ্টি ছিল, ঢালুর উপরে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকা লোকটির দিকে, লোকটি দুই হস্ত পিছনে অনেকখানি প্রসারিত করিয়া জমি ঠেস দিয়া, মাথা যতদূর সম্ভব পশ্চাতের দিকে হেলান এবং সমস্ত মুখ উন্মোচিত আছে, যে এবং মহা যন্ত্রণার এক প্রকার শব্দ উহা হইতে নির্গত হইয়া থাকে !

লোকটির গাত্রস্থিত নকল আলপাকা-র (আলপাকা একরূপ জন্তু—উহার লোমের) কোট—তাহার সমস্ত বোতাম খোলা। একটি কচি মেয়ে কচু পাতা দিয়ে পাগলের ন্যায় হাওয়া করিতে সময় কি যেন বলিতে আছিল এবং কান্দিতেছে। সে বলিতেছিল, বাবা তুমি এইরূপ কেন করিতেছ ? তোমার কি হইল।

গোবর কুড়নী বৃদ্ধা নিজের পিঙ্গল বর্ণের জটিল চুল খামচাইল, কত রকমারি ভাবভঙ্গি নিজ দেহে ঘটাইয়া জিজ্ঞাসিল, এই ছেলে, ঐটি তোমার বাবা ! কি হইয়াছে ? বালক অতিমাত্রায় বিশেষ বিরক্তি অন্য দিকে মুখ

ফিরাইল। এই ইচ্ছাকৃত অস্বীকারের অভিব্যক্তি তাহার নিজেরই বড়ই চোরা প্রীতির কারণ হয় ; তাহার মতি এইরূপ যে তাহাকে যেন মুখ আর ফিরাইতে না হয়! অবশ্য তখনই নিজের ঐ মতিচ্ছন্নতা বোধের ব্যাপারে উত্তর দিয়াছিল, আমি মোটেই ইচ্ছা করিয়া মুখ ফিরাই নাই, বা কোন কথাই ভাবি নাই! এবং এই সময়েতে সে আড়চোখে দেখিল গোবর কুড়নী আপন ঝুড়িটি এখানকার একস্থানে রাখিয়া, কহিল, ও ছেলে ঝুড়িটা দেখিও ত। বলিয়া তখনই ঐ লোকটির নিকট যাইল, এবং সস্নেহে মেয়েটিকে প্রশ্ন করিল, কি হইয়াছে। এই মানুষটি তোমার কে? মেয়েটি উত্তরিল, আমার বাবা কি হইয়াছে জানি না! এই দাদা ছোটলোক।

ঐটি তোমার দাদা?

হুঁ দাদা

আপন মায়ের পেটের ভাই

হুঁ হুঁ

ইহ র ছেলে

হ্যাঁগো

তুমি ঐ ছেলেটির বোন

মরণ দশা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

বল কি তুমি, অবাক কাণ্ড আর আমি ছোঁড়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উনি তোমার বাবা। আমাকে (গোবর কুড়নী) আর কিছু বলিতে হয় নাই যে তুমি (মেয়েটি) উহার দিকে লক্ষ্য করত দাদা বলিয়া সম্বোধনিতে ছিলে। কিন্তু ছোঁড়া ফ্যারাক দিল।

বালক ঐ বৃদ্ধার, গোবর কুড়নীর, বাক্যতে ঝটিতি ছেদ টানিল, নিশ্চয়ই তাহাতে আশঙ্কা উপজয়ে যে যদি ঐ বৃদ্ধা ঐখানে বসিয়াই কহে যে তাহার 'বাবা কি না' জানিতে চাওয়াতে, সে বালক ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল, অর্থই অস্বীকার করিয়াছে যে 'তাহা নহে'।

তাহা হইলে? তবে কি? কে যেমন ধিক্কার তাহারে দিয়া উঠিল। সে আর এক নিমেষও থাকে নাই। এখানে সে আসিয়া দাঁড়াইয়া কি কারণে তৎবিষয়ে ইতস্তত আছে!

মেয়েটি ব্যক্ত করিল, এই যে বাবু আসিয়াছে লজ্জা করে না তোর। তুই নরকে যাইবি তোর গায়ে কি মানুষের চামড়া ছি ছি। প্রাচ্য অল্প বয়সী

মেয়েরা এইরূপ বয়সীদের ন্যায় কথা বলিতে অতীব পটু ! এখানেই সে থাকে নাই, তিক্ত কণ্ঠে টিট্‌কারিল, তোকে না মা ঐ শ্লোক পড়িতে রোজ বলে, যে পিতা স্বর্গ ! ঝাঁটা মারি ! ঐ শ্লোকের উদ্দেশ্য মেয়েটির হৃদয়ে গ্রথিত হইয়াছে।

ইহাদের মাতা যেহেতু যে কিভাবে 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' শ্লোকটি বালকের মনে যাহাতে বিশেষ সাঁধ করে তাহার জন্য নিশ্চয়ই বহুভাবে ব্যাখ্যা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়াছিল।

বাবা বলিয়াছে, তোমার যেমন খাইয়া দাইয়া কোন কর্ম নাই ঐ শ্লোক শিখাইতেছ—বরং না শিখান ভাল তাহাতে আপশোষ থাকিবে না, ঐ ত আর দুইজনকে ত শিখাইয়াছিলে। কি হইল নায়েব মশাইকে ধরিয়া বাবুর বাড়ি একজনকে, বাবুর বন্ধু পুণ্যশ্লোক জমিদার……বাহাদুরের বাড়ি রাখিয়া পড়িতে পাঠাইলাম। দেশমাতৃকা তাহাদের বড় হইল, বেশ হইয়াছে একজন যাবজ্জীবন, অন্যটি কে জানে কতদিন মেয়াদ খাটিবে বৃথা পরিশ্রম ! আমরা দুঃখ পাইব না ত পাইবে কে ! জানকীর ত ছেলেপিলে আমরা—রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হনুমান দুঃখের পর দুঃখ পাইয়া কথং জীবতি জানকী। আমার জানকী কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছেন। ঐ ব্যক্তি এমন ভাবে জানকী বলিয়া উঠিত যে সকলের বক্ষঃদেশ নিঙড়াইতে থাকিত।

বৃদ্ধা নিকটে উবু হইয়া বসিয়া কহিল, জুতা জোড়া খুলিয়া দাও না ! এই বৃদ্ধার উপস্থিতি মেয়েটিতে এক অধিক বয়সী, জ্ঞানসম্পন্ন গৃহিণীর ভাব আনিয়াছিল এখন এই কথা নিজে যেন বুঝিয়া বলিল, এই দাদা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছিস, জুতা জোড়া খুলিয়া দে না। নির্দয় !

এই ধমকানিতে বালক থতমত হইয়া তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা মান্য করত জুতা জোড়া খুলিয়া দিল।

বৃদ্ধা মন্তব্যিল, পা একেবারে লাল, জল ছিটে দাও বেশ করিয়া, দাও দাও।

অল্প বয়সী মেয়েটি বাবার পায়ের দিকে তাকাইয়া পোড় খাওয়া গিন্নী-পনাতে খেদ উক্তি করিল, জানি না কপালে কি আছে, কাহার মুখ দেখিয়া যে উঠিয়াছিলাম। ওকি অমন হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে, যাও না নিজের কোঁচার খুঁটটা সত্বর জলে ভিজাইয়া আনয়ন কর না কেন হাঁদা এবং হৃদয় মোচড়াইয়া ডাকিল, বাবা তোমার কি হইতেছে ! এই শোকোক্তিতে

মেয়েটি তদীয় অসহায় বয়সে ফিরিয়াছিল, যে তির্যকে বৃদ্ধাকে নিরখিয়া যাহা সে হারাইল না। পুনঃ বুক ছাঁচা দরদে মায়ের মত, শিশু যেমন, পিতাকে ঐতিহাসিক উদ্বিগ্নতাতে জানিতে চাহিল, বাবা তোমার কি কষ্ট হইতেছে! অমন অত্রাহি করিতেছ কেন, কি হইতে আছে এই ত আমি। ঐত দাদা জল জল আনিতেছে, তোমার পায়ে দিবে। আরাম হইবে।

বালক জলের কাছে আসিয়া কোঁচা খুঁলিয়া উহার খানিক অংশ জলে ডুবাইতে কালে, ইহা মনন করিল, যে, যদি সত্যিই আমার কোন কিছু দোষ ত্রুটি অপরাধ হইয়া থাকিত ঠাকুর আমাকে বাবার পায়ে, সর্বপ্রথম হাত দিতে দিতেন! এখানে সে থামিল, এ তাবৎ নিজ ব্যবহারকে কোন রকমেই সে বিচার করে না। এই সময় সহসা ঠাণ্ডা জলের স্পর্শতে তাহার ছোট দেহ তাজ্জব হইল, একদিকে শালুক ও পার্শ্বেই কমলীর আঁকাবাঁকা রেখা তাহাকে আকর্ষিয়াছে—ঐ রেখা সকল কিছু উজিয়া উঠিতে ছিল। আঃ সেই বৌটি যে গরুগাড়ি হইতে নামিল প্রায় সেখানে, ইহা খিড়কীর নিকট যেখানে পাঁঠা ছাড়ান হইতে আসিল।

আঃ সেইখানেতে ঐ বৌটি আপন কাপড় জামাতে যত্ন দিতে আছিল, কপালে টায়রাতে (অলঙ্কার) গেলে মুখখানি ভারী খাসা দেখিতে হইয়াছিল, টায়রাটি কি চমৎকার দুই পাশে দুই পানের মতন টিকলি (চাকৃতি) মধ্যে সীঁথির সামনে আর একটি পাথর বসান তারা; পানের মতন টিকলির প্রতিটি অক্ষর উৎকীর্ণ; ও পাথর বসান বালক পড়িল, গোবর্ধন। পাথর বসান অক্ষর ঝলকিত এবং তখনই বধূটির পানে নেহারিল, গোর্ধবন লেখা টায়রা পরা গর্বিত মুখখানি তাহার বড় ভাল লাগিল গোবর্ধন নির্ঘাৎ ঐ মেয়েটির বর। মন্তব্যিল—ঐ টায়রা, টায়রার জন্যেই উহা ঐ বৌটি এত আকর্ষণীয়!

কেন যে লোকে আজকাল টায়রা পছন্দ করে না! বেশ ত! আমি মাকে অমন একটা টায়রা গড়াইয়া দিব, যখন বড় হইব! ঐরূপ টায়রা উহাতে বাবার নাম লেখা থাকিবে। কত টাকা লাগে! উচ্চ প্রাইমারীতে আমার সর্ব উচ্চ স্থান অধিকার করিতেই হইবে! ছয় টাকা বৃত্তি পাইব! ইস আমরা কি গরীব! শুধু টায়রা না মাকে চার গাছা করিয়া বোম্বাই বেঁকী প্যাটার্নের চুড়ীও গড়াইয়া দিব যেমন এ টায়রা পরা বৌটির হাতে আছে। ম্যালেরিয়া মাকে খাইয়াছে, ডি গুপ্ত বেহালার পাচন কিনিতে জেরবার না হইলে কি

মা সুন্দর বাবার মত ফর্সা না হইলেও, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের কিন্তু মুখখানি এত ভোগেও কি সুন্দর।

না বোম্বাই বেঁকী নহে, কারণ যে বৌটির ঐ প্যাটার্নের চুড়ী ছিল সে কি অসভ্য। বাবার (ভদ্র কথায় বালক ভাবিল) দেখিয়া একটি চপলমতি বধু বছর পাঁচ ছয়ের ছেলেকে শিখাইতে আছিল যা ঐ লোকটা গাণ্ডেপিণ্ডে গিলছে তাহার সামনে গিয়া ডাক বাতাপি! বাতাপি, বলিয়া! দেখিবি পেট ফাটিয়া যাইবে! হিহি করিয়া হাসিল। বালকের সামনে সর্বত্রে ঐ হা ইতর হাস্য খেলিয়া বেড়াইতেছিল। ঐ ঐ ইল্বলের স্বরে বায়ু ঘূর্ণায়মানা হইল, তাহার চোখে জল আসিল; ইহা ব্যতীত তাহার আর কোন ক্ষমতা ছিল না, আর একটু বড় হইলে অর্থ, আর একটু অভিজ্ঞতা থাকিলে নিশ্চয়ই সে এমত বচনে ক্ষোভ প্রকাশিত যে হায় পৃথিবী কত নিষ্ঠুর!

বৃদ্ধা হাঁটুর উপর দুই কনুই স্থাপিয়া বিস্তীর্ণ হস্তদ্বয় দ্বারা একটি ত্রিকোণের দুই দিক যেমন, নির্মাণ করত করজোড় করি রাখিয়াছে, সে বন্ধুর মতন জিজ্ঞাসিল—মানুষটির কি হইয়াছে গা।

কি করিয়া জানিব বল সুস্থ মানুষটি···।

তবে হঠাৎ! নিশ্চয়ই বোধহয় হাওয়া লাগিয়াছে।

তোমার মুণ্ডু! যত অলক্ষণে কথা—। তুমি উঠত, গোবর তুলিতেছ তোল গিয়া! যে এবং একই রুক্ষ কণ্ঠে ঝাঁঝিয়া উঠিল, আমার মরণ হয় না! দাদা, বলি মরিয়াছ না কি, তোমার যে দেখি ভাব লাগিয়া গেল!

বৃদ্ধা মেয়েটির তাড়না গায়ে মাখে নাই, বরং মন্তব্যিল, কি যে বল, বাবা বলিয়া কথা তাই আলা-ভোলা লাগিয়াছে এবার সস্নেহে, উচ্চারিল, আস্তে আস্তে আইস! এবং বালক আসিতে উপদেশিল, হাঁ দও গোঁড়ালি ভিজাইয়া, হাঁ বাপ দাও আঙুলের ফাঁকে, নখে, বাঃ বেশ, বেশ সেবা জানে এইবার গোড়ালি আর গাঁটের পিছনে বাঃ এবং ইহার পরে ছেলেমানুষের মত উঞ্ঝাপনিল, উঃ তখন যে বড় স্বীকার করিলে না যে এই মানুষটি তোমার বাবা হুঁ।

এইরূপ প্রশ্ন নির্ঘাৎ সে আশা করিয়াছিল, কিন্তু উত্তর তৈয়ারী সম্ভব হয় নাই, সে প্রথমত মহা আতান্তরে থাকে, কোনক্রমে সে বৃদ্ধার প্রতি নেহারিল, এই সেই বুড়ী যে জলাতে থাকে, এবং রাতে আলেয়া রূপ ধরে নিশ্চয়ই! অবশ্য ইহাতে আতঙ্ক আসে নাই। ইস এতক্ষণ বাদে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ বাড়ি

হইতে এত খানিক পথ অতিক্রমের পরে যখন সে বাবা বোন, অনুপস্থিত মা ঘরের দাওয়ার নিকটের লাউ গাছ, পুকুর ঘাটের খেজুর গাছের গুঁড়ি প্রভৃতির সহিত এক অভিন্ন হইয়াছিল। তথাপি তাহার নিজের মুখখানি নাড়ানোর ভঙ্গিতে ইহা আঁচ পাওয়া যায় যে সে কিছু সত্য লুকাইতে সচেষ্ট আছে। এক নিমেষ বাবার দিকে অসহায় (!) দৃষ্টিতে তাকাইল। দেখিল বিরাট একটি হাঁ যাহা হইতে ক্রমান্বয় যন্ত্রণার আওয়াজ নির্গত হয়, তৎ পশ্চাতে নাশা গহ্বর এবং দূরে নিমীলিত চক্ষুদ্বয়!

আঃ সোনার টায়রার টিকলিতে, যাহা কপালে ধনুর আকারে সাজান, সেই টিকলির এক একটিতে তাহার বাবার নামের অক্ষর প্রতি অক্ষর মহা-মূল্যবান পাথর বসান! এরূপ পাথর কেহ দেখে নাই। তখন আলোতে নাম ঝলমল করিতে আছে।

বৃদ্ধার কথায় অথবা বাবার কষ্টে বালকের মধ্যেও নাকানি চুবানির ভাবান্তর উপস্থিত হইল, কিন্তু সে বুদ্ধি হারায় নাই, উত্তর করিল, তুমি কি পাগল নাকি! যে এবং সে তির্যকে বোনকে দেখিল বটে যে সে ঈর্ষান্বিত হয় যে বোন বাবার কত কাছে।

বৃদ্ধা এরূপ থাকিয়া সমগ্র দেহকে কিছুটা বাঁকাইয়া, পূর্ব স্থান নির্দেশে করজোড় দ্বারা ইঙ্গিতে জবাব দিল, উঃ ঐ ত এখানেতে। তোমার বাবা তখন কাতরাইতেছে! হুঁ! স্বীকার করিল না, মুখ ঝটকা দিলে, আমি ত ভয়ে কেঁচো! বলি, একি!

হেৎ

হেৎ! হেৎ! মিথ্যুক!

ইহাতে, ঐরূপ অসহ্য প্রাণান্ত শ্বাস-রোধ কষ্ট হইতে লোকটি বড় মায়ামুক্ত স্বরে, ক্রমে ভাঙিয়া আপত্তি করিল, না না তাহা কখনও হয়, তোমার বুঝিবার ভুল, পাগল!

বাবা তুমি আর কথা বলিও না ত, উঃ কি কষ্ট! দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়, চুপ কর!

না, এই বোঝাটা উহারে লইতে দিই নাই বলিয়া উহার রাগ, পারিবে কেন বল ত!

বৃদ্ধা এবার হাসিয়া কহিল, আমারে বুঝ্ দিতে গিয়া শেষে কি হিত বিপরীত হইবে! ছাড়! আমারে তুমি যাই বল না কেন আমি যা জানি তাহা জানি।

মহা বেআক্কেলে তুমি ত, তিন কাল গিয়া এক কালে ঠেকিয়াছে, উঠ এখান থেকে! মেয়েটি প্রকাশিল।

বাঃ উঠিব কেন, আমায় কি জ্ঞানগম্য নাই লোকে শুনিলে কি বলিবে… হাড়ি-র মা ছি ছি ঐ মানুষটর এমন অবস্থা, দুটি দুধের বাচ্চার উপর ছাড়িয়া চলিয়া আসিলে বলিহারী যাই, তোমার কি ধর্ম! চেঁচাইয়া লোক জড় করিবার লোকও মানুষের দরকার হয় না কি বল।

বটেই ত অন্যমনস্ক মেয়েটি সায় দিল—ইহা আশ্চর্য।

বাবা আমার ঘটে সে বুদ্ধি আছে আমি উচ্চ জাতির গা ছুঁইব না, ছুঁইয়াছি কি মরিল, ব্রহ্মহত্যা হইল ত! তবে সেই ঠাকুর মাঝে মাঝে আমায় দেখা দিয়া থাকে বলে, ওরে হাড়ি-র মা আমায় খুব বাঁচিয়েছিস, গরীব হয়ে বাঁচার মত পাপ আর নাই মহাপাপ! আমি অমুকহাড়ি-র নাতনীর অমুক হাড়ি-র কন্যে, আমি সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না!

গরীব শব্দে ভ্রাতা ভগিনীর কেমন যেন বাপের জন্য টান বাড়িয়া গেল, আশ্চর্য মেয়েটি হঠাৎ অন্য কথা পাড়িল, এতক্ষণ কোনকালে আমরা ঘর কে পৌঁছাইয়া যাইতাম,

আস্তে হাঁটলে দেরী হইবে না—তাহার পর নেবুর পাতা পাড়াতেই ঘণ্টা খানেক,

তোর মুণ্ডু! ভেড়ির পাশ বরাবর যাইলে—কতক্ষণ পৌঁছাইয়া যাই!

বালক পিতার করুণায় অনেক চোখের জল কব্জি দিয়া মুছিয়াছে আপনকার মতিচ্ছন্নতার জন্য সে সত্যিই ডুকরাইয়াছে; সে এখন অন্য মানুষ, কর্তব্য বোধ তাহারে এতক্ষণ বাদে এখন অত্রাহি করিল, নিশ্চয় গরীব শব্দটি স্বীয় কান হইতে সরাইতেও বটে, কহিল 'তুমি আমায় রাস্তা চিনাইও না' এই উক্তিতে কর্তব্যের 'ক' ছিল না বরং নিজের দোষকে ঢাকিবার কথা ছিল —যাহা কর্তব্যপরায়ণের বাচনভঙ্গিতে উক্ত হইল। এবম্প্রকার উত্তর মেয়েটির মান মর্যাদাতে আঘাতিল, তখনই বলিল, ঐ বুড়ী মানুষটাকে জিজ্ঞাসা কর না! ঐত খবর দিল!

হ্যাঁ বাপ এই রাস্তা বড় ঘুর, আমি যে এখানে সেখানে হাট কুড়াইতে, গোবর কুড়াইতে যাই!

বালক কহিল, বাবাও ত…

বাবা আবার কি বলিবে, তুই যা ইচ্ছে করিলি!

বালক ইহার কোন জবাব দিতে পারিল না, শুধু নিজ পক্ষ সমর্থনে মনেতে গুমরাইতে আছিল ইহা যে, হাঁ্যা ঐ পথে যাই, আর দুনিয়ার লোক এই ব্যাপার দর্শনে কৌতুক করুক। আমাদের বড় মান তাহাতে বাড়িত। আর তখন ত বাবার ইত্যাকার শোচনীয় অবস্থা হয় নাই। কেন যে, ভাবিয়াই থামিল আর কিছু এই অসম্পূর্ণ পদে যোগ দিতে, তাহাতে পীড়া হইল, আপশোষ হৃদয়ে ধোঁয়াইতে থাকিল, এবং খেদ করিল, অথচ মা। কত কথা আমাদেরই শুধু বলিল।

মা তুমি আবার উঠিয়া আসিলে কেন, কাঁথাটা গায় দাও, ইস এখনও বেশ জ্বর, এই সময় সে মায়ের কপালে হাত দিয়া বলিল, যে জ্বর, না বাবা আর হয়ে যাক্ আমি যাইব না। তোমার কাছে থাকি।

থাম, যে কথা বলিতে উঠিয়া আসিলাম, হাঁ্যা মন দিয়া শুন, ধীরে সুস্থে খাইবে, হাঁক-পাক করত কোন কিছু গোগ্রসে গিলিবে না, যেন কেহ না ভাবে হাঘর হইতে হাভাতে গরীব কাঙালের ঘর হইতে আসিয়াছে, এমন ভাবে আহার করিবে যেন লোকে নিমেষেই বুঝে মানী লোকের ছেলেপিলে, গরীব হইতে পারে তবে আত্মমর্যাদা আছে ; মন দিয়া শুনিতেছ, আর তুমি (বালক কে) আগে আগেই বলিও না, 'আর দিবেন না' বা 'থাক থাক' ; ও। শুধু আঙুল দিয়ে খাইবে—তিন চার আঙুলের, প্রথম কড় (মানে আঙুলের দাগ) পার যতটা না হয় মানে কড়ের নীচে না যায়—তাহা, দ্বারা খাইবে, কোন ক্রমেই হাতে তালুতে খাদ্যের দাগ না লাগে—যেন লোকে বুঝে ইহারা উচ্চ বংশের ভদ্র ঘরের, তোমাদের বাবার খাওয়া দেখিয়াছ ত কি পরিষ্কার, তিন আঙুলে কড়া পার হয় না।

বড়লোকদের মতন !

হাঁ মাছের কাঁটা ধীরে বাছিবে, লোভের জ্বালায় কাঁটা না ফুটে—জানিও লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। যদি অসাবধানতা বশতঃ একান্তই কাঁটা গলায় ফুটে তবে…

জানি মা ! ভাত দলা পাকাইয়া গিলিব

লুচি হইলে তেমন দলা পাকাইয়া গিলিবে ; কাঁটা ফুটিতেই অসহিষ্ণু হইয়া 'ওয়াক' শব্দ তুলিবে না, উহাতে অন্যের আহারের ব্যাঘাত ঘটে, 'ওয়াক' শব্দ নিম্ন শ্রেণীর লোকেতে করে—যতটা সম্ভব কাহারেও জানিতে দিবে না। কোন সূত্রেই হাত চাটিবে না, আঙুল চুষিবে না, কোন কিছু চটকাইবে

না। দধি আদি খাইতে 'সুপ' শব্দ করিবে না। কেহ যেন না বলে, কোথাকার ভিখারী। মনে রাখিও, আমরা গরীব হইতে পারি কিন্তু খুব উচ্চবংশে। আমাদের বংশ মর্যাদা কাক পক্ষী পর্যন্ত জানিত। ও ভাল কথা, খাওয়ার পর লবণ দ্বারা আঙুল মার্জনা করিও এবং যখন শুনিবে, 'উঠিতে আজ্ঞা হউক' তখন উঠিবে।

বাবা কি কোন মান মর্যাদা রাখিল।

বাপ পা ছাড়িয়া এক কাজ কর, কাপড়ের কষিটা খুলিয়া দাও, তাহাতে খুব আরাম হইবে, ঐ উপদেশ বৃদ্ধা দিতে মাত্র, বালক এমত তড়বড় করিয়া উঠিতে গেল যে বেকায়দাতে, নিজ কাপড়ের উপর পা পড়িয়া, সমস্ত কাপড় খুলিয়া পড়িল, ভাগ্যেশ সার্ট ছিল।

গোবর কুড়নী হাসিয়া যেমন ভাঙিয়া পড়িল, মন্তব্যেল, ওমাঃ কি কাণ্ড। গিঁট দিয়া কাপড় পর না কেন, তুমি ছেলেমানুষ। কষির এলা বাঁধন রাখিতে কি পার।

দাদা কি যে করিতেছিস্. এইবার ন্যাংটো হইয়া নাচ।

চুপকর পোড়ার মুখী। যে এবং কোনরূপে নিজেরে সামাল দিয়া অতঃপর বাপের কাপড়ের কষি খুলিতে এখন প্রস্তুত হইল এবং তজ্জন্য যেক্ষণে তাঁহার পিতার, সার্টটি পেটের উপর হইতে তুলিল, এবং বাবার ঢাউস্ পেট ওতপ্রোত হয় তন্মুহূর্তে তাহার মাথা চক্র দিয়া উঠিল, সমগ্র দেহ চমকাইয়াছে; যে এবং বিশ্বাস হইল, ফাঁকা মাঠের সেই ঘূর্ণায়মান বায়ু তদীয় দেহ মধ্যে সাঁধ করত 'বাতাপি বাতাপি' ডাকে যারপরনাই ঘোর রব তুলিয়া তাহারে প্ররোচিত করিতেছে, যাহাতে সে যেন বা ইল্বল—সেও অমনই ডাক দেয়—হায় সে এ পর্যন্ত জ্ঞানহীন যে, প্রায় নিষ্ঠুর ইল্বলের মতই 'বাতাপি' বলিয়া ডাকিতে উদ্যত হইল। আঃ ভগবান দয়াময় তিনি রক্ষা করিলেন।

কি হইল দাদা তোরে কি ভূতে পাইল নাকি।

এবং মেয়েটির সঙ্গেই বৃদ্ধা মহা তাজ্জবিয়া প্রকাশিল, বাপরে। পেটটা কি বা ফুলিয়াছে। এতক্ষণ গায়ের কোর্তা ইত্যাদিতে এতটা ত বুঝায় নাই। ব্যাপার কি। রহ। রহ। নাড়ী দেখি। অথচ তদীয় হস্তদ্বয় তেমনই আছে, —নাড়ী দেখার কথায় ভ্রাতা ভগ্নী আতঙ্কিত মা যদি শুনিতে পায়। সে উহাদিগের প্রতি ইতঃমধ্যে নেত্র পাতিয়া ভারী খুন খারাবী আমোদে তাহার স্বভাব মত ছেলেমানুষী হাস্যে লতাইতে ছিল এবং এই কালে, শতছিন্ন

আঁচলের কিছুটা এক হাতে লইয়া মুখে রাখে, এখন এই বস্ত্রখণ্ড মুখ হইতে সরাইতে থাকিয়া বিধৃতিল, তোমাদের ইসকুরুপ্‌ (স্ক্রু) ঢিলে তোমাদের! আমি অমুক হাড়ির নাতনী, আমার বাবার নাম অমুক হাড়ি, আমার জ্ঞান-গম্য নেই। তোমাদের মতন আমি আলুকে আলু বলি পানাকে পানা, সব! তবে সে বার কি হইয়াছিল, সেই যে উপোসী বামুন, তাড়ি-খোলার কাছে পড়িয়া, হাতের কালোঠাকুর (শালগ্রাম) একদিকে, জিনিসপত্র রাস্তায়, ভাবিলাম মরিয়াছে, কোন রকমে ডোঙায় তুলিয়া বাড়ি পৌঁছাইয়া দিলাম, বাড়ির লোক বলিল, করিলি কি! তুই হাড়ি। সর্বনাশ। নূতন হিমের দিন, বামুনকে তিনবার স্নান করাইয়া ঘরে তুলিল। জ্বর দেখে কে! ব্যাস রাত না পোহাইতে শেষ—বৈকুণ্ঠে চলে গেল! সেই হইতে পণ দেবদ্বিজ উঁচু জাতি স্পর্শ করিব না। সেই থেকে পণ আর পাপ করিব না!

এ পর্যন্ত কহিয়া বৃদ্ধা এখন পূর্বকার আসন ভঙ্গিতে বসিয়া বলিল, নাড়ী! আমার হাতের নাড়ী উহার নাড়ী দেখা নহে, এবং করজোড় বিমুক্তিয়া স্বীয় অতীব শীর্ণ কব্জির শিরা দর্শাইয়া ঘোষিল, আমার নাড়ী দেখিলেই, উহারটিও দেখা হইল সব নাড়ীর ভাল মন্দ এই নাড়ীতে যদি না রহিবে তাহার মনুষ্যজন্ম না ছাই, নাড়ী তোমার কি হইয়াছে, এতেক তরাস কিসের! পেট ফুলিয়াছে কেন বল।

অতীব সম্ভ্রান্ত ভদ্র নিমন্ত্রিতরা মহা সঙ্কোচে সবিনয়ে লোকটির নিকট উঠিবার আজ্ঞা চাহিলেন, লোকটি অনুমতি দিল।

এখন উঠিতে আজ্ঞা দেওয়া হউক।

মহোদয়গণ আমারে অপরাধী করিবেন না, আপনাদের যদি পেট ভরিয়া থাকে সে অন্য কথা; জানিনা অজ্ঞান বশত কত না দোষের ভাগী হইলাম। আমার মা যিনি অন্তরীক্ষে আছেন তিনি আমার হট্টকারিতায় অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন।

মহাশয় আপনার কথায় উত্তরে দেখুন পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। এই যজ্ঞী বাড়ি সার্থক।

মহোদয়গণ আপনারা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আহার্য সকল যদি আপনাদের মর্যাদা অনুযায়ী হইয়া থাকে, তৃপ্তিদায়ক রুচিকর হইয়া থাকে, তবে সত্যই যে আপনাদের সেবা করিতে পারিয়া আমার মায়ের কৃপা বাহু—আমি ধন্য মনে করি।

সেই বাচাল লোকটি বলিয়া উঠিল, তবে এইটুকু নিন্দার আছে, যে সত্যই বাঙালী সে বলিবে, দইটি আর একদিন থাকিলে বাসি হইয়া যাইত। তাহার এই বাওলা তামাসাতে সকলেই সভয়ে হাস্ত করিল। কেন না লোকটি কিছুক্ষণ আগে মাত্র লণ্ডনের পরিচয় দিল; বলিল শাস্ত্রকারেরা এবং অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষরা, শ্রাদ্ধে অন্ন খাইতে নিষেধ করেন কিন্তু বা আমি ভাত খাইতেছি। (অবশ্য ইহা নিয়মভঙ্গ অনুষ্ঠান। শ্রাদ্ধের অন্ন নিষেধের কারণ এই যে, পরলোকগত-র স্বভাব চরিত্র গ্রহীতাকে প্রভাবিত করে। এখানে প্রকাশ থাক, যিনি আজ ইহজগতে নাই তাঁহার স্থায় পূজনীয়া মহীয়সী নিষ্ঠাবতী মহিলা দুর্লভ।) আশ্চর্য তখন উহার ব্যঙ্গ উক্তি ভোজন স্থান অতি মাত্রাতে নির্জন হইল।

সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণ পুনঃ ঐ লোকটিকে, যে খাইতেছিল, তাহার উদ্দেশে প্রায় জোড় হস্তে (এক হাত এঁটো) নিবেদন করিলেন, মহাশয় যদিও জানি আমাদের…

পায়ে ঝিঁঝি ধরিয়াছে

জানি আপনকার নিকট উঠিবার আজ্ঞা চাহিয়া আমরা ভারী কাণ্ডজ্ঞান রহিত বিবেকহীনের স্থায় লোকাচার বিরুদ্ধ কাজ করিলাম, মহাশয় আপনি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

লোকটির নিকটস্থ মহিলা দুইজন তাহারা সস্নেহে কহিলেন, কোন কিন্তু নাই আপনার উঠুন।

মহিলাগণ লোকটিকে অপরিমেয় মাতৃবৎ যত্নে খাওয়াইতেছিলেন। দিদি যিনি, মধুর কণ্ঠে শাসাইলেন, মা তোমাকে যা ভালবাসিতেন, তিনি ছাড়িয়া যাইবার দিন তিনেক পূর্বে অদ্যও মনে আছে, '—' দিদি আলুশাক রাঁধিয়া পাঠাইলেন তখন বেলা প্রায় দুইটা এমনইতে যাহা ভাল হইয়াছে বুঝিত রান্না নামাইয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের পাঠাইত—গুনি খুলনার লোক উহাদের সম্পর্কে ছড়া আছে নাতি খাতি বেলা গেল। গুক্তি পারলাম না। এই ছড়া কাটিয়া মৃদু হাসিলেন, আহা '—' দিদি ভারি ভালমানুষ, বেচারীর জন্য বড় কষ্ট হয়, উঁহার ছোট ছেলেটি টাইফয়েডে ভুগিতেছিল জানলা দিয়া আম গাছে পাকা আম দেখা যাইত, রুগ্ন ছেলেটি বায়না করিত আম খাইব '—' দিদি প্রত্যহ তাহারে প্রবোধ দিতেন, ভাল হইয়া উঠ। ঐ গাছের আম সব তোমার কেউ হাত অবধি দিবে না। ছেলেটি উহাদের মায়া ত্যাগ করত চলিয়া গেল,

আর '—' দিদিও আম আর স্পর্শ করিলেন না। ও মা কি বলিতে কি বলিলাম মন না মতি হ্যাঁ সেই আলুশাক রান্না দেখিয়া মা বলিল, আমার—রে পাঠাইয়া দাও, শেষে দাদার সেরেস্তায় কে ছিল তাহারে সাইকেল করিয়া তোমার বাড়ি লইয়া যাইতে হুকুম! তুমি না খাইলে মা বড় কষ্ট পাইবেন না বলিও না। খাও।

বালক দেখিল ছায়া, সে মুখ তুলিয়াছে, প্রত্যক্ষ করে জনা তিনেক কাহারা যেন—ইহারাও যেন ধুঁকিতে আছে গায়ে জামা ইহাদের অধস্তন পাঁচদশ পুরুষ পারিতে পাইবে না ইহাদের মুখ সহানুভূতিতে আরও বদমাইশের মত হইয়াছে।

মাছ আনিয়াছি ভেটকী রুই।

রাখিয়া দাও। মা বলিতেন, কি কষ্ট করিয়াই না রোজ ভগবৎ পাঠ করিতে আসে। জাতে বামুন হইলে উহাতেই অনেক পয়সা পাইত। মজিলপুরের লোকেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছে এমন পাঠ তাহারা শুনে নাই। ধীরে ধীরে খাও ইস তোমার বৌ বেচারী সে আসিলে কি আনন্দই না হইত।

ঘাটে যাহারা মুখ ধুইতেছিল, তাহারা আলোচনা করিতে থাকে, কি ভাবে চালাইতেছে। এত খাওয়া।

মনই খায়। মন যদি না খাইয়া থাকে তবে সে কিছু বোধ করে না··· শ্রুতি আছে ব্যাসদেবকে গোপিনীরা যমুনা পার করাইয়া দিবার জন্ত ধরিল ব্যাসদেব উহাদের নিকট কিছু খাদ্য চাহিলেন, বলিলেন, আমি ক্ষুধার্ত্ত। গোপিনীরা ক্ষীর ননী দিল ব্যাস তাহা খাইয়া যমুনার নিকট যাইয়া দেখিলেন একটি নৌকা পর্যন্ত নাই, কহিলেন, হে যমুনে আমি যদি কিছু না খাইয়া থাকি তবে দুই ভাগ হইয়া যাও। যমুনা দুভাগ হইল। গোপিনীরা পার হইতে থাকিয়া ভাবিল বুড়ো বলে কি! কিছু না খাইয়া থাকি! (ইহা ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন)

আছে হটযোগের খেলা।

কিরূপে, কোন পন্থায় কথি আলগা করা যায় এমত কিছু যে সে ভাবিতে আছে, ইহা অন্তত বালকের মুখের চেহারাতে বুঝায়। গোবর কুড়নী তাড়া দিল, অমন বসিয়া থাকিলে রাত পোহাইয়া যাইবে। হাত লাগাও।

বালক আপন আড়ষ্টতা কাটাইয়া গোবর কুড়নীর প্রতি নিরখিতে আছে,

এখন নিশ্চয় করে যে বৃদ্ধা নাড়ী না ধরিয়া থাকিলেও, মুখেও কোন ভাবান্তর নাই ; ইস ! যখন সে নাড়ী আপন শিকরের তুল্য অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শিল, তখন বৃদ্ধার চক্ষু শিব নেত্র (অর্ধ নিমীলিত যাহা) হইয়া আছে ; তখন বালকের বক্ষঃদেশ সিঁটাইয়া উঠিল, নিঙড়াইল ! তখন তাহার দৃষ্টি তীর বেগে ছুটিতে আছে, হঠাৎ থমকাইল, তদীয় বুদ্ধি অদ্ভুত সংস্কার লভিয়াছে, বিশ্বাস যাহাতে করিল সমস্ত ত্রিভুবনের নাড়ীর খবর তাহাতে কিছু সে বিহিত জানে। এই কি সেই অনেক জন্মের সুকৃতির পুণ্যে বাবা বলিয়াছে যাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—ইহারা সত্যযুগের মানুষ ইহারা শালতমাল বৃক্ষ এবং কাক পক্ষীর ন্যায় (আর বিষ্ণু ব্যাস আদি নয় জন, আবার অন্য মতে, শুধু সাত জন) বহুকাল এই পৃথিবীতে আছেন !

নিশ্চয় কৈ আমি ত আমার মায়ের জ্বর আমার নাড়ীতে টের পাইনা—অবশ্য এমন যে করা যায় ইহা আমি জানিতাম না ! কি দারুণ ঐ বৃদ্ধা ! গরীব ছেঁড়াছুটা উহার ছলনা—আমি উহার নিকট এই চমৎকার ম্যাজিক শিখিব !

তুমি জজ ব্যারিস্টার হইবে, সি আর দাস হইবে পাঁচ মোহর তোমার ফি ! (সি আর দাস অর্থে চিত্তরঞ্জন দাস ; ইহা কি লজ্জার কথা, মাথা হেঁট হয়, যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে, আমাদের মত লোককে পাঠকের নিকট পরিচয় দিতে হইতেছে। আমরা শুনিয়াছি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে জানিনা ইহা সত্য কিনা ! এতদ্ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ ও স্বাধীন হওয়া অনেক প্রভেদ ! তাই ওই নামটি ভুলিয়াছি !) বেচারী বালক জানে, ঐ আকাঙ্ক্ষায় সে নিজেকে ভবিষ্যতে শয়তান তৈয়ারী করিবে। অবশ্য ঠাকুর যদি উহাকে দয়া করেন—তবেই রক্ষা !

বৃদ্ধা নিশ্চয় বাবার কোন একটা বিহিত করিতে পারে ! বাবা কেন মরিতে গৃহিণীদের কথা শুনিতে গেল ! আঃ সেই ছেলেটি, যাহার একটি দাঁত পোকা খাওয়া কি অসভ্য ছোটলোক বলিল, এই সব লোক (তাহার বাবার উদ্দেশে) পরের পয়সাতে টিনচারাইটিন খায়। (টিনচার আইওডিন) এখানেই সে থামে নাই : মস্তবিল্যল, জাত ভিখারীরা এমন হয় না এবং সহানুভূতির ভান করত প্রকাশিল, বেচারা খাইয়া লউক, গরীব মানুষ এত ভাল আর কোথায় পাইবে ! ইহাতে তাহার নিকটস্থ বালকগণ মহা চাপল্যে হাস্য করে।

বালকের চোখ ফাটিয়া জল আসিল, সাবরেজিস্ট্রী অফিসের কর্মচারীর পুত্র তাহারে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ; বালকের বিস্মৃতিতে সে সত্বর কুলকুচির জন্য এক মুখ জল লইয়া সেই ব্যাদরা বালকের মুখে কুলকুচি ছিটাইয়া কহিল, তোর মত ছোটলোকেরে হাত দিয়া মারিতে লজ্জা হয় শালা ছোটলোক, এক নম্বর চোর তোর বাপ্‌। (ইহার বাপ কোন প্রতিবেশীকে সোনার বোতাম বলিয়া ধার দেয়—প্রতিবেশী দুর্ভাগ্যবশত উহা হারাইয়া ফেলিল, ইহার বাপ শুনিয়া বলিল, উহা নিরেট সোনার ছিল, এবং দাম আদায় করিল, কিছুদিন পর ঐ বোতাম পাওয়া গেল, স্যাকরা কহিল, ইহা সোনার জল করা রূপার বোতাম) জালিয়াত। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ডেভিডএজরা তোমাদের পত্তনিদার—গড়ের মাঠের জমিদার।

ব্যাদরা বালক ইত্যাকার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাহার নিকটস্থ বালকরা পালাইয়া গেল এই ব্যাপার নিমিত্ত বটে উপরন্তু বয়সীরা এই সময় ঘাটে মুখ ধুইতে উপস্থিত হইলেন ; একজন খড়কে দাঁতে দিতে থাকিয়া বলিলেন, তবে এই মনে হয় আহার্য সব বড়ই গুরুপাক যেমন গরম মশলার ব্যবহার তেমনই সরিষা লঙ্কা ইত্যাদির তাহার পর তৈল ঘৃতের ছড়াছড়ি ! পাঁচ/ছ রকম মাছ ! হজম হওয়া দুষ্কর, এত উহার ঐ ব্যক্তির খাওয়া ঠিক নহে।

গুরুপাক মানিলাম ; তবে গল্প আছে, এক একজনের সহ্য ক্ষমতা অবিশ্বাস্য ; লর্ড ক্লাইব নবাব সিরাজদ্দৌলা যাহা খাইয়া থাকেন তাহাই খাইতে চাহিলেন ; বাবুর্চি কহিল, মহাশয়, যেভাবে মাংস তৈয়ারী হয় শ্রবণ করুন, (জানিনা কতদূর সত্য) গোখর সাপ একটি মুরগীকে ছোবল মারিয়া মারিল, ঐ মৃত মুরগী খণ্ড খণ্ড করিয়া অন্য একটি খাওয়ান হইল সেইটি মরিল, এই ভাবে পর পর কয়েকটি ; সর্বশেষ যে মুরগীটি বেশ চলাফেরা করিবে, সেই মুরগীর মাংস নবাব খাইতেন। ক্লাইব তেমনই পাক করা মুরগী খাইলেন, খাওয়ার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে লাফালাফি, গরম। কোট সার্ট অন্তর্বাস খুলিয়া ক্লাইব পুকুরে পড়িলেন। যাহার পেটে যাহা সহে। নিশ্চয় ঐ ব্যক্তিরও অভ্যাস আছে।

গোবর কুড়নী বুড়ী কহিল, ও বাপ কম্বিটা খুলিয়া ফেল।

বালক পুনঃ সার্ট উঠাইল, পুনঃ সেই উদর সেই বিপুল চাউস স্ফীত ! একদা বালক বিচারিল, তবে বাবা খাওয়া দাওয়ার পর মুখ প্রক্ষালনাদি কর্ম কিরূপে সম্পাদন করিল। কেননা করিতে সম্মুখের দিকে দেহ অবনত এক

আধবার বাঁকাইতে হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া লইতে একাগ্র হওয়া মাত্র শুনিল বাতাপি!

ইহাতে এক যুবতীরমণী যাঁহার কানে উহা আসিল, যিনি ঐ টায়রা পরিহিতা বৌটির অসভ্য কাণ্ড দেখিলেন, তিনি বিশেষ মর্মাহত হইলেন, আঃ কি মহীয়সী, কি পর্যন্ত শ্রদ্ধার ইহার ভাব গাম্ভীর্য, তিনি তৎক্ষণাৎ নিদারুণ চাবুক কণ্ঠে নিন্দিলেন, ছি ছি বৌ তুমি কি চিমটি কাটিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় তোমার রক্ত মাংসের শরীর কিনা, এই সব অসভ্যরা শিখাইতেছ, লোকে তোমার বাপ শ্বশুরকে কি বলিবে। ইতরের ঘর! ছি ছি তুমি না আজ বাদে কাল বিয়াইবে। লজ্জা নাই। এবম্প্রকার ভৎ‍‍র্সনা কালে, তাঁহার রূপ কি অবাক সম্ভ্রান্ত শত শত লোক তাঁহারে কুর্নিশ করিতে আছে, যেন সম্রাজ্ঞী। নিশ্চয় গত জন্মে রাণীভবানী উনি ছিলেন, আঃ উহার হাতের টালি প্যাটার্ন-এর চুড়ি কি সুন্দর। আমি জলপানির টাকা জমাইব মাকে গড়াইয়া দিব! মাগো আমরা এত গরীব কেন?

মা সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, কখনও বলিতে নাই, ভগবান অসন্তুষ্ট হন।

তুমি বাবা সবাই ত বল।

বলি, কিন্তু কখনও কেন জিজ্ঞাসা করি না। জিজ্ঞাসার মত পাপ নাই! আর জানিবে নিশ্চয় গতজন্মে কোন পাপ হয়।

এই লোকটি কে। নিশ্চয় ভিখারি, কাঁধে থলি, বাম হাতের অর্ধেক নাই, একটি পা ছোট শীর্ণ বাঁকাচোরা-শরীর ক্রাচে ভর দেওয়া লোকটি উচ্চিংড়ির মতন, ছোট লাফে তাহাদের পরিক্রমণ করিতেছিল।

আ খেলে যা। অমন করিয়া চক্র দিতে আছিস কেন। বৃদ্ধা ধমকাইল।

দেখিতেছি বেচারার বাবুর কি হইল। এই এক রত্তি ছেলে, উহার দ্বারা কষি খোলা কি সম্ভব। ওহে তোমরা এসনা, বৃদ্ধা ঐ যাহারা তিনজনা রাস্তার উপরে বসিয়াছিল তাহাদের কহিল। এবং পরক্ষণেই চোপ বেটা ভিখারী, ভিক্ষা চাইবার সময় বাবুমহাশয় এখন একেবারে মাথার বাঃ।

ঘাট হইয়াছে।

ঐ তিনজন কহিল, আমরা উহাতে নাই, উঁচু জাত, যাই অহার পর নালিশ ঠুকিবে আমার গেঁজে (লম্বা কাপড়ের থলি বেল্টের মত কোমরে বাঁধা হয়) বা ট্যাঁকে এক কুড়ি টাকা ছিল নাই;

বৃদ্ধা কহিল, তুমি চেষ্টা কর।

ক্রাচের ভিখারী, উপদেশ দিল, বাবু আপনি পেটটা একটু যদি টানিতে পারেন তবে গম্বরা হয় (গভীর) অনায়াসে কষি খুলিয়া ফেলা যায়।

তোর কি কোন জ্ঞানগম্য নাই। গম্বরা করিতে পারিলে, এইকাণ্ড হয়। সর্। লও বাপ তুমি হাঁ করিয়া রহিলে যে, কোঁচার পরত আস্তে করে খুলে, একটির পর একটি। হ্যাঁ কষি জাঁকিয়া বসিয়াছে তাই ত মানুষটির প্রাণ ওষ্ঠাগত।

বালক বৃদ্ধার কথামত কোঁচা খুলিতেছিল, সে বেশ আড়ষ্ট কেন না ক্রাচের ভিখারীটা অনবরত সাবধানিতেছে, খুব ধীরে, খুব আস্তে। যেহেতু বাবা বেচারী এতটুকুতেই অর্থাৎ কোঁচা যাহা চাপিয়া বসিয়াছে, তাহা শিথিল কারণে যন্ত্রণাদায়ক যদি হইল তখনই মহাবেদনাতে ডাক ছাড়িয়াছে। ক্রাচের ভিখারী একবার এইপাশে মুহূর্তে অন্য পার্শ্বে যায় আর মন্তব্য করিতে আছে।

আ খেলে যা! মা আতান্তরে পড়িলাম ত। কেন ঘাবড়াইয়া দিতেছ, যাও একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাক। এবং পরক্ষণেই লোকটিকে সস্নেহে বিরক্তি ভানে কহিল, একটু সহ্য করিতে হইবে, বটে ছোট ছেলে সহায় সম্বল নাই। তুমি হাওয়া কর থামিও না, মেয়েটিকে আদেশিল। এখন কোঁচার দিকে তাকাইয়া বলিল, বাঃ আর কয়েকটা পরত! বুঝিলে সব খুলিবার পর কাজ আছে বুঝিলে, তেল আর কোথায় পাইবে শুধু জল মালিশ করিতে হইবে। পেট ঢাউস!

লোভী!

ইনি আমার বাবা।

নোলা সর্বস্ব!

ইনি আমার বাবা!

পেটুক!

ইনি আমার বাবা।

বৃদ্ধা হাত তালি দিল মুঠেরা গলাতে ঘোষিল, যাক্ একটা গাঁট পার হইয়াছে ও বাবু কিছু আরাম পাইতেছ! এবং সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বালককে নির্দেশিল, এবার কাছার কাপড়টা খুলিতে পারিলে কেল্লা ফতে। তখন জল মালিশ।

এ নিশ্চয় অনিয়মে অমন ধারা হইয়াছে, যেটাইমে অবেলাতে খাওয়াতে

যাহাদের গ্যাসের রোগ আছে। ইহা অদূরে যে কয়জন বসিয়াছিল তাহাদের একটি প্রকাশিল। তাহাদের এরূপ হয়। একটু নেবু দিয়া সোডা। শুধু সোডা থাকিলেও...

সোডার অভাব কি আমার কাছেই আছে—আমার যে অম্বল সোডা ব্যতিরেকে দুই পা চলিতে পারি না। সোডার অভাব নাই।

তাহা সেই গল্পটি কত চমৎকার, যাহা এইরূপ, একজনা ব্যক্তি অতিমাত্রায় ভোজন করিল প্রাণ যায়। এমন সময় লোকে হাকিম ডাকিল। হাকিম হজমের দাওয়াই দিলেন। সকালবেলা লোকে উঠিয়া দেখিল, যে, যে ব্যক্তি দাওয়াই খাইয়া ছিল, সে বেমালুম সশরীরে হজম হইয়া গিয়াছে—পরণের জামা কাপড় তক্তাপোষে পড়িয়া আছে।

বৃদ্ধা ধমকাইল, মহা বেআক্কেলে দেখি! সোডা ইহার উপর, কোথাকার হাতুড়ে, সোডা দিলে বায়ু ঠেলিবে না! দেখিতেছ পেটটা উদরী রোগী (ড্রপসী) সমান হইয়াছে, তোমাদের কি মায়া দয়া নাই! এখন তেল জল, অভাবে শুধু জল! মালিশ। এই পোড়ার মুখো ঐখানে কেন—এই গঞ্জনা সে ক্রাচের ভিখারীকে দিল, পুনঃ অন্য কণ্ঠে লোকটিকে কহিল, একটু সিধা হইয়া বাবু বসিতে হইবে।

বাবার বড় কষ্ট হইবে।

তুমি থাম ত। হ্যাঁ আর একটু, সার্টটা আস্তে করিয়া টান, বাবু তুমি সার্টটা ছাড় দাও। টান। আবার তুমি অমন করিতেছ।

ইহা শ্রবণে ক্রাচের ভিখারী থতমত হইল, নিশ্চয় বেচারীর একটু উপকারে লাগিবার সাধ ছিল, তাই সে ঈষৎ অস্থির। এমত সময় বৃদ্ধা কহিল, কিছু যদি কাজে লাগারই মন ত একটা বড় কচু পাতা লইয়া রৌদ্রে আড়াল করিয়া মরণ দাঁড়াও না এবং বালককে জিজ্ঞাসিল, তুমি কাছাটা সব খুলিয়াছ। ব্যাস এবার দেখ দেখি কষিটা শিথিল করিতে পার কি না। এবং উদগ্রীব হওয়ত দেহ ও ঘাড় বাঁকাইয়া বৃদ্ধা তাকাইয়া রহিল; কয়েক মুহূর্তে বাদেই লোকটি হঠাৎ মরিয়া হইয়া যা থাকে কপালে সঙ্কল্পে, কোন উপায়ে আপন কষির একটি দিক খুলিয়া দিল, তদ্দর্শনে বৃদ্ধা জয় মা দুর্গা। কাঙালের মা-গো দুখীজনের মাগো। ফুকারিয়াছিল এবং বিশেষ গম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশিল, লও খুব সন্তর্পণে আস্তা টান দিতে থাকিয়া ডান দিকেরটা খুল; দেখিতেছ ত মানুষটা কেমন কাতরাইতে আছে, যে জ্বালায় কোমর জ্বলিতেছে। খুব সাব-

ধান। বাঃ ও মেয়ে তুমি বাপের কষির এখানে হাওয়া দাও কিম্বা ফুঁ দাও দেখি।

এইভাবে যখন কিছুটা সময় অতিবাহিত হইবার পর, লোকটি চীৎকারিল ওরে মা ওরে মা আমার কোমর জ্বলিয়া গেল। আমিও গেলাম।

বালক বালিকা ক্রাচের ভিখারী কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না, বৃদ্ধা নির্বিকার এবার দারুণ রুক্ষ গলাতে উচ্চারিল, মরণ, হা দাও, ফুঁ দাও, যমের সঙ্গে লড়াই এমনই হইবে। ভিজাকাপড় এখানে দিয়া ফুঁ দাও; দেখ কেমন আরাম পাইতে আছে; লও বাপ তুমি, একটা কিছুতে করিয়া জল আনিতে পারিলে ভাল হইত।

বালক ভগনীকে অতীব নিম্ন স্বরে প্রশ্ন করিল, ছাঁদাগুলির মধ্যে সরা আছে না…

লোকটি ঐ অর্ধমৃত অবস্থা হইতে খাবাইয়া নিষেধিল না না উহাতে হাত দিবে না, সরা লইবে না, মরি সেও ভাল।

তাহা হইলে কচু পাতায় কতটা আর হইবে।

ক্রাচের ভিখারী সভয়ে কহিল—আমার নিকট একটা কৌট আছে; আনকোর আমাকে পত্তনিদার দিয়াছে।

লোকটি বলিল, উহাতে দোষ নাই। জলের ছিটা দিয়া লও।

দেখ এঁটো হাত ফাৎ লাগাস্ নাই ত। তুমি বাপ এটা একটা পাতা দ্বারা ধরিয়া লইয়া যাও বেটার পাপ না হয়।

মাইরী না। হাতফাৎ, আমার পাপের ভয় নাই।

আনিয়াছ, বেশ পেটে জল আছড়া দিয়া মালিশ কর। দেখ এখনই আরাম পাইবে কর। কর! তুই—ক্রাচের ভিখারীকে আজ্ঞা দিল, মাথার কাছে হাওয়া কর। ওগো তোমরা ঐ গাঁয়ের কাউকে ডাকিয়া পাও কি না। জিজ্ঞাসা কর সালতি কার।

উত্তর দিকের মাঠের মধ্যে ছোট একটি গ্রাম এই খাল হইতে সরু এক জল পথ ঐ দিকে গিয়াছে। ঐ লোকগুলি তারস্বরে চীৎকার করিয়া প্রথমে সাড়া লইল এবং পরে জিজ্ঞাসিল সালতি কার এইধার আইস।

বৃদ্ধা কহিল, ঘরে পৌঁছাইয়া অবগাহন। বুঝিলে ভুলিও না।

সালতি উঠিয়া ভ্রাতা ভগনী বড় ছলছল চোখে গোবর কুড়নী ও ক্রাচের ভিখারীর দিকে, ভগনী ভ্রাতাকে, সে মস্তকে দুই হাত স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া।

ছিল, ঈষৎ ঠেলা দিয়া বলিল, দাদা আইস উহাদের আমাদিগের বাটি যাইতে কহি। আশ্চর্য বালক ইহাতে নিমেষের জন্য উহাদের প্রত্যক্ষিল, একটি গোবর কুড়নী অন্যটি ভিখারী তৎক্ষণাৎ নিজেরে ধিক্কার দিবার বিবেক তাহার ছিল। এবং অন্যমনস্ক আছে, কাহারে সে ভাবিয়া ছিল, জলাতে থাকে, আপেয়া হয়। তখন নিমন্ত্রণ করিল এ যাবৎ তাহারা তেমনই দাঁড়াইয়া ছিল।

এমত সময় লোকটি মেয়েকে বলিল, মা রে ছাঁদাগুলি ধরিয়া থাক, উল্টাইয়া না পড়ে, কোটটা, উড়ানি বিঁড়ে করিয়া দাও। এক ছিটে উহার যদি পড়িয়া যায় আমার বড় কষ্ট হইবে।

বালকের মনে রওনা হইবার প্রথম পর্ব আভাসিত হইল। বাবার দুই হাতে লম্বাটে পাশ বালিশের ওয়াড়ের মত দুইটি পুরাতন কাপড়ের থলি; ঐ থলিতে যে হাঁড়ি সকল আছে তাহা কাপড়ের উপর হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়, বালক অসম্মানে লজ্জায় লোক সমাজের টিটকার বিদ্রূপ—পুড়িতে আছিল. এখানে ঈষৎ নির্জনতায় সে বিলম্বিত সর্পের ন্যায় বাবাকে আক্রমণ করিল। লঘুগুরু জ্ঞান তাহাতে ছিলনা। উন্মাদ হওয়ত, প্রকাশিল লজ্জা করেনা, সকল ব্যক্তি হাস্য করিতেছিল। গাণ্ডেপিণ্ডে সাত জনম যেন···, এখানে তোতলাইতে লাগিল; এ সময় কানে আসিল 'দাদা কি হইতেছে' কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করিল না পুনঃ কণ্ঠস্বর শানাইয়া ব্যক্ত করিল, লোকে হাওতালি দিতে বাকি রাখিয়াছে, তাহার উপর এত লইয়া ছি ছি আমাদের ভিখারী বলিবে না ত কাহাকে বলিবে ছিছি।

আমি কি চাহিয়াছি? তুই কি আমাকে কি ভাবিস্? বলত মা··· । আমি না তোর বাপ।

মেয়েটি বাপের কাতর উক্তিতে বড় পীড়িত হওয়ত কহিল, ও ছোট লোককে কি বলিবে।

আর অনেক নিন্দনীয় কথা বালক মহাদম্ভে তাহার বাবাকে শুনাইল, যাহাতে লোকটির চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল এবং সেখানে বসিয়া কাঁদিতে থাকিয়া আক্ষেপিল, তুই আমাকে শেষে এই বললি, তোর কি মনে হইল না আমরা এত ভালমন্দ খাইয়া যাইতেছি, তোর মা বেচারী একা পড়িয়াছে একটু যদি লইয়া থাকি তাহাতে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়। আর আমি চাহি নাই তাহারা আহ্লাদ করিয়া দিয়াছে।

বালক থামিবার পাত্র নহে কিন্তু বাবার চোখে জল তাহাকে একটু ভ্রমে

ফেলিয়াছে কি বলিবে, ছেলেমানুষের বুদ্ধিতে কুলাইল না। উত্তর দিল চাও নাই আবার ঐ পকেট ভর্তি নেবু নেবুর পাতা। ঝাড়া এক ঘন্টা যাহার জন্য দেরী।

বাপ ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল।

মেয়েটি এতেক ক্ষিপ্ত যে দৌড়াইয়া গিয়া বালককে এক ঠেলা মারিয়া গাল দিল, ছোটলোক শালা!

ইহা কি! হ্যাঁ! ছিঃ! ক্রন্দিতে চোখে লোকটি কোনক্রমে সংস্কার বশত ব্যক্ত করে, ইহার সহিত যার পর নাই মায়িক স্বরে জানাইল, ঐ দুটি নেবুর পাতা তোর মায়ের জন্য, একটিই ত জিনিস ভালবাসে, কোন কিছুত জ্বরের জন্য মুখে পর্যন্ত দেয় না জ্বরে কালাইয়াছে মুখে তাহার তিক্ত লাগিয়া থাকে— তুমি জাননা। তাই নেবুর পাতা তেঁতুল দিয়া একমাত্র খাইতে ভালবাসে তাই চাহিয়াছি তাহাতে কি আমার মান গেল! এখানে তাহার বুক মহা অভিমানে ক্ষোভে আলোড়িতেছিল, সেই কারণে ইহার পরে উক্ত শব্দ বেশ জড়াইয়াছে যাহা এই, নেবুর পাতার জন্য ভিক্ষা করিতে হয় দূর ছাই শুনতে হয় তাহাও স্বীকার।

বাবা কান্দিতেছিল।

মা কোন মতে বিছানা ছাড়িয়া দুই হাতের ঐ বোঝা দেখিয়া অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইল, তদীয় চোখ ছিঁড়িয়া জল আসিল এবং দাওয়ার খুঁটিতে আপনকার কপাল নিদারুণ অবমাননা বোধে ঠুকিতে লাগিল; মেয়েটি অদ্ভুত স্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া মা মা বলিয়া উহার হস্ত ধারণের চেষ্টা করিলে মা তখন তাহার স্বীয় হাত দিয়া দূরে সরাইয়া অদ্ভুতে কোপে উচ্চারিল, খবর্দার আমায় মা বলবি না, আমার কপালে এত…আমার মরণ হয় না, ঠাকুর আমি কি এমন পাপ করিলাম যে আমাকে জন্মান্তরের শত্রুর হাতে তুলিয়া দিল,…পাত কুড়নীরাও এমন করে না! ছাঁদা বাঁধিয়া আনিলে—লক্ষ্মী আর কখনও এখানে আসিবেন।

মেয়েটি দাওয়াতে পা ছড়াইয়া ভয়ঙ্কর কাঁদে, ল্যাম্পোর আলো পিতা পুত্রের মুখে কম্পিত হইতেছিল, দুইজনে দুইজনকে নেহারিবার জন্য প্রয়াসিল। বালকের মুখ বাপের মত শুকাইয়াছে এবং সে বাপের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতেছিল। কেননা বাপের মমত্ব বোধ যে কি তাহা কে জানে।

বাপ কহিল, মাগো, তোর মাকে বলিবি না যেন, তোর দাদার আমাদের কোন কথা। তোর মা বড় দুঃখু পাইবে

মা বাবা। হ্যারে দাদা কৈ মাছের পরেই ত রুই তারপর

না মা কৈ এর পর চিঙড়ীর মালাইকারী

হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা তোর সব মনে আছে আয় মিলাইয়া লই। যদি ভুল হয় মা'র যে কি। সব বলিতে হইবে।

এখন ল্যাম্পোর আলোয় বাবার পেটের প্রতি দৃষ্টি পাতিয়া বালকের জিহ্বা শুকাইয়াছিল। তবু বিভ্রান্তিতে মায়ের খেদকে প্রশমিত করনে সহসা বলিয়া ছিল, বাবা যে ফিরিয়া আসিয়াছে ইহা ঢের। (ইহা গোবর কুড়নীর কথা)

ইহা মা'র কপাল ঠুকিতে থাকা ঈষৎ ধীরে হইতে আসিল। তদ্দর্শনে বালক মনোবল লভিয়া, যতখানি না বলিলে নয় তত অবধি বিশদিল।

ইহাতে মা স্থির মেয়েটি মাকে বুঝিয়া লইয়া কহিল সব দোষ তোমার তোর, তুই ত যাহা করিলি, এই অবধি বিস্তারিয়া শেষে যথেষ্ট বুক ফাটা অভিমানের গলা করিয়া প্রকাশিল, তোর খুরে খুরে দণ্ডবৎ বাব্বাঃ যাহা নীলা (লীলা) দেখাইলি।

বাপ তৎক্ষণাৎ যোগ দিয়াছে, তোর মাকে আর কষ্ট দিসনি মা।

মা গোবর কুড়নী পৈ পৈ করিয়া বলিয়াছে, অষ্টপ্রহর পরে হইবে তবে ঢুটি জলভাত নেবু দিয়া দিবে মা আমাদের এখানে কাঁজি কেউ করে

থাম থাম তোর দাদা কি করিয়াছিল বল?

উহাকে ছাড়া, আমিই বলিতেছি, আমার ভীমরতি তোমার বড় পুত্র রাগিয়া ছিল।

মা নেবুর পাতা,

আঃ

আমার খাওয়ার বহর দর্শনে লোকে

ইস আমার আমার…

নেবুর পাতাগুলি

ঝাঁটা মারি নেবুর পাতায়, আবার সোহাগ দেখাইবার জন্ত দুইটা নেবুর পাতা, মরে যাই লোকে বলিবে, আহা অমুক বাবুর মতন মাগ পেরান, মাগ অন্ত পেরান লোক আর দুচারটি থাকিলে রামরাজ্য হইত। ছি ছি কোন লজ্জায় তুমি খাইলে, সারা যজ্ঞী বাড়ি তোমারে লইয়া রঙ্গ তামাসা করিল। মাগো আমায় আঁতুড়ে নুন দাও নাই কেন…উঃ। মার কণ্ঠ নিদারুণ অপমানে

রুদ্ধ হইয়া আসিল, একে জ্বর তদুপরি এই মন যন্ত্রণা মা প্রায় উন্মাদ। অনবরত এক কথা আমার মরণ হয় না। এবং ভূমিতে শুইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাপের নিমিত্ত ব্যথিত কন্যা কহিল ঢের হইয়াছে উঠ কি যে কর।

ইহার পর বালক নিশ্চই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ এখন ঘুম ভাঙিয়াছে এবং ছতরিতে বিরাট একটা হাতের ছায়া সে দেখিল শুনিল মা বাবাকে বলিতেছে, আর একটা খাও পারিবে না। তোমার কতটা খাইলে পেট ভরে আমি জানি না, উহাদের দিয়াছি, এ সন্দেশ থাকিবে না কাঁচা পাকের ত কাল খারাপ হইয়া যাইবে। লহ আর একটি।

মাধবায় নমঃ, তারা ব্রহ্মময়ী মা আমার! এখন, আমরা মহাপীঠস্থানের খেলার দৃশ্যাবলী নামক গল্প আরম্ভ করিতে আছি, সে এখনি, ঐ বিরাট জেল-খানা হইতে বাহিরে আসিয়াছে, নিমেষখানেক আগে যে তুমুল মাত্রাতে কষাম্বিত যান্ত্রিক তালা হইতে, ও লৌহ দরজার হাঁসকলের, এবং শব্দ, ইহা এমনও যে খাকী পোষাকে রক্ষীর কর্তব্য সম্পাদনেতে দেহ মোচড়ের, যাহা বটে অঙ্গবক্র করিতে ঘটিবে, ও বুটের নাল হইতে যাহা, তৎ সমুদয়ই যন্ত্রের! —এ সকলের মিলিত শব্দ সে শুনিল।

প্রত্যেকটি ইহা সুবিদিত যে আর আলাদা বোধিত না; যে এবং তদীয় পশ্চাতের যাহা, অতীতের যাহা কিছু সেই সকল ঐ শব্দর সহিত মিলিত হইয়াও ইদানিং সমাধিক প্রতিপন্ন হইল; ইহা আতঙ্কের, না; জড় করে এমন, না, অবশ্য একটি কিছুর শব্দ নির্ঘাৎ, যে সে আপনকার পৃষ্ঠদেশে হাত দ্বারা সেইটির তত্ত্ব করিতে হাবাল হয়, পরক্ষণেই যে সে মহা হন্যে হওয়ত হাত দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল তল্লাসিয়া পাইয়া এখন উহা জ্ঞাত হইতেই যে মুখমণ্ডল আছে তারস্বরে বিঘোষিত ইচ্ছিয়াছিল যে, কোথায় সেই মানুষ যাহার কম্পন আছে!

ঐ শব্দর ভেদক্রমে লইয়া সে ভাল এই খোলা জায়গাতে বর্তাইতে আছে; যে অনেকের মধ্যে সে একটি নহে আর, সে হয় এখন এক; ইহা লিখিত এবং সে আপনারে সহায়হীন জানিবে; আবার, তিলেক বাদে আঃ স্ফুট হইবে তাহার ওষ্ঠতে, কেন না এ পর্যন্ত দিনবহন জনিত ক্লেশ, ইহা ঘাড় হইতে অন্ত প্রত্যঙ্গতেও ব্যাপিয়াছিল, যাহার রহিত এখন ঝটিতি ঘটিয়াছে।

আঃ···সে জেলছাড় লভিয়া অবশেষে মুক্তির গল্প। অতএব সে অত্র পীঠস্থানের এই তাগড় নগরের, যে কোন শো উইনডোর কাঁচে নিজে মুখ দেখিবার খুসী পাইবে, ইহাই সভ্যতার কথা। এই সেই স্থান যেখানে আসিয়া কত কয়েদী চীৎকারে ক্ষেপিয়াছে, কেহ কান্দিয়াছে, অট্টহাস্য কাহাকেও ভূতলশায়ী করিয়াছে, কেহ নিজ পদদ্বয়ের গুলে সজোরে ঘুষি

মারিয়া শক্তি পাইয়া, বিল্লিচাল দৌড়িয়াছে এখান হইতে ; এই সেই জমি, যেখানেতে অনেক দুষমন লাথি মারিয়াছে মহা আকোচে, থুতু ফেলিয়া শাঃল্লে, উদগারিয়াছে।

অন্যকোন দুয়ারের, বেশ্যার শাস্ত্রমতে মাটিতে পুণ্য আছে, কেননা পুণ্য ত্যজিয়া লোকে দুয়ারটি ভেদ করে ; ঐ তুলনাও অপ্রাসঙ্গিক। উপরন্তু এই নিমিত্ত ; যে, কতবারই না বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বঙ্কিমবাবুর সিদ্ধি এইখানে 'বন্দে মাতরম' পরিহসিত হইল, এবং কতভাবেই না ভগবৎ প্রেরিত মহাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ যাঁহার সাধনাতে মানুষের সহিত পিতৃলোকের, আকাশের, ভাব সম্পর্ক নির্মিত হইল, যাঁহার কারামুক্তি অনুষ্ঠানে অনুমানকরি ছোটলোক ইতর অনেক দিন যাহাদের দ্বারা, ইহারা স্বদেশী ব্যবসায়ী, কদর্য বিশ্রী হইল ; অতএব এইখানের মাটিতে যদিবা পুণ্য থাকিবার কথা—এই জন্যই যে দুষমণ সকল এখানেই পাপ রাখিয়াছে—তাহাও, বিনষ্ট হইল।

যে, কয়েদ সমাপ্ত হইয়াছে ইহা বিশ্বাসিয়া সে এতক্ষণ বাদেতে এখন মহা অপটুতাতে শ্বাস ত্যাগের হেতু চেষ্টা করিল ; যে এবং এই প্রচেষ্টা কাজে আসিল না ; বরং তখনই স্বীয় হৃদয় হইতে উৎসারিত বিবিধ আবেগ, এতাবৎ যাহাগুলি পেশীর জাঁতে চাপেছিল, দূর হইতে শঙ্খের ধ্বনি যদ্যপি আসিয়াছে—কিন্তু তবু সে দারুভূত—যাহা নিছক অপরিচিত, তাহা, তদীয় উপস্থিত অস্তিত্বকে স্বাভাবিক, সময়োপযোগী করণে যে বৃত্তি সমর্থ, তাহাই মাঙ্গিতে তাহাকে প্রবণতা দিল।

আর আশ্চর্যের ইহা যে, সে আপনকার সুপ্রশংসার উপমায় দারুণ সুন্দর, কড়া নাই এমত, নরম করখানি উহা বশত মেলিয়াছিল ; সেইভাবেই যেমনে লোকে চরণামৃত লইয়া থাকে ; যে এবং তৎক্ষণাৎ তাহার এই হাতের কথা মনে বিশেষরূপে পড়িল, ইহাতেই বুঝিল যে সামনে কাহারও বিদ্যমানতা নাই, এবং বস্তুত নিজের ইত্যাকার অভিব্যক্তি নাই, নেহারিতেমাত্রই জড় রহিল ; যে সে কিছুই না, সে কোথাও কোন সময়েতেও নহে। সামনে পশ্চাতে কিছু নাই।

হা এতকাল পরে! এবং ইহা বটে যে কতদিন, ঘন্টা মিনিট সেকেণ্ড অবধি, তাহা তাহার নখদর্পণে আছিল ; যাহা এই মুহূর্তে, মানে ঐ কাল পরিমাণ, সে সুদীর্ঘ একাকীত্ম বৈ, আদতে বাহিরে আসিবার দরুণ ই, আর অন্য ঘটনা নহে। অথচ যে সে কাজ, বহুদিন পরে যাহা ব্যবহৃত হইবে, কিছুটা

ভুলিয়া, ঈষৎ-খ আছে, আঃ ইহা মনুষ্য শরীর। এবার সে চোখ মুছিল, অশ্রুসিক্ত কাজখানি এখন সে প্রত্যাখিয়াছে; যথার্থ যে সে অধে বিশাল ধূতয়া রাত্র অতিক্রমিয়াছে।

এনৃতার ঝিল্লির শব্দ, বুটের নাল ঠোকা, জাহাজের সিটি, বিদারিয়া মধ্য রাত্রে—জু হইতে বাঘ সিংহের গর্জনে গারদের লৌহ হিম হইল ও সে জানিল ঐ নাড়ীছাড়ান দাপট, কম্পনে পরিবর্তিয়া, ঐ দেওয়ালে যেটি ডিঙাইবার বহু মেয়েলী ফন্দী কয়েদীতে, অনেক ষড় শব্দ আছে কয়েদীতে পাগল ও ঐ ঘণ্টিতেও প্রায় সারা বেলা অবধি রহিবে; এমনও ঐ 'এ্যাক্ এ্যাক্' কামানের আওয়াজ—ইতঃমধ্যে কয়েক বছর শোনা যাইত—তাহা ঐ সুপ্রাচীন গোঁয়ার অস্তিত্ব ঘৃণাক্ষরে নির্ঘোষকে পরিণত করিতে কথা হইল; যে ঐ নিরানন্দ কক্ষে, ঐতেএই বাক্য আভাসিল, ইস্ কত দূরপ্রসারী গভীরতা। আমাতে কোথাও আমি, চন্দন গাছ যাহার বন্ধু। এবং তখনই এই কথাও…কাহারও বা খাদ্য সামগ্রী হই!

…আবার কোনদিন কেহ আমাকে খাইতে আছে; খাইতে আছে অনাদি-কাল যাবৎ, আমিও যাহাতে সে ভাল করিয়া খাইতে পারে তাই, কোন মতে, পাশ ফিরিয়াছিলাম, হায় কবে ইহার—এই খাওয়ার শেষ হইবে, উহা সুরু হইল এই জনমের আরও কত নাহি জানি আগে হইতে।

ততঃ, এই সূত্রে, পরম্পরা জনপদের ঠিকানা দেখাদিল কাশী, তাম্রলিপ্ত, বিদর্ভ, পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, কৌশাম্বি, ইস কি বা মনোলোভা শেষাক্তটির সেই নিদর্শন, যেটি এখন জাদুঘরে, একটি মাটির গাড়ি কালখর্বিত চেহারা, কি দৈবী ঐ চক্ষুদ্বয় যাহা হয় মৃত্তিকার ষণ্ডের (কিম্বা অশ্বের।) এই সময়তে, অনেক মৃন্ময়ী এবং অন্যবিধ নিদর্শন কর্তৃক উক্ত হইল; পরমানন্দে দেখ, ঐ গাড়ির চাকা তোমার নাক হইতে কত ক্ষুদ্রাকারের হয়। এবম্প্রকার বাক্যে তাহার চারিপাশ নিশুতি করিল; যে এবং টাইতে ঠিক দিতে যেক্ষণে মুখ নীচু হইল; তাহার এই ক্ষোভ নাই, কেন যে সে এই মিউজিয়ামেতে? ইহা সময়ের অপেক্ষায়, কিছু মিনিট অতিবাহিত জন্য আসে—তখনই ঐ নিদর্শনের সামনে তাহাতে স্ফুটমান এই যে আমরা সকলে তখন কি শিশু ছিলাম মানে শিশু হইতাম।

পুনশ্চ যে, ঐ মধ্যরাত্রে ব্যাপারে, এমনও নির্ঘণ্ট আছে, যখন ত্রিভুবন স্তব্ধ

হইয়া নার্সের হিলের খুট (শব্দে) থামিয়া রহে, উজ্জল বাম্বের কাছ পর্যন্ত অন্ধকার বিস্তারিয়াছে, ব্লাক আউট ঢাক'নাতে অধিক হইত ইহা। যথার্থই সেই সময়েতে নিশ্চিত বড়লাটের আবাস বেলভেডিয়ার হইতে, ঐখান হইতেই শীত ভাঙিয়া সুমধুর বান্দের তরঙ্গ দুষমনদের পেশীতে মোচড় দিল, ইহারা মাছের মতই চাগাড় দিয়াছে, ভুঁয়ে মহা হারিয়াছে মনে ঘুঁষি মারিয়াছে, বুকে চপেটাঘাত করত আপশোষিয়াছে, 'আই' ধ্বনি কেহ বা দিল, কেহ খেদোক্তি করে, আঃ দুনিয়া।

কিম্বা সেই জু হইতে হয়: ঐ স্থানে, কখনও, এই সংস্কার যে, (শঙ্খচূড়?) নামক মহাকাল সর্পর 'হিস' ঐ নিগূঢ় নিঃসাড় সেঁদিয়া চারিদিক পরিব্যাপ্ত হইবার; ক্বচিৎ কেহ ঐ শব্দ শুনিয়াছে! এখন, এই কয়েদী, যে কম্বল হইতে লোম সংগ্রহ অবাক কৌশলে দড়ি তৈয়ারী কায়দা জানে, তাহার আঁখিপদ্মে 'হিস্,' শব্দ খুলিবেই; যে এবং ত্বরিতে আপন ঘুন্সীতে হস্তদ্বারা কোন কিছুর প্রথমেই হদিশ লইয়াছে নির্ঘাৎ চরস, পরক্ষণেই মেঝেতে কান পাতিল, কভু বা জগদ্দল দেওয়ালে আপন বাজু ঠেকাইয়াছে, এই হেতু যে পূর্ব উক্ত মারাত্মক সর্পের আওয়াজ ঐ সবেতে আছে, আর সেই সঙ্গে

হেঁ হেঁ খোঁকী রসগুল্লা খাবি
ঘুমনে খাতির ময়দান মে যাবি
আরে বখেড়া না মাচাও
হেঁ খোঁকী ডর মৎ ডর মৎ হাম হায়
রো'ও মৎ রো'ও মৎ রসগুল্লা দেগা।

ইহা সে ঐ শব্দ হইতে অন্যমনস্ক হইবার জন্য গাহিবে হে।

এই অদ্ভুত মিশ্র বচনে, ছন্দ গ্রথিত গীত ইহা, কিম্বা যে ইহা, কোন আলেখ রহস্যে এই প্রচণ্ড প্রকাশ মানে মনুষ্য দেহ ক্ষণেকে শিশু ক্ষণেকে মরদ হয় তাহারই শব্দ। ইহাতে কাওয়ালী বা গজলের রীতি থাকে না, যদি গীত তবে সর্বৈব তাহা ঐ দুষমনের নিজ ছন্দধারণাতে, মাত্রাতে, আপ্লুত ব্যঞ্জনাতে প্রকাশিত হইল, ঠিক এবং এমত সময়ে ঐ জায়গা জু হতে আগত উল্লুকের কিক উকু উক সঘন ডাক উহারে ধমক দিয়াছে!

তৎপূর্বে যেহেতু এ যাবৎ স্তম্ভিত আছে আর সকল কিছু, সেই ক্ষেত্রে কাহারও মনেতে আসিবার যে গীতটির সান্ধ্য মর্মার্থ: এই প্রথম, আমদের গ্রামে, আমার ভগনীর বিবাহের পর, হাই মেঘ কালো করিল, আহোই বৃষ্টি

আসিল, হায় সে দেখিল না! ঐ গীতে খর দ্রুষমনদের মধ্যে কাহারও এমত স্মরণে আসিয়াছে : যে আঃ আমি সেই রোগের বাধা ঔষধ জানি বেচারী বহুদিন ভুগিতেছে! অথবা কাহারও ইহা : ঐ রূপ জবর গাঁঠরী বাঁধা আমি কখনও দেখি নাই ; হাওড়া স্টেশনে আর অনেক আছে—কিন্তু কিছুই তেমন বাঁধা গাঁঠরীর মনোজ্ঞ নহে।

এখন যাহারা বিষয়ে এই গল্প তাহতে, গীতটি আজব মানসিকতা সূত্রপাত সঞ্জটিয়াছে ; এমনিতে সে এখন নিদ্রিতাবস্থায় যে বিচরণ করে এরূপ, তাই, সে কখনও কখনও গরদারে কাছে, কখনও বা দেওয়ালে করতল দ্বারা থাবাইতে আছে ; অনেক রক্ষীতে ইহা—তাহার এই বিভাব জানে, কেহ তাহারে উপদেশ দিয়াছে, সিদ্ধি একটু খাওয়া করা না হইলে এই রোগ অতীব রক্তক্ষয়ী।

ঐ গীতে এখন তদীয় সেই ঘোর ধীরে হ্রাস পাইতেছিল : অবশেষে আর যখন নাই, তদবস্থাতে সে বলিয়া উঠিল : বন্দিগণ যাহারা আমার প্রশস্তি গীত করে, তাহাদের আমি মুক্তি দিব!

এবং নিজেই বলিল, ইহা শ্রবণে, রক্ষীটি কহিল ; যাও শুইয়া পড়! শুইয়া পড়।

তখনই সত্যই তাহার জাগ্রত অবস্থা, বিচারিল ইহা আমি কি বলিলাম, সম্ভবত মৌচাক বা শিশুসাথী, কোন একটিতে অথবা কোন গল্পের বইতে ঐরূপ কিছু কখনও পড়িয়া থাকিব ; আরও তৎসহ রক্ষী শব্দটি, নিশ্চিত যাহা সে ঐ ঘোরে ব্যবহার করিয়াছিল, বড় সম্মোহের হইল, এই চোখ চাওয়াতে মধ্যেতে, এখন চিকন হওয়াতে, অনুভূত ইস্ কত অবধি ক্লাসিক উহা, ঐটি। পুনরপি সে উচ্চারিয়াছে : রক্ষী।

এইভাবে সে বহুৎ ফাঁকার মধ্যে চলিয়া যায়। আঃ ঐ ক্লসিসিজম কথাটি বটে তাহাতে সমাধিক প্রিয়স্পদ রূপে ভাস্বরিয়াছে। এখন সে ভারী খেদ তাই করিয়াছে, যে সত্যই ইদানীং সে কোন স্তরে রহে, যে কোন ঘাসও তাহা হইতে অনেক ব্যবধানে ; সে নিজে কয়েকটি দেহ সঞ্চালন ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু না, হায় কতদিন সে কুঁজো স্পর্শ করে নাই।

কিন্তু ঐ গীত যখন দিনমানে, দেখা যাইবে কয়েদীটি গায়ককে ঘিরিয়া আছে যে গাহে, ডান হস্তটি বাম পেশীর উপর স্থাপিয়াছে, বামটি দক্ষিণে, যে এমত ভঙ্গীতে যে বুক কপাট বন্ধ রহে, এবং যে ডান অঙ্গুলি সকল উহার ঐখানে বাজিতে আছে ও গাহিল; তাহাতে করিয়া যাহারা শুনিতেছে তাহাদের

মধ্যে আই. পি. সী র বিবিধ তুখড় মজাক্তর মানে ব্যাখ্যা প্রায় সকলের জন্যই ঘটিত অপরাধ করিতে ফেলিল। এখন ঐ গীতে এক ভাঙা স্বরে হোলি-হায় ছপাইয়াছিল—'হেঁ খোকী' পদটি ধুয়া হইল।

একে অন্তরে, একে নিজেকেই সাপটাইয়া জড়াইয়া শুকার হাঁকাই অভিব্যক্তিয়াছে, একটি অক্ষত কন্যার জন্যই। উহাদের স্থানভ্রান্তিতে এই জমি গিচ্ছিল যেমন হয়, যে কয়েদীটি কাঁধ বদলের মতন, যে একাধিকবার ফুসলাইয়া নারী হরণ করিয়াছে, যে সিঁদেল, যে ভ্রাতকে খুন ও বহু চুষমনীতে হয় পোক্ত, সকলেই গোয়ার হইতেছে, এখনই শ্লীলতাহানি করিবেক। তাহারা অক্ষত গৌরীর জন্য কাঁদিবে।

একজন বৃদ্ধা বগল বাজাইয়া ইহাদের ভিড় বেড় করে কখনও প্রদক্ষিণ করিতে সময়তে হঠাৎ ভেদ করিয়াও যায় যে আপনার বাম মুষ্টিতে ডান আঙুলদ্বারা বাজাইতে থাকিয়া স্বীয় মোচ চুষিতেছে, সে কি অসহ্য!

যে কয়েদীয় গলার স্বর হিজড়ের মতন—ফলে অন্যদের সংস্কার হয়, যে ঐ লোকটি তেমনি, তখন বেচারী প্রমাণ করে যে সে তাহা নহে— উহার অসভ্য হাততালিতে গা রি রি করিয়া উঠিবে; এখন এখানে জঘন্য গাড়োয়ানী হিল্লুলিয়াছে: ঐ সেই সকল—অক্ষত কন্যা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন শুদ্ধতা বুঝেনা যে শ্রেণী।

এমন কি ঐ দলকে যদি সে আড়ে প্রত্যক্ষিয়াছে, তাহাতেই তাহার বিকট হিক্কাতে প্রত্যঙ্গগুলি ফুঁসিয়া উঠিল; ঘৃণাতে ক্রোধেতে সে প্রচণ্ড হইয়াছে, তাহার ঠোঁট কম্পিত, নির্ঘাৎ সে বলিতে আছে,··· যত শালা জারজ অজাত কুজাত, পাঞ্জাবী খোট্টা মিয়া নেপালী পাতি লেড়ে···ফের এক কলি গাহিয়া দেখ···এবং সে ইহাতে চোখা খিস্তি কাটিয়াছিল; সেই আবাল্য ভদ্র আচার সম্পর্কে এতটুকু সমীহ তাহাতে আর রহিবার না, যে নিম্ন শ্রেণীর ছোটলোক যদি কাছে থাকে, তখন কোনরূপ, শালা তো দূরের কথা, অসংযত কথা বলা তাহার গর্হিত; যে এবং সে হুঙ্কারিয়া উঠিলেক···শালা খবরদার। আমিও আই. পি. সী 'অমুক অমুক অমুক ধারার আসামী' (অর্থাৎ চুষমনী জানি)··· থমকাইল।

'আসামী' শব্দটি উক্ত করিতে না পারিয়া, এমন বুঝাইল যে কথাটি মনে আসে নাই, সে ব্যবহার করিল,···খচ্চের ··তোমার চটকা আমি কচলাইয়া দিব এক রদ্দায়।

যে ঐ উক্তিতে, তদীয় মধুর কণ্ঠস্বরে রকমারিভাবে পশু-পাখী স্বরে বিচলিত ছিল। কিন্তু দুঃখের এই যে গীত রাখিল না, ক্রমবর্ধমান হইতে আছে, ঐটির কুৎসিত গায়কী ; ঐ দুষমনগণ বাঙালির যাহা হিন্দুই—ইহা হইতেই পবিত্র, পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা আদি শব্দগুলি নির্মিত হইয়াছে। তাহা লইয়া, মানে তাহারই যে প্রাণপ্রতিমা, অধিষ্ঠাত্রী, তাহা লইয়া, ঐ ছেলেরা লাম্পটো ভাবিয়াছে—কেন না 'খোঁকি' শব্দ ! যে এবং বটেই তাই সে রোষানলে ক্ষার হইতে থাকে।

ইতঃমধ্যে তদীয় ঘাড় সিধা রহিয়াছে, তবু সে ঐ মত অবস্থাতে নিজ কান উন্নীত করিয়াছিল ; শুনিল : মি ল্যাঅর্ড ইহা তাহার প্রথমকৃত অপরাধ ! এবং কৌঁসলী আবার কণ্ঠস্বরকে জড় ও প্রাণী সমূহের স্তুক গ্রাহ্য করিলেন; মহাজ্ঞানী আপনারা, জুরিবৃন্দ ঐটি বালকমাত্র দেখুন উহার চক্ষুদ্বয়, দুষমনীর লেশমাত্র নাই, আমি ঐ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছি হেতুই যে বাক্যজাল বিস্তারিতে আছি —জানি আপনার মহা প্রবীণ তদ্রূপ ভাবিবেন না, এই বালককে এখনও আমি বালক নামেই নিশ্চয় উহারে আখ্যা দিতে প্রস্তুত, কয়খানি গ্রীষ্ম বা দেখিল, নাবালকত্বের মধ্যেই সে সর্বউচ্চ সম্মানে বি-এ ডিগ্রী লাভ করিয়াছে, প্রতিটি ক্রীড়ায় আমরা দেখিব তাহার নৈপুণ্য বর্তমান, এখানে ভাল এই বিবৃত করিব, যে এবং আমি হই বাধ্য, আপনারা ধর্মাবতারে ইহা স্মরণ রাখিবেন যে এই বালক আসিতেছে এমন এক সর্বজন বিদিত সর্বউচ্চ হিন্দু পরিবার হইতে (পোষ্যপুত্র নাই) যাহার প্রসিদ্ধি মহামান্য লর্ড হেস্টিংসর সময় হইতেই, ইংরাজের বন্ধু এবং যাহারা প্রত্যেকেই পরমধার্মিক, দেখা যাইবে যে সর্বদাই পরহিত ব্রত, গঙ্গার বহুঘাট হয় তাদের দ্বারা হয় নির্মিত না হয় সংস্কৃত, মন্দির ধর্মশালা বিভিন্ন তীর্থ নির্মাণ করিয়াছেন, অসংখ্য ব্রাহ্মণের কন্যাদায়, অনেক দরিদ্র বিধবার তীর্থব্যয় ভার বহন করিয়াছেন ; এবং ইহা ব্যতীত চিকিৎসালয়, হাসপাতালের ওয়ার্ড, বাড়ি, স্কুল রাস্তাঘাট পুষ্করিণী পত্তনিয়াছেন, যে আবক্ষ মর্মর মূর্তি উহার প্রপিতামহর অদ্যও… সোসাইটিতে আছে যে খানি নিখুঁত ভাবে ঐ বালকেরই কিছু বয়সী আদল।

এইভাবে মহামান্যবৃন্দকে আহ্বানিতে, তাঁহাদের পরচুলাতে কালোসাদার ঢেউ ঘটিল, যে ততঃ মহাজ্ঞানী বিচারপতিগণ তাহার প্রতি নেত্রপাত করিলেন, তখনই এবং ক্রাউন পক্ষের বিজ্ঞ ব্যবহারজীবী কহিলেন, ভাবাবেগ ও আইন এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য দুস্তর যে এবং ঐ সুদীর্ঘ উপাখ্যান হইতে যাহা উদ্ধৃত

হয়, যেমন ঐ বালক ভাস্কর্যসমান, যাহারে…বলিয়াই ব্যবহারজীবী আপনি শিরখানি এমত ভাবে বাঁকাইয়া যে যাহাতে, স্বীয় সহকারীর (!) উল্লিখিত কোন সূত্র, যাহাতে সহকারী কহিল, এই যে নিও ক্লাসিক, আকর্ষণ হয়।

পরক্ষণেই উহা আপন কথাতে এই ব্যবহারজীবী বিন্যাসিলেন : ঐ নিও ক্লাসিক! চেহারা! এবং ভিতরটিও পাথরের পরিবর্তিত হইয়াছে!

এই বাক্য উচ্চারিত সঙ্গেই এজলাস গুমরিয়াছে, যে অনেকের মুখমণ্ডল দ্যামিয়ে'র একজন চিত্রশিল্পী ইনি উকিল, কোর্ট কাছারীর অনেক শ্লেষাত্মক ছবি আঁকিয়াছেন বাস্তবিকতা ইহাতে প্রাপ্ত হইল।

এখন বিচারকের ঠক্ ঠক্ শোনা যায়; একটি চড়াই পাখী এখানে বিভ্রান্ত হওয়ত, জলদি বাহির হইতে গেল; যে, কাঠগড়াতে সে, যাহার বিচার চলিতে আছে ঐ কথাটিতে বড় অশক্ত এমন সংজ্ঞাহিত আছে; অবশ্যই এই দীর্ঘসূত্র আইনের পাটের কারণে সে খুব ক্লান্ত থাকে তত্রাচ ঐটি ঐ উক্তি নিওক্লাসিক তাহার এতাদৃশ ব্রীড়াতে আনিল যে তাহারে খুবই—সখাহ দ্বারা ঘটিবার ঈদৃশ দেখাইতে আছিল।

এখন, সে মা কালীর নির্মাল্যতে হস্ত স্পর্শ করিল চমৎকার মানসিকতার সংস্কার বশতই; ইহা আনীত সেই তরুণী কর্তৃক, হায় বেচারী সেই জজা, যে দিবানিদ্রা ত্যজিয়া প্রত্যহ আইসে, যাহার অঞ্চলে নিত্যই জগৎমাতার; আজ ৺ভবতারিণী, কল্য ঠনঠনিয়ার ৺সিদ্ধেশ্বরী—পুণ্যের কথা এই ঠাকুর কেশবের আরোগ্য নিমিত্ত ইঁহার পদে ডাব চিনি মানত করিয়াছিলেন— যে এবং প্রতি শনিমঙ্গলবার সর্ব পাপহারিণী মাগো অম্বিকাকালী, কালীঘাট, যিনি এই কলিকাতার কলিকাতা, যাঁহার, তাঁহার চরণ প্রসাদ লইয়া উপস্থিত হইত।

অবশ্য এখানেও, ইহা হয় উচ্চ আদালত, বিচার কক্ষে না, পার্শ্বস্থিত বারান্দাতেও না—আমরি খিলান সকল দর্শনেতে, যে প্রত্যক্ষ করিল, তাহাতে ভাবুকতা বর্তাইবার—অধুনা আসিবার প্রসঙ্গ তাহারে তরুণীরে বানচাল করিল; পুলিশ পদস্থ কর্মচারী অতীব সমীহে তৎসহ বিড়ম্বিত আছে এরূপ বিপদে মনেতে, রমণীর জ্ঞাতার্থে জানাইল, উহাতে অভিযুক্ত যে সে বিপদে পড়িবে!

ঐ তরুণী, যে বহু রাত্রি জাগিয়া এই কলিকাতার আনন্দবর্ধন করিতে আছে, এ ক্ষেত্রে সাধারণ সাপ্টা করা যায় এইরূপে—বিশেষ শহর না লিখিয়া, মরজগত, যে মরজগতের আনন্দ বর্ধন করিতেছে—আর যে

কলিকাতার বদলে নগর, তাহাতে বটে বিচিত্র চিত্রচরিত্র আখ্যায়িত হইত, কিন্তু সম্প্রতি ঐ মীমাংসা হয় অকাজের।

যে তন্বী এই বয়সে তিনখানি দারুণ শোকদায়ী নিদারুণ আত্মহত্যার ছবি ভারী সাহসে চোখে রাখিয়াছে: একজনের মাথায় বেলকুঁড়ি কাটা, একের (পুঁটে পায়ের) অঙ্গুলির একের হস্তীদন্তের সোনার নাকসীকরা সিগারেট পাইপ। এখন পুলিশ পদস্থর উপদেশে তদীয় অভিমানে মার দিল; ভূত-চালিত থাকে আবিষ্টর মধ্যে রমণীর ওষ্ঠে স্ফুটিল, ভাল।...কেন...মানে। আ আ।—যে এবং তরুণী আপনার বস্ত্রকে সঠিক দেওয়ার বোধ আসিল। এবার তাহার নাসাপুট স্ফীত হয়; যে তথাপি কোনক্রমে কহিয়াছে; লউন চকলেট, বেশ না...উহারে এইগুলি দিবেন ত, তবু খানিক আমেজ হইবে... বেচারা। (ঐগুলি হয় একজাতের চ্যাকলিট যাহাতে নেশার বস্তু থাকে, লোকে ঐগুলি ইউরোপ অন্তর্গত কনসটানটিনাপোল হইতে আসিত, —সঠিক কিনা জানি না।—বাজারে নাম লিক্যরইস চ্যাকলেট)।

'যেদিন সে ঐ কাণ্ড করিল। এই পদটি তরুণী, সুচারু দন্ত পঙক্তি দ্বারা উচ্চারিয়া অন্যমনস্ক রহিবে এহেন প্রস্তুতিতে দীর্ঘশ্বাস এখন ত্যজিল: কেন না পরম বিবেচনার ক্ষণটি ঐ আত্মহত্যা তাহাতে আভাসিবে, ইহাতে এক সঙ্কল্প কি পর্যন্ত মানুষের যাহা তাহা গঠিত হইয়াছে, দূরত্বের বোধে বা বিচ্ছেদ যখন একে আধীর, ইহাতে অদর্শনে ঐ মানসিকতা যে এবং এই তন্বী কত খুসী থাকে, যে ইহা সাহসিকতা ইহা গৌরবের, তদীয় জীবন, যেখানে মোহিনীত্ব শুধুমাত্র বিষয় তাদৃশ লক্ষণের মধ্যেও তাহারে ঐটি ঐ মৃত্যু, ঐ দৈবী মায়া, চমৎকৃত করিল: যখন কোন নবাব বা রাজা তাহারে, তাহার করুণা লাভ যাহাতে হয় তজ্জন্য উন্মাদ হইল। তখন সে স্থির!

এই সেই নবাব যাঁহার নিমিত্ত সম্মানে দ্বাদশ তোপ দাগা হয় তোমার দরজাতে, রমণী অতিবিনীতভাবে জ্ঞাত করিল: হ্যাঁ মহাশয়, আপনারা বৃথাই সুবিখ্যাত আর আসগার আলী মহম্মদ আলী (লক্ষ্ণৌ) কৃত প্রস্তুত দেবদুর্লভ আতর, জামামা, সিঁড়ির সর্বত্রেই সিঞ্চন করিলেন, আমি অক্ষম, ঐ উৎকৃষ্ট জয়পুরী মিনাকৃত মহামূল্যবান পাথর বসান রতনচুর আর দর্শাইবেন না, উহা হাতে পরিয়ে আমি মহামান্যকে অভ্যর্থনা করিতে অসমর্থ!

এই ব্যাপারে তাহার দিন এমন কিছু বিপরীত হইল না: কিন্তু যাহারে লইয়া এই বিবরণ সে হয় রমণীর নিকট বিস্ময়কর আশ্চর্য!

পুনরপি কৌঁসলী ব্যাখ্যা দিতেছিলেন ; ...মহামান্য বিচারপতিগণ আত্মরক্ষা শব্দ কি এরূপ তৈলাক্ত হইয়াছে বা যে তাহার অভিধা এতেক হাসির যে, আমরা ঐটিকে ঈষৎ মান্য করিব না জানিবেন, উহা অবাক দায়িত্ব, ইহা প্রকৃতির ! ইহা আত্মরক্ষা করিতেই,...এই অভিযোগ যে, দুইজন তাহার হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে... ; কিন্তু এখন যদি।

ঐ কাঠগড়াতে যে অবস্থিত আছে, যাহার বিচার ! ঊর্ধ্বে অধঃ আইনের ভাবান্তর, যে এবং সর্বথা ঘটিতেছে, স্বীয় সৌন্দর্য হইতে কণাটুকুও আঁট খোওয়াইবার না।

সে আপনার চোখে সামনেতে, ইতঃমধ্যে রক্তাক্ত বস্ত্রে নিজের বোধ করিল ; আর যে ইহাও শুনিল যে আপন গাত্র বিদারিয়া উৎকট গোঁয়ার শব্দ নির্গত হইতে ছিল ; তখনই নাসিকা ক্রমান্বয়ে কুঞ্চিত আছে যে এবং জবর বিশ্বাসে অভিজ্ঞাত নবধর অঙ্গ সুকঠিন হইল।

ততঃ সে ইহা বুঝিল যে তদীয় চক্ষু দুটি যারপরনাই সে ছোট করিয়াছে ; এখন ইহাতে নিশ্চয়ই আর তাহাতে সাড় রহে না : সে, এই হাট দ্বিপ্রহরে, বিচিত্র গমক ধ্বনিত এবম্বিধ কক্ষে, বিচারপতির কাশির আওয়াজ, কৌঁসলীর কলার অঙ্গুলি স্পর্শ করা, মোকদ্দমায় কাজ পত্রের কম্বল, সামলা পরিহিত নিম্নপদস্থ ও চিকন পালিশের জৌলস মধ্যে সে নিদ্রাচর !

সকলেই, বিপক্ষ মানে ক্রাউন পক্ষ, আপন কাজ পত্র কিছু নোট করিতে কলমখানি প্রায় কপালে ঠেকাইয়া (ওষ্ঠেই হইবে), উচ্চপদস্থ পুলিসের বুটেতে ভুঁয়ে রক্ষিত সোলার টুপী (হেলমেট) কিছুটা সরিতেছে, সামলা পরিহিত নিয়ম আজ্ঞার অপেক্ষাতে আছের পূর্বে, বিচাপতিবৃন্দের মুখ অর্ধ-উন্মুক্ত থাকে। ইতিমধ্যে সে !

আঃ অলৌকিক ! সে নিদ্রাচর ! যে সে ; বিপক্ষের অকসফোর্ড অনু-মোদিত উচ্চারণে নিষ্ঠুর, বর্বরতা, অমানুষিক, নৈতিকতাভ্রষ্ট, ইত্যাদি শব্দ যেগুলি নয়, সমুদয়কেই, বাস্তবিক ওতপ্রোত করিতে আছিল যাহার মানে শব্দগুলি তাহাতে ঘোর অবস্থাতে খেলিতেছে।

কখন সেই বক্তার নিকট যিনি, তাহার সান্নিধ্যতে, তাহার কপালের উপরেতে বিশৃঙ্খলিত চুলের কিছু, এমনও মনে হইবার যে রয়েছে, বিন্যস্তিয়াছেন ; এইরূপ অবস্থাতে সে মহামান্য বিচারপতিদের কাছে, যাহাদের হাত হাসুলীর

নিকট যাইতে মাত্র চমকাইয়া স্থির, সকলের, ও। অর্থাৎ (বেচারী অর্থে, বলিলেন।) তখনও প্রতিজনের ভ্রূতে ঈদৃশ বিস্ময় ধ্রুব ফলিত আছে; এইজন কে যে নিদ্রাচর। এখন ঐ ঐ প্রামাণিক সকল (এগজ্‌হিবিটস্) স্পর্শিতেছে, ঐ রক্তাক্ত বসনে মুখ রাখিয়া অদ্ভুত স্মিত হাস্য করে, উহার ঠোঁটে নিশ্চুপ সূচক অঙ্গুলি দেখা যায়; বিচার যাহারা করিবেন তদীয় পরচুলার নীচে চমৎকার বাগিচা করা টেড়ী ছিল, এই অনুভবেই স্থির রহিতে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প; কেননা ঐ কেয়ারির পর আরও বিস্তৃতি তাঁহারা প্রত্যক্ষিয়া নির্ঘাৎ বৈচিত্র্য উপক্রমে ঐ মতই করেন; কিন্তু তাঁহাদের ডান অঙ্গুলির টিপ সকল বাম অঙ্গুলির টিপ পরস্পরাতে ছোঁওয়া অবস্থাতে স্পন্দিত আছে, যাহাতে ইহা পরিষ্কার যে দ্বিধা তাঁহাদের বিহ্বলিয়াছে ও আলোচ্যের যে, ঐ মত করিতে দৈহিক জোরই আকর্ষণীতে হয়: এই মরদেহতেই ইত্যকার কল্পনা, যেমন যে, হে সুবিজ্ঞ মহামান্য ধর্মবতার ঐ সত্যসন্ধ!—অসংখ্য শ্রদ্ধা রবে শব্দপদগুলি বিশাল হইয়াছে—রণিত হইতে আছে: যে এবং তাঁহারা আপনাদের জাগতিক করিলেন, ঈদৃশ পুনঃ উক্তিতে যে, কে ঐ জন।

অতঃপর আরও খাদে কে এই যুবা!

উত্তর বিঘোষিল: ঐ সেই হিংসা উন্মত্ত!

ইহা খণ্ডিতে শ্রুত হইল: অতি ক্লাসিকাল শব্দ।

তাহাতে তখনই; ঐ সেই প্রতিহিংস পরায়ণ!

শেষে জবাব বিবৃতিল; হা হা পৌরাণিকতা।

মাধবায় নমঃ। জয় রামকৃষ্ণ বর্গভীমা যিনি ঈশ্বরী, তাঁহার স্মরণে! তাহারে সকলে যাহারা, খাম জুড়িতে জানে না, ভালভাবে করে কেমনে; যে আপন জামা সহজেই কেমন ভাবে খোলা যায় ইহাও; ঘরেতে যখন, যদি মেঘ ডাকে খুশী হইবেই, এখন, যে তাহারা সকলেই হস্ত প্রসারণ করত বিশেষ হর্ষান্বিত আছে—কেননা কিছু লভিবারে, হস্তরেখা পুষ্ট না, কিন্তু উষ্ণতায় জড়িত আছে, মনে লয় আমার বক্ষে যে ধুক্ তাহাই। ইহারা প্রকাশিল, কি ভাল। আপনি যে আসিয়াছেন। আপনি আমাদের সঙ্গে বসিবেন কেমন, আমাদের ডর লাগিবার হেতু নাই, আমরা ভাগ্যহত। নিজেদের দিকে তাকাইয়া কহে, যে ইস্ আমরা ভীত বল?

এই বিরাট স্কুল, আর্ক-বসানে ভিনিসিয়-চিক করা জানলা: ঐ অর-কেরিয়ার, ঐ সিলভার-ওক কিম্বা খুরশের সাদা থোকা নিচয়, ঐ পামের জাতীয় গাত্রে 'বি,+'ক' বহু পুরাতনের উপর, অথচ উহা ক্রমঃবর্ধমানতাই; আমরা যাহারা কুয়াশার সময়েতে উর্ধ্ব আকাশে কালীপুজার সময়েতে ফানুস প্রত্যক্ষ বিষণ্ণ, কি একা উপস্থিত ক্রমঃবর্ধনতার উপর, সুমহৎ পামগাছ, বি প্লাস কে, অক্ষরে মুগ্ধ মাগো। এখন তাহারা ঐ ক্রমঃবর্ধনতাকে উপাছাইল, বি প্লাস কে একে অন্যের মধ্যে মিশিয়া, অথচ দৃষ্টিতে তাহা না।

বটে এমত সময়, জয় জয় মহাদেও সহ পেলব ঘণ্টাধ্বনি আসিল, উহা অদুরবর্তী রাস্তার বট বৃক্ষের নিম্নে যে দেবস্থান হইতে হয় আগত, দারওয়ান লিফটম্যান, পশ্চিমা ইহারা ধার্মিক্ পূজা করে। যৎক্ষণাৎ আমি, ও বুক বাঁধিয়া বল্লিলাম, প্রার্থনা করি যে: হে পাম বৃক্ষ তুমি, জানি, যদি সত্য হও, তবে বর্ণনা কর, অন্বয়ত্ব ত্যাগ করত, কহ, অক্ষরগুলি কোথায়, ন্যায়তত্ত্ব আমাদের প্রমাণ করিয়াছে, লুপ্তম ইতি অদৃশ্য। আমি মধ্যরাত্রে যেমন, তখন তোমার ঐ প্রগাঢ় অন্বয়ত্বে ক্ষান্ত দাও। মধ্যরাত্রে অনন্ততা, আঃ আমি একা তবু মদারবে হৈ দিলাম প্রান্তরে সুদীর্ঘ হয়। ঐ অনন্ততা, আমদের, একত্রে আনিল, আমি কাঁপিতেছি।

কেহ সবাইরে বলে, সম্প্রতি বৎসগণ, তোমাদের সরল স্বীকারোক্তিতে

আমি হইতে আমাদের হইলাম। লহ টফি লও, আর আমরা টফির কারণে সবাই একটি হই। কিন্তু যে তাজ্জব এই হয় যে তাহারা ভাঙিয়াছে কোন হেতুতে, পরিণতি হইতে বিচ্যুত, ইস্ কেমনে। তাহা খবর লই নাই। আমরা জিজ্ঞাসি ঈদৃশ স্কুল কলিকাতায় আর নেই, ইহার নামের হরফে এমন এক সার্থকতা, যেমন যে ইহা যীশুই মদীয় মতি, সন্ন্যাসী ও প্রাচীন বৃক্ষ ইহার ধারা সঙ্গ, এই ধ্রুব। হুগেন্‌ঁাস যেমন এখানে : আঃ আমরা বিশ্বাস পাইব। ভালো এখন, প্রতঃ অনুষ্ঠান সান্ধ্যানুষ্ঠানেই যাহা তাহা নয়, যেমন ধারা রেভারে ও চ্যাটার্জী যাহা বেদি হইতে বলেন, একটি বিশ্বাস। বিশ্বাস। আমরা গানের দলে ; গীত সংহিতার পাতা : আমার চিত্ত দুঃখ পাইতেছে, সমস্তই কল্পিত।

তখন আমি বাঁখারির জাফরি মধ্য হইতে, ইহা চর্চা, খড় না গোল পাতার মোট চার্চ, বর্ষার ধান ক্ষেত দেখিলাম। আঃ আমি আমরা পতঙ্গ কীট অণু পরমাণু অবধি নিঃছাড় একটি বিশ্বাস। ইহাতে, স্মরণে, ব্রহ্মময়ী, (আমি) আমার বিশ্বাস সম্বোধিতে পাংশু হইলাম কেন গো। ও ঠাকুর আমরা কি শুষ্কতায়, শুধু বল আমাদের ভীতিতে কেন তৃষ্ণার্ততা বোধ দিলে, মায়া। হায় আমরা বায়ুপূর্ণ কিছু ন্যায় ভাসমান। আমরা। জিহ্বা উপড়াই ফেলিব অদ্য প্রতিজ্ঞা।—তোমরা চপল সতীত্ব ত্যাগ কর, ভীত কেন ?

যে একজন অন্যকে ভালবাস, এক বালক যাহার চুল এলোমেলো আর অন্যটি যাহারা মুখমণ্ডল দৌরাত্ম্যতে ধুলা লাগে—উঃ সুন্দর। পামবৃক্ষে তাহাদের নামের আদ্য অক্ষর।

তাহারা গুমরিয়া উঠিল : যখন, আমরা তোমাদের টফি গ্রহণ করিলাম, এখনও, তখনও কি বলিবে, তোমরা আমাদের ভীতির কারণ অবহিত নও। যে এবং তাহারা ভ্রূ কুঞ্চন করে, দোষ বুঝাইল এমন, পুনরাদি বিস্তারিল আমাদের পিতৃগণের জননীরা যাহারা সম্বোধিয়া বলিতেন ; এই গর্ভ হইতে তোমরা, তোমরা হাঁ করিলে বুঝি কি বলিতে চাও। আঃ তোমরাই না একদা যেখানে সেখানে দেওয়ালে লেখা,…বন্দুকের নল শক্তির উৎস—দেবতা যাদের মাওসে তুং স্বর্গ যাদের চায়না।—(চাহে-না) দেওয়ালের (absurdity) মারাত্মক যে, মানে যে, রক্ত-মা-খাকায়, তাহার বা নত্যাতিয়াছে।

নেহাৎ মরমবাদতত্ত্ব সূত্রেই উল্লেখিত হয়, গুলির শব্দ হয়, অনেক বন্দী লইয়া সেই পথ যাও, হাওকাকের শব্দ হইল, তাহারা হাওকাকহস্ত তুলিয়া বাঁধা হাতেই চশমাতে ঠিক স্থাপত্য দিতেছিল—যে এবং পাহারদারদের হস্ত

পুস্তক প্রকরাশি ; ঐ সেই সকল যায়, যাহারা—যাহারা বেদষড়দর্শনে, মেঘদূত, দান্তে, সেক্সপীয়রের বহু বহু শব্দ, লাইন, না উৎপ্রেক্ষা নিজ লেখাতে ঢুকাইয়াছে। এদিকে রাইফেল রেঞ্জের বাহিরে পথচারী, ভিড়, মধ্যে মাঝে হো দিতে ছিল : বিশ্বাসঘাতক! ও ছাপোষার দুষমন, মানুষ কি দানব, আমাদের শিক্ষার দোষ নাই! সমস্বরে কহিল। কালো বসনে—কেহ শুনিলাম inky পরিচ্ছদকে লাল কল্পনা করে। যুবরাজ : জাঁহাপনা, কিছু বল! দেখ দেখ ঘোর বিমর্ষতাই বিষন্নতাই আমাদিগের সৌখীনতা হইতে আছে। আর তোমরা কি চালাক পাশাইতেছ, আর তোমরা তোমাদের শঙ্কা বুঝিতেছ নাঃ না না…।

এবম্প্রকার অভিযোগে, আমরা পকেট অনুভব করি, ঈষৎ আশান্বিত যেমন বা ইহারা শিশিবোতলওয়ালা হাঁক পাড়িতে আছে। কিন্তু অল্পবয়সীরা তেমনই, উহাদের ধনু তুল্য ভ্রূ টানা রহে।

আমরা যে এবং অসহায় কণ্ঠে কহিলাম : প্রিয়, সত্যই আমরা অপারক! যে এবং অতঃপর আমরা প্রার্থনাসূচক অভিধাতে, এখানে আমা সবাদের স্বর অনুনাসিক শুধু না, খোনা হইল, আমরা নিশ্চয়ই শ্বাসগ্রহণেই আছি শুধুমাত্র, আর বৃত্তি সকল নাই, সুতরাং তাদৃশ হয়, নিবেদিলাম : আমরা তোমাদের ঐ স্বেদহীন ত্রাস যে কি কারণে তাহা, আন্দাজ করিতে পারি না! অথচ তোমাদের রম্যচমকপ্রদ নয়নে প্রতক্ষ্যতেছি, বটে যে ঐ হইল আমাদের মনস্তাপের যাহা, অন্যজাতীয় কম্পন, অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের কাঁটার, যাহা ছক সকল লিখে, তেমনি বেপথুতে ; হায় কি যন্ত্রণা তোমরা অজস্র কম্পন হারাইয়া মস্তকে অনুকরণ কর!—হায় সেই রমণীরা কোথায় যাহারা পাতার মত কাঁপিত! তাদের গর্ভে কি তোমরা কি বৎসে জন্মগ্রহণ কর নাই, বল!

ইহাতে শিশুগণ ; সকলেই দিক সম্পর্কে, মানে স্থান যে এবং গিরিশবাবুর মতনই লিখি—কি সুন্দর। নিজ নিজ সুন্দর মুখমণ্ডল খানি নেহরিল আঃ যে কোন জন যিনি লিখেন…বালকের পদধূলি আমি গ্রহণ করিব…বালক আমার গোলাপ ফুল!—আমরা কি ঈদৃশ কবি প্রতিভার অধস্তন কেহ!

যা হাতে, সুহৃওদর সুখাদর। কোমল সকলেই চিকন হাতে ন্যস্ত করে, ক্রমে তাহারা এক পার্বত্যশ্বাস ত্যজিল, ক্রমে তাহারা কঠিন হইল, ক্রমে দন্ত ঘর্ষণ করিল, ও যে পৃথিবী ত্রাহিত হইল ইহাতে, যে যেরূপে বলিল। তোমাদের ধ্বংস হোক তোমাদের, ক্ষয় হোক তোমাদের, চাপা দিক বিরাট ব্যসঞ্জি

জেবরা ওয়াকেতেই,…

একপ্রকার রোষান্বিত বচনে যে বা তাহারা হয় জঙ্গি বলদের মতই, ফকে ওতপ্রোত যে ঐ উন্মার কারণ বড় পুরাতন, আর যে তাহারা অশরীরী ; তব্ু ঐ দল এমত বন্ধনে, যেমন অর্ধচন্দ্রাকার, যে রম্যসৌন্দর্য সঞ্চার করে যাহা, রাসলীলার নৃত্যের অভিব্যঞ্জনার যথাবিহিত, যেমন আমরা এখনও কৃষ্ণপ্রাণাধিকারে বেড়িয়া—রাধা-থামবল স্না স্মরণে রাখিয়াছি—গোপিনীদের। আমরা প্রকাশ্যতে সৎ যে এখন মীমাংসা ঘটিল, যে এবং দাক্ষিণায়নে সন্ধ্যাকালীন সূর্যকে আমাদের পশ্চাৎভাগে রাখিয়া আমরাও নির্মিত করিলাম এক বৈচিত্র্যময় অর্ধচন্দ্র, ছায়াবৎ উহাদের, অগ্রসর হইতে আছি—দুই অর্ধচন্দ্র মিলিত যখন এমনই এবং যে ইতঃমধ্যে একটি বক্ররেখা, রোমান 'এস' টানা যায়, আঃ গঙ্গা অবগাহনের পুণ্য।

যাহাতে ঠাকুর মঙ্গলময় কহিলেন, উহা তোমার, শরৎকালীন ; দেবী পক্ষে, শ্বেত মেঘ ভাসে তাদৃশ শোভা উজর ধ্যান্যক্ষেত্রে যখন হইতে দেখিবে, তৎজনিত উহা, কম্পনরূপে তোমাতে তখনই

যোগ ঐশ্বর্য সম্পন্ন, সন্ন্যাসীর দৃষ্টিপথে যখন উহা আসিল, তৎপরবশ স্থৈর্য তাহতে, তাহাতেই অশ্রুঃ ইহা মনোহারিত্ব অথবা অনার্য কিছু, ঈদৃশ বোধিত হইতে, তদীয় হস্তের এ যাবৎ যাহা উন্মুক্ত আছে ; ইহা শিশু হস্তাক্ষরে ক্ষুদ্র বিশ্বাসে-বহি ; এই গ্রন্থ বা পাঠের নহে, উহা কপোলে লাগাইবারই, স্পর্শিবার উহা অল্প শব্দে বদ্ধ, প্রতিফলিত থাকিবে—ইহা লিখিত যে ঘটিত হইল, আদিম স্রোতস্বিনীগুলি নিস্তরঙ্গ ভাবাইল, যে বটেই, এ জাতীয় সংঘট্ট (ন) ক্বচিৎত্ব বড় মারাত্মক আলস্যদায়ী ;

আমি জিজ্ঞাসি, বড় পিসিমা আপনি কি গঙ্গাস্নানে যাইবেন ; এরূপ মনের বৈচিত্র্যময়, সাক্ষাৎ চৈতন্যে যাহা তখন আলোচ্যের থাকে মাত্র, অবশ্য কোন সঙ্কট ; সেন্টপল হইতে সেন্ট অগস্টিন হইতে, প্লেটো মতি আকুইনস এক প্রগাঢ় তোড়, স্থাপত্যে যাহা কিয়দংশে প্রসিদ্ধ হইল, সন্ন্যাস, অদ্য ঐ পামজাতীয়র বেদনা, এবং উপরে প্লাস চিহ্ন ; হতচকিত। প্রাতীচ্য দেশীয় সর্বত্যাগীদের কথা।

এখন সন্ন্যাসী, স্তোভ ছিলেন ! বহু প্রাচীন ঐ তোড় তাহাতে বিভ্রম ঘটাইল তিনি একি একি বলিয়া উঠিলেন। আপন যে এবং ক্ষুদ্র গ্রন্থটিরে আপ্রাণ দুই করে, জাপটাইয়া বেপথুতে আছেন, যে যখনই তাহাতে তদীয় ওষ্ঠ-

ধ্বয়, নামে কম্পিত, ছিল, জপমালা ক্রুশ সবই তাহার, যদিও স্বীয় দেহই বা.
তবু অশেষ পূর্বকালীন কোন ক্রন্দনে তাঁহাতে যে ধ্বনিত থাকিব, প্রভু একি প্রহেলিকা! আতান্তর! আমাকে এই ধন্ধে নিক্ষেপ করিলে কেন!

ক্রমে তদীয় নীলচক্ষু এমত সংশয় হইতে নিশ্চিততত্ত্বে আসিল, তেমন অর্থ হয়, যে দুর্মতি শয়তান ইহা হইতে শ্রেয়ঃ, যে তাহা আমার গাত্রে ধূম্র, যাহা তোমার নামে উধাও হইবে, ইহা লিখিত সত্য, কিন্তু এহেন অদৃষ্টপূর্ব মায়া কেহ কখনও জানে নাই, যে ইহা আমার পরীক্ষা! ইহাই অধুনা শয়তান!— আমার নৈতিকতা আমার সৌন্দর্য বোধের অহঙ্কার: অর্থস্থ শয়নে স্বপনে, বিবিধ রসবোধে, সুর বাঁধায়, স্বর্ণত্রিকোণে; বহুবিধ গাথায়, কাঠে, ইটে, লৌহে, নক্ষত্র দর্শনে গতি অনুধাবনে, বিস্তারিয়া, প্রসারিত করিয়াছি… ইত্যাদি। তাহাতে অদ্য তুমি কটাক্ষপাত করিলে, আমার যুগপতত্ত্বকে তে

হে ঠাকুর তুমি দাঁড়াইয়া দ্বিখণ্ডিত কর! অর্থাৎ তুমি প্রকট হও, তখনই উহার অস্তিত্ব নাই: যুগপতত্ত্ব অর্থ এই যে, সন্ন্যাসী বৃক্ষের দুঃখে ইস্ ও হে প্লাস দর্শনে আর! বলিবেন, তাহাতে যে তিনি মীমাংসা করিলেন, এই মন এখনও চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক হইতে দিন রাত্রি অনুপ্রাণিত সত্য হইতে; যে বোধ যুগপতত্ত্ব লয় প্রাপ্ত ঘটে নাই। নৈতিকতা আর সৌন্দর্য বিরাট প্রশস্ত মাঠে, যখন নিয়ম সমবেত: একস্বরে জানাইল, প্রতিঃ প্রণাম হইলাম মহাশয়,

তিনি প্রকাশিলেন: আমার কিশোর বন্ধুগণ প্রতিঃ প্রণাম। অদ্য আমি এক মহা আতান্তরে বটেই যে আমার বিশ্বাস; তোমরা উহার ধ্রুব সমাধান করিতে পারিবে, সমস্যাটি হয় অতীব ভাবনার, অতীব সূক্ষ্ম! নিশ্চয়ই তোমরা ভগবানে নিজেদের সমর্পণ কর।

করিয়া থাকি!

এখানে যখন ঐ স্বীকারোক্তি ভবিষ্যত কালের দিকে তরঙ্গায়িত হইল; তখন পুনরায় তিনি স্তব্ধতা ভাঙিলেন: তোমরা জানো বৃক্ষের প্রাণ আছে… উদ্ভিদের প্রাণ আছে! তোমরা স্যর জগদীশের নাম শ্রবণ করিয়াছ তিনি প্রমাণ করিয়াছেন উদ্ভিদরা মানুষ (!) তাহারা তোমাকে ভালবাসে। তোমরা বিশ্বাস কর যে প্রাণ আছে উদ্ভিদ সকলের…

বটেই যে ভালো…নিশ্চয় ও অবশ্যই একেকবার বিশ্বাস করি…

তাহা হইলে তাহারে আঘাত দিলে লাগিবে [প্রশ্নাতীত] ইদানীং

শুরুতায় খবর প্রমাণ নিশ্চিহ্ন হইল, ভাগ্য তাহার মিশ্রণ বৃদ্ধি, অরবোহী ক্রমে সান্তব্যতা—নিশ্চয়তাতে পৌঁছিল অঙ্গুলিতে অঙ্গুলি বদ্ধ হইল: তোমার বেদনা হইতে. মানুষের কারণে যাহা, হে ঈশ্বরপুত্র ঐ শুষ্ক কাষ্ঠ প্রভাবিত হইল। ইতিহাস ভঙ্গিতে অদৃশ্য হইল ফলে ইহা কাব্যাশ্রিত। আমি যদি উহাতে ছুরি বসাই…

আহত শব্দ হইল আঃ মর্মান্তিক ঈদৃশ যেমন যে তাহারা সকলেই ছুরিকে রক্ত দেখিল। যে এবং ইহা আপন বংশ মর্যাদা হইতে উৎপন্ন হইল, যে এখন ছোট পদ সকল উপ্ত হইতেছে ও না! অমানুষিকতা। কেমন বড় দুঃখের। ঘটনঃ এবং সমস্ত কথাই নিঃসাড়ে লুপ্ত হয়।

এখন বল, তোমরা যদি দেখ, কেহ ঐরূপ বিকট অসভ্যতার কাজ ভাবে উদ্যত হও বা করিতে আছে—আশা যে তোমার তাহারে…, এই পর্যন্ত প্রকাশিয়া একটু থমকাইলেন, কেননা একগাছা স্বর দেহের সর্বত্রে ঘর্ষণ করিল যাহা—তাহা হইল…? (অর্থাৎ খাদ্যের ব্যবহৃত যে সকল?) আমরা যাহারে বন্ধু বলিয়াছি তাহার বিষয় অন্য, যে তাজ্জব ইহারা, সন্ন্যাসী আপন করের প্রতি নেহারিতেই যুক্তি বলিব না, উত্তরেরই জীর্ণজীবিত্বে তাঁহারঙ্গ দেহতঙ্গ আনিতে হইল,

শ্রোতৃবর্গ তদীয় মুখের দিকে নিষ্পলক অবলোকনিয়া, যে তাহারে নৈতিক, যে তাহারা অধীর ইত্যাবসরে তীরবেগামী গাড়ির আওয়াজ, টেলিফোন আসার ক্রিড়ীং শব্দ; পাখীর উড়া কেহই শুনিয়াও শুনে নাই। বক্তার কণ্ঠস্বরে, ঐ ইতস্ততঃ কারণে, অথচ ফের ঘটে নাই, এবং বালকদের ইদানীংকার বীরচিত্ততা (heroic) তাঁহারে, জাঁত কষিল; যে এবং তিনি বৃক্ষদেহস্থিত ক্ষতের দিকে নেহারিলেন, ও যুগপৎ আর সবাই যাহার ঐ সারি-বদ্ধ রহিয়া যাহাদের ধর্ম নাই এখন বেশ গরম সকলের দৃষ্টিপাত এতে ঘটিল আ কি বা সুন্দর উহাদের চক্ষু! মাইরি কি সুন্দর!

তিনি এখন সুদীর্ঘ বালকদের সারির প্রতি তাকাইয়া ঈষৎ স্বচ্ছন্দ বোধ খোয়াইতেই যথার্থ বিমূঢ় হওয়ত অল্প কাশিলেন, গতকল্য মধ্যরাত্রে তাঁহাকে বৃক্ষদেহের সদ্য উৎকীর্ণ অক্ষর ভারী কষ্ট দিয়াছে; তিনি ঐ দিকে চাহিতে পর্যন্ত বা শঙ্কিত আছিলেন; ঐ দিকে কোন পাপকার্য; ঐ দিকে জঘন্য কিছু এমনই; সাধারণ যুক্তি যথা তাহা হইলে প্রেম শব্দটি কি এক বয়সের?

ইস্কুলের বালকদের জন্য নয়!

ইহা সেই প্রেম নয়; ইহা আরও কদর্যের;

তখন সন্ন্যাসী, আপন দেবতাকে স্মরণ করেন, হাতের জপমালা ঘুরিয়ে আছে; অথচ বিভ্রমে মন বড় অপরিণত, বিশেষ স্খলিত, বৃক্ষের জন্য দুঃখ তখন মানে ঐ অবস্থাতে আসিবার কথা নয়, খালি গঠনমান চরিত্র সকল বিষয়েতে শুধু ধিক্কারই…জানলার বাহিরে অন্ধকারে ঐ বিকৃতি আরও হইতে আছিল অসম্মানজনক। ততঃ ইহা বিরাট সত্য যে মধ্যরাত্রে তাহার ঘুম ভাঙিল, চাঁদের আলোতে বিছানায় তিনি; আপনা হইতেই তিনি উঠিয়া পড়িলেন; এখন জানলাতে, সেই বৃক্ষের প্রতি তাহার দৃষ্টি আছে; তিনি উহার ক্ষত লক্ষ্যাতে ছেলেমানুষ, কিছুই আঁচড় চোখে পড়িবার নহে, সেখানেতে আবছায়া—তিনি আপন টর্চ লইলেন আলেকপাত ঘটিল। সদ্য আঁচড়: টর্চ তেমন ভাবে ধরা; তিনি দেখিতে আছেন, এই প্রশ্নে বাটিতেই পতন হইল; অন্য পার্শ্বে হলে অজস্র ছেলেদের নিশ্বাসের শব্দে তিনি উচ্চকিত বা, এখন নিশ্বাস যেমন দ্রুত গতিতে পড়িতে আছে; সন্ন্যাসী মানুষের শ্বাস তোমারে দেখিয়াছে।

হয়ত কেহ জাগ্রত আছে যে আমাকে দেখিয়াছে!

ঐ বালকগণ আঃ কি বা সৌন্দর্য হয় উহাদের নয়ন, কেননা হায় কেন উহাতে পক্ষ্ম দিলে! যেহেতু উহা দ্বারাই আপন ইষ্টদেবতা দেখিবে, তিনি সত্য।

ছেলেদের আর একবার দেখিয়া কহিলেন, ওই নীরবতা কাপুরুষতা। এই সূত্রে তাহার বলিতে ইচ্ছা হইবার অবশ্যই যে যে প্রেমকে লোকসমাজে বলিতে তোমরা দ্বিধা কর—তাহারে জগৎ পাপ বলে! কিন্তু তিনি বড় অসহায় হইলেন। ক্রমে নিয়ম অনুযায়ী কহিলেন, দুই জনের জন্য এতগুলি বালক আজ হা ভগবান, অবিশ্বাসের পাত্র হইল! তোমরা তোমরা সেই… *এমানে তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিয়া ছিল, সেই অভিশাপ শব্দে ভাইপারেজাত (ইহা অভিশাপ নয় সনাক্তকরণ)* ছি ছি…তোমরা এই প্রতিষ্ঠানের অযোগ্য। যে এবং তদীয় স্বর বৈচিত্র্যে বৃক্ষস্থিত ক্ষত বা ক্ষত-কারণ ঐ বৃক্ষ একদা স্থাপত্য নিদর্শন হইল—ও তৎসূত্রেই ঐতিহাসিক, মানুষের কুসংস্কার। রামচন্দ্র অশোক-তরুকে আপন ভাবিলেন, মহাপ্রভু বৃক্ষকে স্পর্শকরত বিদায় লইয়াছিলেন, ভগবান রামকৃষ্ণ ঘাসের বেদনাতে আকাশ বিদীর্ণ করেন। আঃ ছেলেবেলায়

ঐ সংস্কৃত লাইন কি আলস্যদায়ী ছিল মাগো! অস্তিগোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলীতরু!

ঐ বৃক্ষ! ঐ বৃক্ষ! ঐ বৃক্ষ! এমত সময়ে তাঁহার ইহা নিশ্চিত মনেতে আশা ভাল হইত, যে যদি গড! এই শব্দ লিখিত; সেই ক্ষেত্রে তিনি, জানি, বলিতেনই, ভগবানের নাম লইয়া কাহারও কষ্টের কারণ হইওনা। সন্ন্যাসীর বাষ্পরুদ্ধ স্বর শ্রুত হইল! আবার খানিক স্তব্ধতা; রাস্তার গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ, সাইকেলের ক্রিং শব্দ আসিল। সে এবং ঠিক এমত সময়ে একটি অতি অল্প বয়সী বালক লাইন ভাঙিয়া ছুটিয়া আসিল তদীয় মঞ্চ প্রতি; যে এবং ঐ মঞ্চের কিনারে মাথা রাখিয়া যে রোদন করিতে আছে, সন্ন্যাসী অভূতপূর্ব বিস্ময়ে, তদীয় আপন চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া রহে; আর এখন প্রমাণিত, তাঁহার শেখান ফলিত হইল। বালক কান্দিতে আছে! সন্ন্যাসী দেখিতে চাহিলেন সারিবদ্ধতার মধ্যে অন্য কেহ মস্তক হেঁট করিয়া আছে বা না!

ঘটনা এইভাবে, নাটকীয়তা লাভ করে, যে আদতে ঘটনা এই যে, বালক তাহার ঘরেতে যায়—তিনি তাহার ক্রন্দনে অভিভূত হওয়ত আলিঙ্গনে লইয়াছিলেন, কেন যে নাটকীয়তা। এই বালক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, স্যর কেদার দাসকে তদীয় ভূমিষ্ঠকরণে ডাকা হয়! বালক বেয়ারার কাছে থাকে! সন্ন্যাসী তদীয় মস্তকে হাত বুলাইতে কালে কহিলেন, এ স্বর আনন্দ কম্পিত জলদ গম্ভীর, যে—ছেলেরা ক্লাসে যাও! বালক তুমি কাঁদিও না, কাঁদিও না···এ পর্যন্ত বা তদীয় মনেতে অনুতাপ শব্দটি আসিল না যাহা গতরাত্রে অন্ধকারে খোয়া গেল—এখন ঐ কথা দুন্দুভির শব্দ এমন যে; বালক শুধুমাত্র বলিল আমি মিথ্যা বলিয়াছি। আমি মিথ্যা বলিয়াছি! চলমান ক্লাস অভিমুখী সারি দ্বারা চোরা ভাবে নেত্রপাত সম্ভাবিল—ভারী আকর্ষণীয় ঐ ব্যাপার।

সন্ন্যাসী বুঝিতে, মানে ক্রন্দিত বালকেরে, আত্রাহিং—মিথ্যা। অবশ্যই বালক যাহার চক্ষু রমণীয়, যাহার মেকানো খেলার সেট্‌ দারুণ; তাহার শব্দভ্রম ঘটিয়াছে! যে এখন ঐ বালকের থুতনি ঐ মঞ্চে ন্যস্ত, যে সে ঊর্ধ্বে নেহারিয়া বিবৃতিল, যে মিথ্যা বলিয়াছে: যে, সে তাহার পিতার সহিত একদা শিকারে যায়, ঘন বন মধ্যে তাহারা এক হরিণকে অনুসরণ করত ধাওয়াইতে থাকে—অবশেষে দেখিল সেই হরিণ এক পাথরের বুদ্ধমূর্তি নিকট বসিয়া

আছে! তাহারা সকলে দেখিল বুদ্ধমূর্তির গাত্রে সান্ধ্য আলোতে চাকচিক্য তদীয় পিতা ঘোষিলেন,…অজস্র মণি-মাণিক্য হরিণ মায়ার প্রয়োজন নাই। থাম! তাহারা ঐ মূর্তির নিকটে যাইল—দেখিল উহা মণি-মাণিক্য নহে ঘাম।…ঘাম,

সন্ন্যাসী কহিলেন তোমরা মুছাইয়াছিলে।

* গল্পের নামটি আমাদের দেশের মহৎ কবি সুধীনবাবুর (সুধীন দত্ত)।

মাধবায় নমঃ, জগৎজননী মাগো! জয় রামকৃষ্ণ! ঠাকুর আমাকে এখন মতি দিন, যাহাতে আমি এই সকল মানুষের কথা, যেমন আমি সবিশেষ মীমাংসা করিয়া অনুভব করত বুঝিলাম, তাহাই লিখি।

শোকগাথা॥ জানালা দিয়া বেশ আলো আসিয়াছে; এমনই যে, নিকটস্থ ফুলদানির ধিমে ছায়া পড়িয়াছে; এখানে শ্বেত ফুল, এই শ্বেত পাপড়িগুলিরও আলো আঁধার আছে, ক্রমাগত ধূপের ধোঁয়া হাওয়াতে একস্থানে যাইয়া, উর্দ্ধে ভাঙিয়া ধূসর স্তর গঠন করিতেছিল, এবং ঢিমে লয় গান হইতেছে; গীত যখন উদাত্তে তখন রমণীগণের মুখমণ্ডল অদ্ভুত এক বক্র রেখা মানিয়া উঠিতেছে; মানে উন্নীত হইতে আছে; ঐ শোকগাথা যাহারা করে তাহারা প্রায় সদা দেওয়াল ঘেঁষিয়া আছে; রমণীগণ মনে হয় সদ্যস্নাত, যে কোন পদ উচ্চারণে সকলেই একটিই মুখমণ্ডলের পৌনঃপুনিকতা!

সামনে খুব প্রশান্ত সৌখীন খাটে মৃতদেহ।

এই কক্ষের, পাশে যে কক্ষ সকল সেখানে, সম্ভ্রান্ত মানুষেরা; তাঁহারা প্রত্যেকেই রহস্যময় বিভ্রান্তিতে আছেন; কখনও টেলিফোন বাজিয়া উঠিয়া সকলকে, পরিষ্কার বুঝায় যে, বড় অপ্রস্তুতে ফেলিতেছিল; যে তাঁহাদের মনে এমন দ্বিধাভেদ আনয়ন করিতে আছিল, যে তাঁহারা যে সত্যই শোকাভিভূত অত্যন্তই দুঃখিত যে নহেন—ইহা মিথ্যা। যেন তাহাই প্রতিফলিয়া উঠিতেছে; ইতিমধ্যে, নতুন আগত কেহ কেহ আসিতে আছেন, তাঁহদের মুখের গ্রাম্য-ভাবাপন্ন সশ্রদ্ধ, সপ্রতিভ, শঙ্কিত মানসিকতা, যে এবং উহাদের—ঐ নবাগতদের বেয়ারাকে ফুল রাখার ইঙ্গিত অতীব মনোজ্ঞ! এবং ঐ আগত পরিচিতদের প্রতি মস্তক আন্দোলনে ইহাদের কাহারও সাড় লওয়া বিধায় অসীন সকলকে এখানকার সেই সচেতনতা হইতে কিয়ৎ ফুরসৎ দিয়াছিল; পুনরায় সকলে গানের শব্দের বাধ্যবাধকতার মধ্যে ডুবিয়া যাইলেন।

এখন পাখীর ডাককেও বড় বিরক্তের বোধ হয়, বড় অসভ্য। যাঁহারা গান করেন, তাঁহারা গানের শব্দগুলির মধ্যে নিশ্চিন্ত অনুভবে, বড় পরিচ্ছন্ন করিয়া পর্দা লাগাইতেছেন, গীতের অক্ষর ভেদিয়া কখনও কোমল কখনও

শুদ্ধ স্বর দেখা যায়! মুখমণ্ডল এমনভাবে চালিত হয়, সেই সীমা অবধি—যেখানে সুরের শেষ হইয়া এক নিরবচ্ছিন্ন কিছু নাই! আঃ এখানে আর কেহ চুল বাঁধে না, এখানেই ইহাদের কেশরাশি কিছুটা স্থানচ্যুত হইল, কেহ সহবৎ বোধে চমকপ্রদ অঙ্গুলি সকল খেলাইয়াছিল। গীতকারিণীরা সীমান্তে আছেন।

দূর, অন্যপার, শান্তি, বন্ধু, মায়া, গোপনতা। ভার, অনন্ত, বন্ধন, ভেলা!

গীতকারীগণ, প্রতি কথাতে, বহু দিবসের না ব্যবহার করাতে, মানুষের যে অচেনাত্ব লাগিয়াছে তাহা অতি করুণায়, সুদারুণ যত্নে উজর করিতেছিলেন; ইহদের আঁখি পক্ষ্ম সুদীর্ঘ—যে এখন উঠিল, এখন নামিল, কাহারওবা সুঠাম সুচৌনিক মুখ রেখার পাশ দিয়া ধূপ বিচিত্র ধোঁয়া লাভ করিল, অথচ ঐ দুর্ঘট সীমাতে দাঁড়াইয়া সকলেই, তাঁহারা সন্ন্যাসিনী এমন।

গীতকারিণীরা আপন বেদনাকে সূক্ষ্ম অনুভূতিতে, ভারী দক্ষতায়, আপন সুন্দর শরীরের অভ্যন্তরের প্রতিটি স্থানে লইয়াছে; ইহাতে পরিষ্কার যে, তাহাদের দিনগুলিতে, যাহা অতিবাহিত, আর কোন আপশোষ ছিল না, ক্লেদ কখনই নাই; এখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া এক এবং অভিন্ন কাঠামো—যদিও দেখা যায়, একে আপন হাতের বালা দেখিলেন; অন্যে কাপড়ের ভাঁজ; কেহ বা ইহার মধ্যে ছোট হাই তুলিতে আছে; এইরূপ অনেক সাধারণ ব্যবহার ফুট কাটিল।

কিন্তু তবু তাঁহারা একটিই; ঐ মিশ্র রাগে, পুরিয়া ধানশ্রী, পথের এক পার্শ্বে রমণীরা দাঁড়াইয়া যাত্রী সকলকে পরম আশ্বাস দিতে আছিল। উপস্থিত সকলেই অতিমাত্রায় সুপ্রাচীন বিশ্বজনীন আপনা রূপ, যে সে যাত্রী, তাহাই দেখিয়াছিল; এই দেখার মধ্যে, যে আমরা সকলেই চলিতে আছি যে এবং ইহা বিনা তর্কে মান্য করিয়াছি; এই স্বীকার! কোন শতাব্দী প্রতিবাদ করে না যে, ইহা অন্যরূপ নহে কেন? গৃহের কি বৈপরীত্য চেহারা ইহা এবং ইহাকে, ঐ যাত্রা, সজ্ঞানে বুঝিয়া লইতে সমবেতরা অব্যর্থই আপনকার দেহে অভিব্যক্তি ঘটাইয়াছিল!

ঠিক এমত সময়ে গীতকারিণীরা পার্শ্ববর্তী কক্ষের প্রতি অবলোকনিল; সেখানেতে কেমন একটি বাংলা সপ্রতিভ—অবশ্য সপ্রতিভ শব্দটি যদি এখানে ব্যবহার করা সমীচীন হয়—শব্দ সকল, গীত যে নীরবতার সৃষ্টি করিতে আছিল তাহা, যে এবং যদিও যাহাতে ধূপের ধোঁয়ার আওয়াজ!

বিলক্ষণ শোনা যায়—যাহাতেই অথবা কাহারও ভব্য হওয়ার কারণে ঠিকভাবে বসাতে কৌচের মৃদু আওয়াজ হওয়া পর্যন্ত। এবং তৎসহ এক বর্ষীয়সী কণ্ঠস্বর ইদানীং শ্রুত হইল, আস্তে বেচারা…খুব কষ্ট হইল আঃ এসো এসো…আঃ কি ভালো ছেলে ও ডিয়ার।

আরে আরে তুমি

কি কেমন আছ…আঃ তোমার বাবা কেমন আছে…আঃ কি চমৎকার লাগছে তোমাকে…এইখানে, এমত পরিস্থিতে এহেন প্রশংসা বেমানান জানিতেই তিনি ঈষৎ সঙ্কুচিত হইলেন; কেন না অদ্য একটি বোধকে সুমহৎ করিতে তাহারা পরিকর; এই ল্যাণ্ডিং-এ তাঁহারা উহাই মূর্ত করিবার জন্য আছেন। এই মনোহর সম্ভ্রান্ত বালক, যে হয় খুব সৌখীন চেহারার, সে একবার নীচের দিকে তাকাইল, চারিদিকে ফুল; যেখানে সে দাঁড়াইয়া, সেখানেও, দেওয়ালে ঠেস-দেওয়া গোল-করা ফুল-চক্র কোথাও তাহাতে লট্‌কান ছোট কার্ড।

এখন একজন উর্দ্দিপরা বেহারা উঠিল, হাতে ফুল-চক্র এবং খাম; পার্শ্ববর্তিনী মহিলা ফুল-চক্র হইতে কয়েকটি পাপড়ি ছিঁড়িয়া চিঠি তিনি গ্রহণ করত; তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া সত্বর ঐ কক্ষে প্রবেশিয়া এক ব্যক্তির হাতে দিলেন, ইহার দাড়ি কামান নহে, গায়ে এখনও রাত্র-আঙরাখা; মুখমণ্ডলে ঈষৎ অপরাধের ক্লেদ যদি বলা যায়।

আঙরাখা পরিহিত ব্যক্তি, চিঠি খুলিয়া পড়িলেন, পার্শ্বস্থিতকে কহিলেন, স্যর…আঃ বৃদ্ধ ভদ্রজন! দেখ!

এই ভদ্রলোক অধিক সমীহতে ঐ পত্রখানি লইলেন মৃতের পশ্চাতে ঐ গায়িকাদের প্রতি নেত্রপাত করিলেন, অল্প গলা পরিষ্কার হইলে, ইহাতে জড়ত্ব ছিল, কহিলেন, আঃ লাইনটি সত্যিই মারাত্মক!

এখানে 'মারাত্মক' বলিতে হৃদয়গ্রাহী বা আন্তরিক জাতীয় কিছু যাহা স্পষ্টীকৃত হয়; এখানে ইনি প্রকৃতই বাঙালী! যেমন আমরা ভয়ঙ্কর ভীষণ ব্যবহার করি—, ইনি বাঙালী! অন্তত এই শোক-সন্তপ্ত পরিবেশে—ঐ ত মৃতর শ্বেতচাদর ইতস্তত কম্পিত—তাহাকে নিরভিমান দেশীয় হইতে নিজ অজ্ঞাতেই হইয়াছিল।

চমৎকার চিঠি লিখিয়াছেন।

'…আমরা উচ্চ মার্গীয় এসথেটিকেস্ জানি, তাহা চকিতে নস্যাৎ হইয়া গেল। আর ঠিক এমনই এক মুহূর্তে সমস্ত বুদ্ধি যাহা বাহিরের জগতের

বিশেষত্ব তাহা আমাদের নিকট ভূয়ো বলিতেই হয় ; তৃষ্ণা ক্ষুধার মানুষটি বড় আপনার যে, সে যে আমাদের এইরূপ নির্মম টিট্‌কারী দিবে তাহা কে জানিত। এখন সন্দেহ হয় সত্যই কি…' হাত নরম ছিল।

'আঃ হা হাত নরম ছিল' যদি হাত নরম ছিল ত আকাশে তারা ছিল, যদি হাত নরম ছিল ত মাটিতে ধূলা ছিল,…ছিল ত মেয়েদের আঁচল ছিল।

সত্যই এমন সান্ত্বনা আমাদের বড় স্নেহে চোখ মুছাইয়া দেয়।

'…উহার সুন্দর মুখখানি চিরদিন আমার মনে থাকিবে। আজও মনে অনেক কথা,…' এইখানে স্যর এই চিঠি লিখিতে কালো কলম থামাইয়া ছিলেন; তিনি মনোরম টেবিলে, রৌদ্র ছটা পড়িয়াছে, তিনি কলমটি দিয়া ঐ ছটার উপর এলেক কাটিতেছিলেন; ইস ভয়ঙ্কর সেই ব্যাপার-পরিস্থিতি নয়ন-সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল!

কি অতর্কিতে ঐ রমণী আক্রমণিত হয়েন, যে একটি থাপ্পড়ে রমণী চেয়ার হইতে ছিটকাইয়া পড়িলেন, সেই লোকটি দাঁড়াইয়া, যে জন এখনই ঐ নীচ অভদ্র উচিত কাজ করিল, তাহার মুখমণ্ডল যারপরনাই উচ্চকিত! যে এমনই সে দাঁড়াইয়া যে সে অপরাধী, যে সে বিবিধ ধর্ম নিষিদ্ধ পাপ সকল ধারণ করিয়াছে ; অজস্র নিন্দা হইতে আপনার দেহকে কোথাও বা সিঁদাইতে মন করে, অথবা আদতে সে নিজেকে আক্রমণ হইতে বাঁচাইতে প্রস্তুত রাখে। যে এবং সে আলো হইতে অল্প করিয়া একটু আঁধারে—যেহেতু প্রায় ক্লাবেরই আলো সাধারণ দিবসে বেশ কমজোরী থাকে মানে বাল্ব কিছু ঝিমোন—সরিয়া যাইতে আছিল; ক্রমে সেই জন দেওয়ালে পিঠ দিতে সমর্থ হইল, তাহার কপালে ঘাম আসিয়াছে। এবং অকথ্য গালাগাল তদীয় মুখ নিঃসৃত হয়।

এই প্রস্তুতিতে ঐ দীর্ঘাকৃত সুন্দর পুরুষটিকে আরও দিব্য মহা পুরুষালি মনে হইল, তদীয় সমগ্র শরীরেতে একটি পৌরাণিক নির্ভীকতা আর আর টেবিল ঘিরিয়া যাহারা সন্ধ্যা অতিবাহিত করিতে আসিয়াছিলেন, তাহারা সোজা হইয়া বসিলেন, এখানে এখন, ঈদৃশ ব্যাপারের জন্য কখনও কেহ আশা করে নাই—মানে অন্তত এই সন্ধ্যাবেলাতে—ফলে কি যে করা উচিত, এমন কি দরওয়ান বা চাকরকে ডাকা তাহাও ঘটিল না ; তাঁহারা থ, তাঁহারা যেন নিশ্চিত জানিতেন ইহা অবধারিত ছিল, এই ক্ষণটির জন্য সকলেই অপেক্ষায় ছিলেন এখন তাঁহাদের ওষ্ঠ কম্পিত হয় এখন কেহ হাতে অন্য হাত ঘষিলেন। বেহারারা একস্থানে খাড়া ছিল। ঐ ব্যক্তি সংযত ছিল।

রমণী তখনও মেজেতে, ক্যার্পেটের উপরে, একটি হাত পুরাতন শ্বেত-পাথরে, কোন অবস্থাকে, সংস্থানকে, সুপ্রাচীন না করিয়া লইলে হায় আমাদের অনুভব নাই। রমণীর কান হইতে একটি কর্ণাভরণ ঐ প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকাইয়া, কিয়ৎ দূর পড়িয়া রহিয়া আছে ; রমণীর সহিত যে যুবকটি ছিল, সে অবশ্যই অপমানে বিভ্রান্তিয়াছিল ; তাহার বিমূঢ় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা নিমিষের জন্যই, কখন যে সে আপনকার কোট খুলিতে গিয়া ত্বরিতে ছুটিয়া যায় মুখে ইংরাজিতে অশ্রাব্য গালি ছিল, ঠিক এমত সময় এক বালক প্রায় ছুটিয়া আততায়ীর দিকে, ক্রন্দিত স্বরে আসে।

ইতিমধ্যেই আমি (এই বৃদ্ধ যিনি এখন চিঠি লিখিতেছেন তিনি বাধা দিয়াছিলেন) ঐ অসহিষ্ণু সুবেশী যুবককে স্থির থাকিতে বলি···, তবু যে এবং তিনি কোন ক্রমে শান্ত করণার্থে একটি চিরাচরিত নীতি কহিয়াছিলেন, কি করিতেছ ছি ছি তুমি আইন হাতে লইতে পার না। কিন্তু তাঁহার বাধার আগেই ঐ যুবক একটি গেলাস ছুঁড়িয়া ছিল। আততায়ী নিজেকে বাঁচাইবার কথা ভুলিয়া যুবককে ধরিতে আসিতেই ঐটি কপালে লাগিল, এবং রক্ত। এবং বালক অদ্ভুত খেদে ফুঁফাইয়া উঠিল, বাবা। যিনি চিঠি লিখিতেছেন, তিনি এখানে রুখিলেন, তখনও তাঁহার চোখে সেই ভূমি অবলুণ্ঠিত রমণী। অন্যত্র কিবা প্রতিহিংসার মূর্তি—অথচ সুমহৎ অভিজাত।

যে রমণী এখন মৃত, ঐ কক্ষে শায়িতা।

পার্শ্বেই গীতকারিণী এখন এমন একটি পদ গাহিতেছিলেন, যে পদে 'ভেলা' শব্দটি ছিল, এখানে সকলেই কোন বিশেষ অহঙ্কারে চিতাইয়া উঠিতে আছে ; একমাত্র যে যুবতী অন্ধ সে-ই ঐ শব্দটি মধ্যে, স্বরের তারতম্য যুক্ত করত রম্যতা আনিতেছিল—কেন না উহার কোন গল্প, প্রকৃতির দুর্যোগ। ছাড়া ছিল না ; অবশ্য তাহার নিয়ত অন্তর্জ্বালা ছিল ; মিষ্টভাষকে সম-বেদনাকে সে ঘৃণার চতুর প্রকাশ বলিয়া বিশ্বাস করে গীত মন্থর গতিতে, অন্ধ যুবতীর স্বরে নিটোল হইয়া উঠিতে আছিল।

ঐ যেখানে এক সুদৃশ্য কেবিনেটের (!) উপরে রকমারি চিঠি আসিয়াছে, খাম সহ সেইগুলি ভারী যত্নে মেলান রহিয়াছে, কোথাও পাখার হাওয়াতে তাহার কাগজের কিছু অংশ অনবরত কাঁপিতে আছিল; পাঠরত কেহ—আঙুল দিয়া আপনার নিকট যে পদগুলি বড় মনোজ্ঞ বোধ হয় তাহা অন্যকে দর্শাইতেছে, দেখ এই লাইন···আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, যে আজ উহার জন্য

হা ভগবান দুঃখ বোধের পরিচয় দিতে হইবে, এইটি হয় রহস্য !

আঃ এই চিঠিটা !

হায় কে গতকল্য ইহা ভাবিয়াছিল যে, এতকাল যাহাকে বিবিধ ফুল সকল পাঠাইয়াছি, আঃ কত কথাই মনে পড়ে। তাহাকে অদ্য এই কঠিন শ্বেত ফুল সকল, পাঠাইতে হইবে, ইস্ কি অন্ধকার !…'

হা ভগবান ! আমাদের হৃদয় বলিয়া কোন পদার্থ আছে কিম্বা নাই, দুঃখ বোধ আছে না নাই তাহার জন্য এই নিষ্ঠুর পরীক্ষা করিলে ? প্রকৃতির নিয়ম এত বড় পৃথিবীতে, কতটুকু বেচাল হইতেছিল যে তাহারে লইলে ?

এই কয়েকটি পাঠে তাহারা বারম্বার আশ্চর্য। আঃ ! দারুণ এই সকল শব্দে আপনকার বোধগম্যতার হিসাব দিয়াছিল, এবং এহেন মুহূর্তে তাঁহারা যাঁহারাই পড়িয়া থাকেন ঐ চিঠি সকল অবশ্য সমষ্টিবদ্ধ ভাবে তাঁহারাই আর একত্রে পরম বন্ধু রূপে, অজানিতে, মিলিয়া যায় ; তাঁহারা একই সঙ্গে পদক্ষেপ পর্যন্ত করেন। যে তাঁহারা অনেকদিন পর্যন্ত এইরূপ রহিবে একাত্ম হইয়া !

কেহ চশমা মুছিল, এইজন নিজেকে প্রস্তুত করেন, ক্রমে বেশ বুঝা যায় যে নিজেকে চাগাইয়া তুলিতেছিল, এই ব্যক্তি একাই ঐ কম্পিত চিঠিগুলি পড়িতেছিলেন পাশে অন্য কেহ ছিল না, এইটুকু স্থানের মধ্যে কি অসম্ভব নির্জন ! আশ্চর্য যে ঝিল্লিরব ঘনাইতেছিল, কখনও অতীব দূরাগত গাড়ির হর্ণএর শব্দে ! এই ব্যক্তি ধূপের গন্ধ পাইতেছিল যে তিনি অন্যত্রে তাকাইলেন মধ্য টেবিলে রকমারি সিগারেটের টিন, কোনটি চ্যাপটা, এবং চুরুটের বাক্স —ইহার ডালাতে লাল মখমলের অস্তর, যাহার উপরে সোনার অক্ষরে নির্মাণকারীর নাম ; ছাইদান ; পশ্চাতে বিবিধ ভঙ্গীতে নীরবতা ; কেহ ঈষৎমাত্র নড়িবে না পাছে ঐ শান্ত অবস্থা নষ্ট হয় ; এবং যে এই গূঢ়তার শেষে দরজার মধ্য দিয়া ঐ শীতল ছবি ; যাহা বুঝিয়া লইতে আধ্যাত্মিতে মানুষ তীব্র শ্লেষাত্মক অভিধা, কখনও কাম্য, আবার হাঁপাইয়া বহু অলঙ্কার, মনোরমত্ব বৃদ্ধি যাহা, চুঁড়িয়াছে ; চশমা পরিহিত ব্যক্তি যে এখনও একাই, তাহার ঠোঁট অনুচ্চস্বরে শব্দিত হইল, যে যাহা এই—এখন ইহা বোধিল যে এই পৃথিবী দীর্ঘশ্বাস ত্যজিবার জন্য ঈদৃশী বিরাট, ঐ পৃথিবী, সৌরলোক ঐ নক্ষত্রলোক !

ইহাতে বড় করুণ কণ্ঠে বিদায় বিদায় শ্রুত হইতেছিল !

এই পদে, আমরা দেখিব দুই বার বহুব্যবহৃত শব্দ আছে, সুস্থ বা স্বাভাবিক জগত (।) হইতে যাহাকে বেশী বা অপচয় বলা নিশ্চয়ই যায়, ইহাতে বাধা দিবার কেহ নাই ; এই সমালোচনা তখনই বিবেচ্য যখন লেখক লেখা ব্যবসায়ী ! এ ক্ষেত্রে তেমন নহে ; এখানে মান্য করিতে হইবে যে একজন ভাঙিয়া পড়িয়াছে, ঐ মর্মান্তিক খবরে সে যারপর-নাই সন্তর্পণে, পদক্ষেপ করিয়াছে, ওষ্ঠ দংশন করিয়াছে ! আপনার বেদনাকে প্রকাশিতে ছেলেমানুষের মত ক্ষিপ্ত হইয়াছে !

ঐ চশমা পরিহিত ব্যক্তি আপনকার এবম্বিধ আবেগ নিজেই অনুভবিয়া বেশ সঙ্কুচিত হয়েন, তাঁহার এই বিভ্রান্তির মধ্যে—শুনিলেন ! অদ্ভুত অল্প-বয়সীর তাকলাগা স্বরে বাবা, বাবা দেখ, ঐখানে ঐখানে ; রোলস্-স্পোর্টস্ ; দেখ উহার একঝসৃট পাইপ। রোলস-বাজী ! আমাকে দেখিতে দাও !

ঐ বাক্যরাজির এখানে সকলকে বড় জব্দ করিতে আছিল—ইহা কলঙ্ক ! সকল সশ্রদ্ধা অপরাধ মনে যখনই ঐ শায়িতা ঐ পরাজয়ের দিকে নেহারিয়াছে, ঠিক তখনই সেই আলার্মের শব্দ।

শোকাচ্ছন্ন যাঁহারা তাঁহারা দেহের কোনখান দিয়া তৎপর হওয়ত ঝটিতি যে বাহির হইয়া আসিতে হইবে, তাহাতে ধাঁধাপ্রাপ্ত তাহারা হইলেন ; ধ্বনিয়া উঠিল রহস্যময়। তৎসহ রকমারি গ্রামে, মেলাই সমার্থবোধক শব্দ উচ্চারিত হইল।

গীতকারিণীরা সকলেই হতবাক রহিল, তাঁহাদের প্রত্যেকের কণ্ঠে যেন কঠিন কিছু বিদ্ধ হইয়াছে ; বেচারীগণ একে অন্যের গা ঘেঁষিয়া বসিয়াছিলেন। ঠিক যে সময়ে তাঁহারা সেই মা'র প্রতি নজর করিয়াছিলেন, এখনও নিশ্চয়ই ইঁহারা উহারে, ঐ মাতাকে, মনেতে তাড়না করিতেছিলেন মহা বিরক্তিতে ; কি বা প্রয়োজন ছিল উহাকে আনা ! ঐ শিশুকে !

হাঁঃ !

ছিঃ 'হাঁঃ' বলা উচিত নহে। দেখ, দেখ, শিশুটির মাধুর্য। ছিঃ

হাঃ কি ভাবে বলিয়াছি বলত ?

আমি জানি। দেখ, কি বা চোখ। কি মধুস্বর, মাগো সুন্দর দন্তপাতি। ছিঃ !

ও না কখনই না, আমি বুঝিয়াছি তুমি কি ভাবিতে আছ ; জানিও আমি নিষ্ঠুর নই ! পাপ ! জন্মসূত্রর অঘটন আমি ভাবিলাম না।'

যে মহিলার কোলে ঐ শিশুটি ; তদীয় ভ্রূযুগ উঃ চকিয়াছিল ; ভাবিত যে আমার সুখ সকলেরই ঈর্ষার কারণ ; ইহারা এতদূর পর্যন্ত গিয়াছে যে আমাকে ইহারা নেটিভ বলিয়া থাকে ; যেহেতু আমি জানি সেই গল্পটি, যাহা মদীয় পশ্চিমা আয়াটির নিজের জীবনের ঘটনা। যে সেই আয়া কি দুর্ধর্ষ হইয়াছিল ; যখন এই ভদ্রমহিলার, আগ্রহ দেখিয়া সেই আয়া স্বীয় হাতের রৌপ্য নির্মিত বালা ; যাহাতে যেখানে বলয় করিতে দুই অন্ত মিশিবে ঠিক ঐ দুই স্থানেতে, কোন জন্তুর মুখের আদল আছে, ভীষণ ব্যাঘ্র! সেইগুলিতে হাত দিল, টানিল যাহাতে যে ঐ দুটি কোন অভিব্যক্তির অন্তরায় না হয়! বা লজ্জায়।

ঐ আয়া তখন আপনকার অঞ্চল কোমরে আঁট করিয়া লইল ; যখন এই বিরাট সুসজ্জিত কক্ষের চারিদিকেতে নেত্রপাত করিল তৎক্ষণাৎ এইখানটার নিজস্ব সকল জৌলুস খোয়া গেল ; আয়া কহিল, ঘন কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি ; আমার শিশুপুত্র দাওয়াতে হঠাৎ একটা কান্না, আমি ছুটিয়া আসিলাম, হা কপাল! হা আমার জনম! আমি গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিলাম ; খানিক এই দিক ঐ দিক ছুটিলাম ; হাত-তালি দিলাম, মশাল জ্বালাইলাম, হা হা রবে বন বাদাড় দেখিলাম, কানে হাত দিলাম—ঝিল্লিরব শ্রুত হইল, আমি পাগলের তুল্য, আমার কান্নায় গ্রামবাসীরা আসিল! যখন ফরসা প্রায় হয় তখন দেখি আমার ছেলেটি ফুটটুস গাছের ঝোপের তলায়। উহার দেহে শিয়ালের দাঁতের দাগ!

সকলে কহিল ; তোমার জন্যই। হা মা বটে!

এই শিশু ক্রোড়ে ভদ্রমহিলা ; অন্যত্রে যখন বলেন, তখন শ্রোতৃবর্গরা খুবই হতবাক রহিল ; কহিল কোথায় সেই আয়া! ইহারা দেখিতে চাহিলেন ঐ আয়াকে?

ওঃ ভারতবর্ষ কি জঙ্গল! কি ভালই করিয়াছি ; যখন তাহাকে দূর আসামের সোদিয়াতে বদলী করা হয়, আমি যাই নাই'...'

ওঃ '......' (অমুক) এখানে নাই, সে ত মানে ত্রাসিত হইত, জান, আর কিছুদিনের মধ্যে তাহার পুত্র হইবে! সত্যি লোকে কি ভাবে বাস করে।

এমত প্রসঙ্গে সকলেই, স্বস্তি ঠিক যেখানটিতে সেই নিপট সরলতা ব্যতীত কোন কিছু নয়, সেই স্থানে পৌঁছাইলেন ; যে একের প্রতি একের মৃদু কুশল-জ্ঞাপক মঙ্গলহাস্য খুবই, স্বাভাবিক হয়। যে এবং এই শ্রোতৃবর্গের একজনই,

এমনও হইতে পারে প্রত্যেকেই, ব্যক্ত করিলেন, সত্যই ! এই উক্তি কেন যে, যে ইহা কি সিদ্ধান্ত, বা অর্থহীন মাত্রা !

এই 'সত্যই' বড় গম্ভীর !

এখনও ঐ গীতকারিণী সকলে, আহত হইয়া আছে, যে তাহারা মৃতার প্রতি ; মানে ঐ শুদ্ধ মুখমণ্ডল, নিষ্পলক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষিতে আছিল ; এমত যোগে, ইহা অবাকের হয় যে, এই গোষ্ঠীর প্রতিজনেরই অতীব, যাহার কিনারা করা যায় না, ঈদৃশ আস্তে মুখ নড়িতে আছে ; এইভাবে, তাহারা ধূপের ধোঁয়াকে নিশ্চয়ই হটাইতে থাকে ; যে তাহারা নির্ঘাৎ ঐ শান্ত অসহায় মুখমণ্ডল হইতেই এইটুকুন অধীরতা প্রকাশ করার খেই পাইয়াছিল, মনে কোন অবিশ্বাস নাই, যে ঐতে কোন সাড় নাই !

শব্দকে বড় নিকটের করিতেছিল, গীত গাহিতেছিল।

যে এতাবৎ, যাহারা কতক শব্দের মহিমাকে বিশেষ খেলাইতে মন করিয়াছিল ; আর একদিক দিয়া বলা যায়, এখানকার বিবিধ কিছুই : যাতায়াত, অবলোকন, দেহ চালনা কথা—অনেক বেঘাট ঠেলিয়া এখন প্রতিষ্ঠিত—সবই পূর্ণ সঙ্কেত হইয়া আছে ! মানুষ কি প্রহেলিকা আলাদা, আঃ কত না লুকাইয়া থাকিতে পারে। এই তত্ত্ব নিচয় ঐ শব্দ গভীরে প্রবেশিবার সুকৃতিই যাহারা নিঃসঙ্কোচে দেখিতেছিল ; বহু প্রাচীন কাল হইতে, মৃৎপাত্র কোন ছার, অস্ত্র অগ্নি উজাইয়া অনেক দূরে—তখনকার হইতে, যখন প্রতি রোমকূপ দিয়া নিশ্বাস পড়িত বা নিশ্বাসই দেহ, আঃ ভগবান। ঐ কালস্তরেই তাহারা আছে ! এবং দেখে।

আশ্চর্য একটি শিশু কণ্ঠস্বর তাহাদের বিরক্ত করিল ; মাতৃক্রোড়ের ঐ আনন্দ বিষ ঢালিয়া দিল সে আপনকার জননীর সুঠাম থুতনিতে হাত দ্বারা স্পর্শে বারম্বার জিজ্ঞাসে, কোথায়···মারা গিয়েছে !

তদীয় মাতা যতবারই, মৃদু তাড়না ছলে ঈষৎ চাপা কঠিন স্বরে বলিলেন, ঐ ত···আঃ···উঃ তুমি বড় দুষ্ট হইতেছ···ছিঃ···ঐ ত '···' মাসী ঐ ত খাটে ···আঃ !

খাটে শব্দতেও শিশু বুঝে না, অথবা সে চেনা অচেনা মুখ সকল দেখিতেছিল ; সে এদিকে সেদিকে কখনও বা গীতকারিণীদের প্রতি নিরখিল, ও যে তৎসহ প্রশ্ন করে, কোথায় !···ঐ যে ! ঐ টা (!) মরিয়া গিয়াছে ?··· এমত সময়েতে শিশুর অঙ্গুলি নির্দেশিত ছিল ঐ শোকগান যাহারা করে তাহাদের

প্রতি এবং, মাগো কি লজ্জার ! কহিল,…ঐ উহারা মরিয়া গিয়াছে…উহারা। আঃ বল না ! উহারা…ঐ যে ঐ যে।

শিশুর মাতা মহা আতান্তরে পড়িলেন, যে তাঁহারে যাহা নিছক অধোবদন করিল, তিনি বেচারী কোন মতে শিশুর মুখ হস্ত দ্বারা চাপিতে গেলেন, কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন, অজস্র লোক ভেদিয়া অন্যত্র যাইলেন: আর শিশুটি সারাক্ষণ বলিয়া চলিল ইহারা মরিয়া গিয়াছে !

ঐ প্রগল্‌ভ শিশু ঐ বিরাট শহরের তীক্ষ্ণতাকে চাতুর্যকে নস্যাতিয়াছিল। সকলেই তখনই মৃতার দিকে, কখনও আসবাব, কখন দৃষ্টি নীচু করত আপন ওষ্ঠ দেখিতে চাহিয়াছিলেন কেহ আপন কপোতাখ্যে বক্ষের প্রতি নেহারি-য়াছেন দুগ্ধের আসার গ্রাম্য শব্দ শুনিতে আছিলেন একে, ঐ আধো কণ্ঠস্বরে বা ত্বরিতে অদৃশ্য হইতে পদক্ষেপ করিল এই কক্ষ হইতে—পাছে কেহ লজ্জা পায় যে সে শুনিয়াছে এরা মরিয়া গিয়াছে ?

অন্ধ যে, আপন দেহই যাঁহার ভাবনা ; সেই রমণী এখন যখন ভেলা রূপেতে সমাধিক মাতৃস্নেহের দ্বারা ত্বাচ্‌ প্রত্যক্ষ করণের কি যন্ত্রণার চেষ্টা করিতেছিলেন, ইনি সেই যিনি, প্রতি ফুল-চক্র বা তোড়া হইতে কিছু পাপড়ি সংগ্রহর কথা বলিলেন।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝাইয়া বল ত ; আমি মানে আমরা ঠিকভাবে বুঝিয়া উঠি, ফুল পাপড়ি এবং এই ব্যক্তি তখনই ভ্রূ কুঞ্চিতের ভাবনা করিলেন, যে তত্রাচ মুখেতে সপ্রতিভ লক্ষণ আছে—যে তিনি কিছু হাবা নহেন, যে তদীয় কাজের টেবিলে কাগজপত্র ফাইল হদিশ করেন; এবং এমন যে মহা আতান্তরে এখানে এক ঘোর ছাইয়া রহিয়া আছিল ; দূরে ঐ কথিত শব্দ !

যে ঐ অন্ধ রমণী এখন অদ্ভুত হস্ত ভাঙনে আপনকার কল্পনাকে মনোরম পদ্ধতিতে উজর করিতেছিল ; যে ক্রমে ইহাই ব্যক্ত হইতে আছে যে মানুষ শালভঞ্জিকা নৃত্যকলা ভুলিয়া যায় নাই ; বিশ্বাস হয় এই জন্য যে ঈদৃশ ছন্দে ইহার অঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয় ! বলিতেছিলেন,…এবং মানে ঐ ফুলের পাপড়ি-গুলি…।

এই ব্যক্তি শুধুমাত্র স্বীয় 'আঃ-কি-যে' বলিবার আন্দাজ মত কণ্ঠস্বরকে আশ্রয় করত দাঁড়াইয়াছিলেন ; অবশ্যই ইনি কিছুটা বিচলিত আনকালচর্ড প্রমাণিত হইবেন! ইহার সম্মান মান বুঝি বা যায়; যে ইতঃমধ্যে তিনি ব্যাখ্যা-কারিণীকে দেখিলেন, যে যাঁহার পদদ্বয় খালি যাঁহার হাতের অঙ্গুলি একটি

বড় কমনীয় গাছের (গুল্ম) পাতাতে খেলিতে আছে—অতএব ঐ কণ্ঠস্বরও এমত এক বর্তমানতায়, মানে জগতের নিকট একেবারেই বাজে, যে তিনি সত্যই অস্বচ্ছন্দ বোধেতে থাকেন ; এই স্থান হট-হাউস, রকমারি উদ্ভিজ্জ এখানেতে রক্ষিত আছে আঃকি বা লাজুক বুদ্ধিদীপ্ত পাতা সকল! এখানে ঐ শোক-সঙ্গীতের কিয়ৎ টুকরা ভাসিয়া আসিতেছে—যাহা ঐ ব্যক্তির একমাত্র জাগতিক চেতনা রূপে, যথার্থ ফিকে ভাবেই অবশ্য রহিয়াছে! যদিও তিনি কতক সংস্কার বশতই, মনেতে আঃ দারুণ বলিয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার অভ্যাস ইহা সহবত হিসাবেই হয়, অনুধাবন করেন ; কিন্তু কোন তাড়াজাতীয় বৃত্তি অনুভবিত হয় না ; এমন কি, ইচ্ছানুযায়ী (গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য করার কোন কথা অনেক ক্ষেত্রে আসে না) নস্যাৎ করিবার শ্রেণীগত রীতি ভুলিয়াছেন! তবু কহিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ অর্থাৎ ঐ পাপড়ি…

এবং ইহা বলিতে কালে তিনি, এই ব্যক্তি, শোকসঙ্গীতে হাত দিয়া থাকিতে চাহেন, কেননা ঐ অন্ধ রমণী ধীরে আমোদ হইতেছিলেন, ইহাতে সুতরাং তাঁহার এমনই বিশ্বাসে, যাহা সব সময়েরই, গাত্রে সিঞ্চিড়া লাগিল! যেখানে, যে একের সবই পরীক্ষিত ভাবে ঠিক আছে—ইত্যাকার মীমাংসা যে কত বোকা চেতনা! যে আমার বিছানা স্থির যৌবনা! চাক্‌চিক্যময়! চেয়ার আরামপ্রদ! সেলাম তেমনি আছে! গাড়ি বেগ দেয় না! পড়শীরা সজ্জন!

আপ্ত বাক্য সকলে পরোক্ষভাবে যে অসুস্থতার কথা থাকে তাহাই ইদানীং তাঁহাতে ঘনাইতে আছে! এবং যে তিনি নিজ অজ্ঞাতেই এই হট-হাউসের দরজা দিয়া বাহিরের প্রতি নেহারিলেন ; সেখানে বাগান, আগ্রহ তাঁহার হইল, ঐ ঘাস কাটা যন্ত্রটি চালনা করিবেন। আঃ কি চমৎপ্রদ শব্দ উহাতে হয়!

আর ঐ (যান্ত্রিক) শব্দ, ঐ অন্ধ রমণীর বাক্য বিস্তার যাহা দুর্বোধ্য, যাহা মতিচ্ছন্ন ভয়প্রদ স্বর মাত্র, হইতে রক্ষা পাইতেন ; এবং এখন তিনি দ্রুতপদে বাহিরে ফুল গাছ হইতে সত্বর ফুল ছিঁড়িতে আছেন এমন সময় ঐ রমণী ডাকিলেন, আঃ তুমি কোথায়!

ইত্যাকার প্রশ্ন সুদারুণ হইয়া, ঐ ব্যক্তিতে, একটি ধাক্কা হইতে পারিত, যদি সত্যই কিছুক্ষণ আগেকার ব্যবহার্য সকল কিছু এবং পারিপার্শ্বিকতা যে খুবই অর্থহীন, নিছক ভারতীয় জ্ঞান, মনে হইত, কিন্তু তবু ইহা ধ্রুব যে, এই ব্যক্তির ঐ ঐ বিষয়গুলি প্রসূত যে নিঃসন্দেহে যে নিশ্চয়—যে তাহা সকল

আছে-তাহাতেই ঘোর লাগিয়াছিল যাহা এক মুহূর্তেরই, আরও এই জন্য যে, ঐ রমণীর পদ্ধতি বুঝিয়া লইতে না পারার কারণেই, নিজেকে নির্বোধ মানিতে গিয়া, ঐ সকল কিছুকে জড়াইতে হইয়াছিল ; যেহেতু নিজ কথাটির ঐগুলি বিকিরণ! অতএব, ঐ সুন্দর মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসার উত্তরে এই ব্যক্তি বলিল, এখানে···আসিতেছি এক মিনিট!

এখন, এই ব্যক্তি নির্মমভাবে ফুল সকল আহরিতে আছিলেন, ইহা করিতে তাঁহারে ভারী কৌতুকপ্রদ দেখায়, হায় অন্ধ রমণী এই দৃশ্য হইতে বঞ্চিত হইলেন ; এবং ফুল সকল সংগ্রহ হইতে ঐখানে যাইলেন, ও হাঁপ ছাড়িতে থাকিয়া উচ্চারিলেন, আঃ ঐ যে ফুল সকল! এক সজীব আত্মবিশ্বাস ধ্বনিত হইল! ভাগ্যিস ইনি শিস্ দেন নাই ; যদিও শোক সঙ্গীতের সুরে তেমন মনোভব উপজাত হয়!

এখন এই ব্যক্তি যিনি ফুল ছিঁড়িলেন, তাঁহাতে—তাঁহার সর্বত্রেই, অন্ধ রমণীর কণ্ঠস্বর মোচড় দিতে আছিল, যাহা ঐ রমণী কথিত কোথায় শব্দ ঘটিত ; নিশ্চয় ঐ শোক সঙ্গীত ঐ জানিতে চাওয়াকে আরও গভীর করিল : ঐ ব্যক্তিকে উহা নিংড়াইতে লাগিল ; ইনি দেখিলেন যে ইনি নিজে ঐ সবুজ মাঠে লাফাইয়া ফিরিতেছিলেন, আঃ একদা আমি ছেলেমানুষ ছিলাম! কত সহজেই ইত্যাকার জিজ্ঞাসার যে তুমি কোথায়-এর উত্তর করিতে পারিতাম যে এই যে আমি!

এখন ইঁহার হাতে ফুলের রস কিছু লাগে, সেই জন্য সমস্ত দেহতে বেপট উসখুস ছিল ; কিন্তু সমক্ষে ঐ অন্ধ রমণী! যে সূত্রে, প্রতিতেই নিখাদ কর্তব্য-বোধকে সটান রাখিবে—এই ব্যক্তি! যে বলিতে পারিত—এই যে। এবম্বিধ উত্তরে একে তুখড়ভাবে এই দেহ এক স্থান হইল। এই সত্যের মধ্যে এক অদ্ভুত রহস্য, ক্রমে যে রহস্য মহা তরাসের ; কিন্তু এই ব্যক্তি সেই দিকে মনস্ক হয় নাই, সে অন্ধ রমণীর কাছে যাইতেছিল ; অন্ধদের বড় নিকটে যাইতে হয়!

অন্ধ যিনি, তিনি ঐ শোক সঙ্গীতের অর্থাৎ শোক সঙ্গীতের শব্দ সকলে—যাহা রমণীতে শব্দ তরঙ্গমাত্র—জায়গা দিতে চাহেন; সেইগুলির শব্দতরঙ্গ না রঙীন চেহারাতে। ইনি ফুল পাপড়ির স্পর্শে এক গভীর শ্বাস লইলেন, এবং কহিলেন, পাপড়িগুলি ইতস্তত ছড়াইতে রহিয়া, আঃ আমরা যদি প্রতি রৌদ্ হইতে কিঁছু কিছু পাপড়ি লইয়া উহার, মৃতের, চাদরের উপর ছড়াইতে থাকি

ত বেশ হয়? কি বল তুমি!

আঃ চমৎকার দারুণ হইবে।

এহেন উত্তর শুনিতে কালে তদীয় মুখমণ্ডল খুব ধীরে যেন উড়িয়া যাওয়া ফুলের পাপড়ির গতি অনুসরণ করিতেছেন—নড়িতেছে।

দারুণ!

অন্ধরমণী এমন এক ছবিত্ব সৃষ্টি করিলেন ঐ ফুল পাপড়ি ছড়ান—যে সকলেই বিস্ময়ে স্পন্দিত হইল। এই পাপড়ি অবকাশের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে পড়িতে থাকার যে রূপ—তাহা শোক সঙ্গীতের শব্দগুলিকে যাহা মানুষের দীর্ঘশ্বাসের দুঃখের সহিত আশ্চর্যভাবে একীভূত, যে এমনও প্রশ্ন হয়, যে, ভেলা, বন্ধন, পরপার এই সব শব্দগুলি বড় পাঁজড়া ভাঙিয়া যাহা উচ্চারিত হইতেছে, তাহা গভীরতম দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ মাত্র!—এখন এই সকল শব্দকে খুব পরিষ্কার ভাস্বরিত করিয়াছে!

ইত্যাকারে ইহারা—অর্থাৎ মনুষ্যবাচক কথাটি প্রহেলিকা হইল।

একটি ফুলচক্র হইতে, কিছু পাপড়ি ছিঁড়িয়া আনা, ঐ মৃতদেহকে এক সুমহান কিছুতে পরিবর্তিত করিতেছিল; দেহটি কোথাও যেন জাগিয়া আছে। এখানে ছেলেটিকে, যে রোলসগাড়িতে আকৃষ্ট হয়, তাহারে আনা হইল; সে পশ্চাতের দিকে দেখিল, ঐ ঘরে লোকে এমত ভাবে বসিয়া আছে যে এইমাত্র মস্ত একটা বাজীতে তাহারা হারিয়াছে, যাহাদের জুতা দাপাইলে অনেক ধূলা পড়িবে, সে অল্পবয়সী, রেসের মাঠে ইহা দেখিয়াছে! ইহারা কিছুক্ষণ পূর্বে তুমুল চীৎকারে মাঠ প্রকম্পিত করিল। ইহাদের বাটন হোল হইতে সিল্কের ফিতাতে ঝুলান চাকতি; রুমাল বাহির করিতে যাহা এদিক সেদিক যাইল, রুমাল মুখের অবসন্নতা তাহারা মুছিবার চেষ্টা করিল।

অল্পবয়সী ধীরে মুখখানা ঘুরাইতে দেখিল, তাহার সামনে এক ভদ্রমহিলা ধরিয়াছেন রৌপ্য ছোট থালিতে একটি এ্যাটমাইজার। এই যন্ত্রটি খুব দামী, ক্রীস্টালের নিশ্চয়! ভারী চমৎকার একটা খেলা, ঐ বলটি টিপিলে ধঁা করিয়া খানিক সুগন্ধী ছুটিবে; ইচ্ছা করে কাহারও চোখে ঐ ফোয়ারা দিতে। চোখে যাহার লাগিবে সে অতিমাত্রায় ছল বিরক্তিতে কহিবে, আঃ!

অল্পবয়সীর কাঁধ এখানে অধৈর্য হইল। তবু সে উহার সামনে অদ্ভুত কঠিন হইল; নিশ্চয় তাহার মনে ইহা হয় তাহারে যেন বোকা বানাইবার জন্য এবম্বিধ আয়োজন। সে একটু সরিয়া আসিল।

ও কি।

অল্পবয়সী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া যিনি বহন করত ঐ থালি আনিয়াছেন তাহার দিকে অল্প চোখ তুলিয়া দেখিল!

তোমার মা!

অল্পবয়সী আর একটু চোখ ফিরাইলে ইহা বুঝিত যে অনেকজন তাহার দিকে নেহারিয়া গীত গাহিতে আছিল! সে ঐ দিকে তাকায় নাই। বরং সে এ্যাটমাইজাবের দিকে চাহিল; এবং সে অনুচ্চস্বরে, আঃ বলিয়া উঠিয়াছে।

এখানে এই মজার খেলার সামগ্রীটি নীচ হইতে আসা কুকুরের ডাকের সহিত মিশিতেছে—ঐ কুকুরটি নির্ঘাৎ চেনে আটকান। অল্পবয়সী ঐ যন্ত্র নজর করিতে কালে সমস্ত, যাহা কিছু ওতঃপ্রোত, তাহাকে অর্থহীন বলার যোগ পাট এখানে থাকে। বিশেষত যখন অল্পবয়সী এখানে এবং যাহার সহিত ঐ মৃতদেহের ইহকালের এক সম্পর্ক আছে! ফলে এতক্ষণ বাদে সকলে বিশ্বাস করিল যে, মৃত্যু ঘটিয়াছে!

এসময় যখন চিঠি পড়িয়া একে, দুঃখ বোধ নিমিত্ত, বাহিরের দিকে তাকাইল, ইলেকট্রীক তারে পাখী, আরও পিছনে নারিকেল গাছের পাতা দুলিতেছে, আরও দূর পাশুঁটে আকাশ; এবং এইজন যে মুহূর্তে চিঠির বচন স্মরিয়াছে: হৃদয় কি শুধু মৃত্যুর জন্যই আছে। মৃত্যু আসিলে হৃদয় বিকল হইবে। ঠিক তখনই এক এলার্ম ঘড়ি বাজিয়া উঠিল!

এলার্ম বাজিয়া চলিয়াছে!

যাহারা শোক সঙ্গীত গাইতেছিল তাহারা ক্ষণেকের জন্য নিজ ওষ্ঠ উন্মুক্ত রাখে, যাহারা অবসন্ন হইয়া স্বীয় দেহকে নিরীহ করত বসিয়াছিল, তাহারা সটান হইল। গৃহের উর্দি পরিহিত চাকর ঈষৎ বোকা বনিয়া এ ঘর ও ঘর করিল।

এখন এলার্ম!

প্রত্যেকেই যতখানি থ হইয়া ছিল, অবিকল ততখানি আশ্চর্য একপ্রকার পরিপূর্ণতা (!) লাভ করিল; আবার তখনই তাহাদের দৃষ্টি ঝাপসা হইল। ইহা কিসের সঙ্কেত! কোন ঘুমন্তকে জাগরূক করিতে কি ইহা। আশ্চর্য! প্রত্যেকেই এলার্ম বাজার কারণ না-জানা প্রকাশিতে ঘাড় নাড়াইল। গৃহস্বামী কারণ অনুসন্ধান-জন্য ঈষৎ জলদি পদক্ষেপে যাইতে হইল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি শুধু জানাইলেন, যে ইহা খুব আশ্চর্যের!

কেহ এলার্ম দেয় নাই।

ঘড়িটা বহুদিন অকেজো!

কিন্তু এলার্ম।

এখানে যে ভদ্রলোক হাতকাটা-সার্ট পরিহিত আপন চেটাল হাত কপালে বুলাইয়া অনুচ্চস্বরে কহিলেন, মিসটেরিয়াস। যে এবং আশপোশে ছেলেমানুষের ন্যায় চাহিলেন, প্রত্যাক্ষিলেন যে জনাজাত আপন হতভম্ব স্থবির অবস্থা হইতে ঐ শব্দটিকে নিশানা করিয়া আসিতে আছে; আঃ ইহারা তাহারা, যে সকলে হাত দিয়া কুজ্ঝটিকা সরাইতে পারে। ইহারা তর্জনীর দ্বারা যাহারে দর্শাইবে তাহাই অস্তিত্ব লাভ করিবে। তাহারা উচ্চারিল, মিসটেরিয়াস। তৎশ্রবণে হাতকাটা-সার্ট পরিহিত ব্যক্তি কেমন যেন কঠোর হইলেন, বেশ বুঝা যায় যে তিনি বিশেষ অসহিষ্ণু. কিছু যেন তাহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এবং দাম্ভিক ভাবে ঘোষণা করিলেন, যে, ইহা আমি যে মিসটেরিয়াস শব্দটি প্রথম বলে। আমি।

আর সকলে এবম্প্রকার উক্তিতে এতটুকু বুদ্ধি হারাইল না, তাহারা অতীব ধীরে মৃত্যুর ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দরজার নিকট এ্যাটমাইজার হাতে তখন ভদ্রমহিলা নিকটে ঐ অল্পবয়সী; পাপড়ি ছাড়ান; তাহাদের কানে এখনও এলার্ম-এর শব্দ ছিল, ইদানীংকার মিসটেরিয়াস! এই শব্দে সব কিছু এক হাঁপফেলার মত থৈ পাইয়াছে!

আমি! আমি প্রথম বলি মিসটেরিয়াস।

ইহার কণ্ঠে আবিষ্কারের উন্মাদনা আছে, যে এবং তিনি এই ব্যাপারে কাহারেও ভাগ দিতে রাজী নহেন ক্রমাগত তাহার গলা চড়িতেছে এবং তিনি সন্দেহের চোখে সকলের প্রতি নেত্রপাত করিলেন যে কেহ এই ব্যাপারে মাথা গলাইতে চাহিতেছে কি; কিন্তু, কেহ তাহারে শান্ত করিতে মন করিল না; এমন বিবেচনাতে যে পাছে এইখানকার গাম্ভীর্য শান্তি বিনষ্ট তাহাতে হইতে পারে, যেহেতু ইহা বেশ স্পষ্ট, যে ঐ ব্যক্তি দাঁড়াইয়া উঠিলেন; উঠিলেও বেশ স্বচ্ছ যে তিনি লাফাইতেছেন; মুখে একটি কথা—আমি প্রথমে বলিয়াছি মিসটেরিয়াস! এবার তিনি ছুটিলেন, ঘুমন্ত গ্রাম ভেদ করিয়া—হাতে তাহার মশাল; এবার তিনি বিরাট নগর উজাইয়া; এবার তিনি বহু পুরাতন কালের এক ধূলিসাৎ এক নগরের ধ্বংসাবশেষ—যেখানে বাড়ির দেওয়াল রাস্তাকে—রাস্তাকে পয়ঃপ্রণালী বাধা দিয়া এক মহা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে—এখানে

কখনও আলো কখনও অন্ধকার, অদূরে টিলাতে গাধার পিঠে গান গাহিতে থাকিয়া পথভ্রান্ত রাখাল ফিরিতেছে।

তিনি কহিলেন, আমি প্রথম মিস্‌টেরিয়াস বলিয়াছি।

নিকটস্থ সকলেই হঠাৎ অপ্রস্তুত হওয়াতে এমত ভাবে তাহার দিকে চাহিলেন যাহাতে বলা হইল, মহাশয় আপনি উত্তেজিত কেন, আমরা আপনার স্বত্বকে বেদখল করিতে কখনই ইচ্ছা করি নাই—আমরা ভদ্রলোক। আমরা অতীব সূক্ষ্ম এক পর্যায় পৌঁছাইয়াছি—ঐ বালক ঐ এ্যাটমাইজার। যাহা দ্বারা আমরা সৌখীন যাহা দ্বারা খেলা হয়—তাহা শ্রদ্ধার। শ্রদ্ধার কিছু লইয়া আমরা নিশ্বাসের তারতম্যে আনন্দ করি—আমরা সূক্ষ্ম। ঐ সূক্ষ্মতা হইতে কিরূপে অপহরণ কার্য হইবে। আপনি নিশ্চিন্ত হউন আমরা মানী সজ্জন।

আমি। বলিয়া সেই হাতকাটা-সার্ট পরিহিত ব্যক্তি রুক্ষস্বরে উচ্চারিলেন, তবু আমি বলিব, যে আমি প্রথম, তোমরা সকলেই জান, আমি একজন কেমব্রিজের ছাত্র, তাহা বাদে আমি গ্লাসগোর (?) ইঞ্জিনিয়ার, আমি ঘড়িটি দেখিব তাহার মধ্যে কি মিসট্রি আছে।

আপনি এত দেশ-বিদেশের লেখাপড়া করিয়া একি বলিলেন, ঘড়িতে আবার কি মিসট্রি থাকিবে, হা!

সত্যি আমি যেন কি হইয়া গিয়াছি—আমার গলা শুকাইতেছে। আমার সর্ব শরীর এক অবসন্নতাতে ভরিতে আছে। আঃ আমি আর এখানে তিষ্ঠাইতে পারিতেছি না। আমার কজি সরু হইতেছে! দেখ পত্র আসিয়াছে, সে এখানকার আচার মানিল, ঐ সে গম্ভীর, ভারী দক্ষতার সহিত এ্যাটমাই-জার টিপিতেছে। কাহার শ্রদ্ধা নিবেদিত পাপড়ি সকল পাখার হাওয়া সত্ত্বেও অবকাশে স্থির ধূপের ধোঁয়া সকল স্থানচ্যুত হইতেছে না, খাটের তলে যে বরফের চাঁই আছে, তাহা হইতে অবাক লঘু বাষ্প উঠিয়া থমকাইয়া আছে—ঐ কেহ খাট সমেত অন্তিম যাত্রা করিয়াছে। তাই শুধু শোক সঙ্গীত শ্রুত হয়! আঃ মিস্‌ট্রি!

আপনি ধন্য আপনি প্রথমে হদিস দিয়াছেন।

দাম্ভিক ভদ্রলোক দেখিলেন যে, ইহারা যাহারা বলে, তাহারা ক্রমে চুপসাইতেছে, মুখমণ্ডল ছোট হইতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই আমারে টিট্টিকার দিল, এবং তিনি মহা আতান্তরে পড়িলেন।

এতাবৎ মৃতার নিশ্বাস ছিল না, ফলে ডাক্তারে সার্টিফিকেট দিল, যে তিনি

মৃত। অতএব এই দেহকে দাহ করা যাইতে পারে। যাহারা খবর পাইয়া আসিয়াছিলেন সকলেই দুঃখিত। কিন্তু মৃত্যু—যাহা লইয়া অজস্র ক্রিয়াকলাপ, যে মানুষ এতটুকু, মৃত্যুতে নির্বোধ নহে—এত দর্শন যে মানুষ, মৃত্যু দর্শনে হাসিতে পারে ; এত কাব্য ছবি যে মানুষ তাহাকে. মৃত্যুকে, ভারী মনোজ্ঞ করিয়া সাজাইয়াছে, অর্থাৎ দীর্ঘশ্বাসকে ছন্দিত করিয়াছে—সে-ই এখানে স্ফুটমান হয় নাই ! এখানে পুরুষদের দেহে যে খাড়া রেখাটি তাহাদের গতির মধ্যে, রমণীদের গাত্রে ধরিয়া যে আঁকবাঁকা রেখা যাহা প্রথম দিকে ছিল। ক্রমে তাহা কেমন শ্লথ হইল, যখন এই প্রস্তাব আসিল, আমরা গান গাহিতে পারি। আত্মার শান্তির নিমিত্ত

প্রত্যেকেই যে কত চোরা রেখার ঘর তাহা জানা ছিল না। এই রেখা আপনি দেহ হইতে ধরিয়া খেলিয়া উঠিতেছে, এবং যে যাহার গাতে ঐ ঐ ভাঙন দর্শনে তন্দ্রা ছাড়া হইতেছিল। এই সকল রেখায় জড়তা থাকিলেও সমীহ ছিল, আজ সভ্যতার ধাঁচ ছিল—যখন সমতলতা যারপরনাই অস্বস্তিকর।

সকলেরই গায়েতে ঐ এলার্ম ধ্বনি কন্টকিত করে, এইক্ষণে অন্তকে গীত সুললিত রাখিতে সজাগ করে। দুই একজনের এই হস্ত দ্বারা সজাগ হইতেই সকলে অল্পবয়সী পুত্রের দিকে নেহারিল—অথচ গীত আছে।

অল্পবয়সী বালক এলার্ম শুনিতেই, একটু থতমত হইয়াছে এবং সে চঞ্চল, আশ্চর্য তাদৃশ অবস্থাতেও তাহার চোয়াল শক্ত, কেহ যেন তাহাদের বেয়াকুব বানাইবে এবং যাহা সে কিছুতেই দিবে না। সে তবে চক্ষুদ্বয় কচলাইতে গিয়া তখনই থমকিয়া একটু সচেতন হইল, এবং এ্যাটমাইজারটি সে হাতে লইতে চাহিল।

ইহাতেই এই বিদায়ের ছবিটি বড় বিষাদের হইয়া উঠিল।

এখনও শোনা যাইতেছিল, সেই ভদ্রলোকের মিস্‌টেরিয়াস বলার স্বর। এখান হইতে দেখা যাইবে, জনই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ মানুষ আর সকলের মাথারই হাড় করোটি এখনও তেমন পর্যায় আসে নাই যাহা রহস্য বিবিধ কিছুর আধার হইবে। সকলেই অন্তরা বড় ঈর্ষায় (!) উহার দিকে তাকাইতে আছিল। ঠিক যে সময় ঐ হাতকাটা সার্ট পরিহিত ব্যক্তি লম্বা পদক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দাপাইয়া চলিতে লাগিল। এ সিঁড়ি কাঠের—এ সিঁড়িতে অনেক ফুলচক্র—কাঠের হওয়ার দরুন বড় শব্দ হইতে আছিল।

মিস্‌টেরিয়াস।

এই কক্ষের সকলেই প্রায় একসঙ্গে বলিল, নিশ্চয় ভ্রান্ত।

ঈদৃশ মন্তব্যে যাঁহার স্বর বিশেষ শোনা গেল, কর্তব্য বেঁধে গলার খাদ হইতে ঘুরাইয়া বলিলেন, আঃ মদ। সবাই একি!

শ্রোতৃবর্গ এখন যে দরজা দিয়া ঐ ব্যক্তি যাইলেন, এবং সেই দিকে অকাইলেন, এই সুযোগে—যেহেতু ঐ ব্যক্তি নাই—সমস্বরে উচ্চারিত হইল, মিস্‌টেরিয়াস! যে এবং পরক্ষণেই ইহাদের দৃষ্টি অন্য দিকের দরজার প্রতি নিক্ষেপিত হয়, ঐ দিক পানে কেহ ছুটিয়া যায় ও এলার্ম বন্ধ হইল।

এখন একটি উর্দিপরা চাকরের, অতীব অসহায়, কান্দিতে আছে এমন যাহার, চেহারা প্রতীয়মান হইল। কক্ষস্থ যাহারা তাহারা এমৎভাবে ঐ লোকটিকে দেখে যাহাতে, ইহা ভুল নয়, ইহা পরিষ্কার যে তাহারা উহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল। ইহাদের ঠোঁট হইতে নিঃশব্দে ঝরিল, কি হইয়াছে (হিন্দিতে)।

ঐ লোক প্রতি জনের চোখের দিকে, একের পর এক, অবলোকনিল! অর্থাৎ উত্তলার কিছু নাই।

এই সাধারণ জবাব এখানে বড় ঘামের কারণ হইল, ইহারা নিজেদের বিরক্তি তথা রাগকে রুক্ষ হাস্যে মানাইতে আছে, যে এবং ইহা করিতে থাকিয়া একে অন্যের মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষিয়া বুঝিল যে সকলের ইচ্ছা যে আবার একবার, হায় এলার্মটা যদি বাজিয়া উঠে। আঃ তবে কি দারুণ হয় আমরা নির্ভাবনায় বলিয়া উঠিতে পারি, মিস্‌টেরিয়াস।

আঃ আঃ।

কিন্তু কেন যে বলিতে চাহে, কেন যে এই আসক্তি তাহা জিজ্ঞাসিত হইলে কেহই উত্তর দিতে পারিবে না, 'মিস্‌টেরিয়াস' শব্দটি যে বিরাট অনন্তর সহিত জুড়িয়া আছে। সেই বিরাটত্বের কখনও কি ইহারা ছোঁয়া পাইয়াছে; অহা যদি, তাহা হইলে আমাদের উত্তর মিলিত! হঠাৎ এলার্ম তাহাদের চেতনা দিলেও তাহারা ঐ চেতনা ধরিয়া আর আপন অভ্যন্তরে যাইতে প্রস্তুত নহে বা যাইতে যে হয় তাহা জানেই না। এবং এই সময় শোক সঙ্গীত ভেদিয়া নীচে হইতে ঐ মিস্‌টেরিয়াস কথাটা আসিল। সকলেই বেশ খানিকক্ষণ একাগ্র হওয়ত শুনিবার মধ্যে কেহ একজন কহিল, মফিসটোফিলিস।

মফিসটোফিলিস! এমত ভাবে বলা হইল, যে এতাবৎ তাঁহারা কোন

গথিক স্থাপত্যের অঙ্গীভূত মৃদু থামের শীর্ষকার আঙুরলতার ভিড় দেখিতেছিল, যাহা চুনে পাথরে করা, যাহার, পাথরের কণাগুলি বিশেষ স্পষ্ট— তথাপি ঈদৃশী বর্তমানতার অঙ্গ ধরিয়া যে প্রতাহিঁ খেলিয়া উঠিয়া মানুষের ছন্দ প্রীতিকে ঐ লতা সকল, ওতঃপ্রোত করিয়াছে তাহারে কোন ক্রমে ব্যাহত করে না, ইহাতে তাহারা আকৃষ্ট থাকিতে রহিয়া ঐ শব্দ মফিসটোফিলিস-এর দিকে নেহারিয়াছে ও যুগপৎ কোথায় যে আছে জানিতে প্রতির চোখগুলি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে ; এবং মৃতাকে দেখিল এবং শোকগীতে কান রাখিল যে এবং তাহারা অবশ্যই সুর করত বলিতেছিল : আঃ আমরা সমুদ্রের ওপরদিকে ভালবাসিয়াছি, আঃ আমাদের পদদ্বয় বিবিধভাবে ছড়িয়াছে, আঃ আমাদের ক্লান্তি ঐ স্থাপত্য সকল গঠিত হইল, তবে কি আমরা এক অপ্রাকৃতিক ক্লান্তির মধ্যে বাস করি।

এখনও এখানে মিস্‌টেরিয়াস কথাটি আসিতেছিল : একবার ইহা তৎশ্রবণে বিশ্বাস যাইবে যে, যে ঐ বলে নিশ্চয় সে শিশুপুত্রকে হারাইয়াছে, তৎক্ষণাৎ ধারণা হইবে উহা ভুল, কোন উপত্যকার রাখল—উপত্যকা এই নিমিত্ত যে, স্বর বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে—যে গোবৎস হারাইয়াছে. আবার চকিতেই বিবেচিত হইবা যে তাহা নয়, নির্ঘাত ঐ জন ঠকিয়াছে। এখানকার সকলে বেশ পরিষ্কার যে নিজেদের টালমাই (ব্যালেন্স) অবস্থায় আনিতে চাহিল. অর্থাৎ নিজেরা উহার সহিত একীভূত হইতে চাহে নাই— অথচ ইহারা মিস্‌টেরিয়াস বলিতে উদ্‌গ্রীব হয়, এবং মফিসটোফিলিসও বলিয়াছে।

সে আলাদা। আমরা এখানেই থাকি ঐ তো শোক সঙ্গীত হইতেছে। কিন্তু ধূপ বরফ শোক সঙ্গীতের বিবিধ কথা, ধূপ পুত্র পাপড়ি চিঠি, এলার্ম হঠাৎ ঐ করুণ কণ্ঠস্বরে মিলিবে ইহা কাহারও বুদ্ধিতে আসে নাই। সকলেরই বিবেকে এই বৃত্তি আসিল, এখন আমাদের দণ্ডায়মান হওয়া দরকার। যেমন আমরা শোর শেষে গড সেভ দি কিঙে দাঁড়াই। এবারও বলিল আমরা আলাদা. সে মফিসটোফিলিস।

(আমাদের একটি নাটক আছে যাহাতে মফিসটোফিলিস! ফাউস্টের নিকট হইতে তাহার সম্মোহ ভুলিয়া পুনঃতাহার আত্মা ফিরৎ দিতে চাহিতেছে, ইহার সহিত কোন যোগ নাই, শুধু নামেই)

ইতিমধ্যে যাহারা শোক সঙ্গীত গাহিতে আছেন, তাহাদের মধ্যে একজনের চোখে অশ্রুধারা। তিনি হঠাৎ চমৎকৃত হওয়ত গীত ছাড়িয়া স্বীয় অশ্রুজ

খুঁজিলেন কখন যে তাহার লেশদার রেশম রুমাল হস্তচ্যুত হইল তাহা খেয়াল নাই। সৌখীন হাত ব্যাগ স্খলিত হইল, তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না, দেহের ভাঙনে ঘোষিত হইল; এ দেহ এক দশাসাই torso (ধড়, ভাস্কর্যশব্দ) নহে; গীত ছাড়িয়া তিনি একি অভিব্যক্তি করিলেন!

আঃ ডাক্তার দেখ তোমরা বলিয়াছিলে আমার চোখে কখনও জল পড়িবে না আমার চোখের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা স্নায়ু শুকাইয়া গিয়াছে তাই আমি কোন সি অফে আপনার পরিচয় দিতে পারি নাই!

মৃতা হইতে এলার্ম তৎপরে যাহা তাহা আমার তন্ত্রী সকলে আঘাত করিয়াছে—আঃ আমি মৃত্যু উপলব্ধি করিলাম। সে মরিয়াছে!

অা আমরাও! আঃ এই সব উদ্ভাবিত ক্রিয়াকলাপ। আঃ এলার্ম।

এতাদৃশ আশ্চর্যের মধ্যে বেশ অনেকক্ষণ গিয়াছে তখনও দেখা যায় ঐ রমণীর অশ্রু ধারার ছাড় নাই! রমণী তখন মৃতার কক্ষ ত্যজিয়া এই পার্শ্ব কক্ষে! পুরুষের মধ্যে দু একজন ডাক্তার ছিলেন তাহারা পরামর্শ করিলেন যে রমণীকে এখনই পরীক্ষা করা দরকার!

না আমি আমার বাড়ি যাইব।

শেষে যদি কিছু।

আমার বুদ্ধিও বলে।

তাহা হইলে।

আমার প্রয়োজন আছে। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজেকে দেখিব। আমার আয়নাখানি দেখিয়াছ, ত। আজ আমার বড় দিন। চল আমার সহিত।

যখন তাহারা নীচে নামিলেন তখন তাহার দেখিলেন, সেই হাতকাটা সার্ট পরিহিত হাতে রৌপ নির্মিত ফ্লাস্ক। (মদ পাত্র)

আঃ দেখ আমাকে। মিঃ·· আমি মৃতাকে দেখিয়া কাঁদিয়াছি। ও আমি আমার দেহের মধ্য আর থাকিতে পারিতেছি না—আমার দেহ আরও দশাসই হওয়া উচিত ছিল।

মিস্‌টেরিয়াস।

চল আমার বাড়ি আমার গৃহে দারুণ মদ্য আছে—সেরা মদ্য—তোকে

শাম্পেন হইতে বুরগন বিবিধ ওয়াইন। চল, আমি বাড়ি যাইব। আমি ছোটাছুটি করিব—দেখ আমার চোখে জল। আঃ কি দারুণ ব্যাপার হইবে।

মিস্টেরিয়াস।

এবং তিনি এ সকলেরে লইয়া গৃহে আসিলেন।

এবং তাহার চোখের জলে গাত্র বস্ত্র আর্দ্র হইল। ইহাতে গর্বিত হইলেন। কহিলেন, আমার চোখের জলে আমার বুক ভিজিয়া যাক। এই বস্ত্রখণ্ড আমি সুভেনীর (স্মরক) রাখিব।

এবং ইহার পর বড় অদ্ভুত কাণ্ড সংগঠিত হইল।

সকলেই সমস্বরে উচ্চারিল, আঃ মিস্টেরিয়াস।

রোজনামা

॥ ১ ॥

"বল ভালবাসা, দেখা হবে

কোন সে নদীর ধার ?"

এই নিত্য দিব্য শব্দনিচয়ের পিছনে কোন বেলাবতী রাজকন্যা নাই, ইতঃমধ্যে দুর্গম কানন নাই ; ঝঞ্ঝা নাই ; কেন না দেহ নাই। সুদূর প্রসারী প্রান্তর আছে, আরও দূরে দিগন্ত লেখা। এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে আবেগ যখন আপনার প্রতিধ্বনি শুনিয়া অত্যধিক ব্যাকুল হইয়াছে এখানে তাহারই প্রশ্বাস !

অথচ আদিমতা সন্ধ্যা দেখিল, মৃত্যুর জন্য যখন মানুষ প্রথম অশ্রু বর্ষণ করিল, আপনার দীর্ঘশ্বাস শ্রবণে চকিতে পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে, কোন উদ্ধত পর্বত শিখরে দাঁড়াইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, দেহ-ত্যাগের পর 'দেহ' নক্ষত্র হইয়া যায় ?

তখনও 'বল ভালবাসা' বলিয়া প্রশ্ন করিতে সক্ষম হয় নাই।

ইহার পর বহু কাল গিয়াছে, যখন পথশ্রমজনিত পিপাসায় আমি অবসন্ন। উদার আকাশের গ্রহনক্ষত্রের ইশারায় অর্থহীন, কেন না, আর পথ নাই ; আর আমার দেহই যখন একটি বস্তু, অমোঘ, নির্ঘাত বাতুল ঠিকানা মাত্র, তখনই ভালবাসার সহিত সাক্ষাতের একান্ত সময়। বস্তুত এই সামান্য বাসনা আমাদের প্রত্যেককেই, স্নায়বিক প্রত্যেককেই কণ্টকিত করিয়াছে।

নিদ্রাহীন মধ্যরাতে শুনিয়াছি, কেহ যেন ভূতচালিত কণ্ঠস্বরে বলিয়াছে, 'পুনরায় অন্ধকার দিব ; সে স্রোতস্বিনী অন্ধকারে তুমি নিশ্চিন্তে অবগাহন করিতে পারিবে, তুমি শান্তি পাইবে।' আমি সমাচার শুনিয়াছি মাত্র, কারণ এখন আমি এতদিন পর পিঙ্গলার মত জাগিয়াছি।

বৈশেষিকদর্শন—পিঙ্গলা আপনার প্রিয়াস্পদের জন্য, রাত্র জাগরণের পর ঘুমাইয়াছিল, যেমন বালিকা বধূ একটি রাখিয়া আর চুড়িসকল চূর্ণ করে, কেন না চুড়ির শব্দ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল।

যেখানে জাগিয়া আছি, তাহারই অনতিদূরে কিছু কিছু আলোর বর্ত-

মানতা, মধ্যে মধ্যে কখন ক্রম বিলীয়মান কভুবা ঘন নিপট কুয়াসা তথাপি আলো বর্তিত, অগ্নি-শিখা প্রতীয়মান। দুঃসহ 'প্যয়েন' গীত যাহারা গাহিতে গাহিতে দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল তাহারাই আগুন জ্বালিয়াছে।

এ অগ্নি নচিকেতাগ্নি নহে।

অবশ্য এ অগ্নি লাভের জন্যই নচিকেতা যম সকাশে গমন করেন নাই; মানুষ মাত্রই শস্যের ন্যায় জীর্ণ, একথা উপলব্ধি করত আপন পিতাকে নচিকেতা সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করে যে তাহাকে যমকে অর্পণ করা হউক। নচিকেতা যমকে বলেন, হে মৃত্যো। আপনি এইরূপ গুণ সম্পন্ন স্বর্গলোক লাভের হেতুভূত অগ্নি বিষয়ক তত্ত্ব বিদিত আছেন। অতএব আমি শ্রদ্ধাযুক্ত ও স্বর্গকামী, মৎ সকাশে সেই অগ্নির কথা বলুন। আপনি ঐই অগ্নির বিষয় কহিলে স্বর্গার্থী যজমানগণ সেই অগ্নি সঞ্চয়ন পূর্বক স্বর্গলোক লাভ করত দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অতএব অগ্নি বিষয়ক তত্ত্ববিজ্ঞানই আমার দ্বিতীয় বর প্রার্থনা।

যম কহিলেন, "স্বর্গপ্রদ এই অগ্নিই তোমার নামে প্রথিত হইবেন অর্থাৎ যে অগ্নি সঞ্চয়ন দ্বারা স্বর্গসাধন হয় তাহার নাম নচিকেতাগ্নি হইবে।"

যাহারা আগুন জ্বালিয়াছে তাহারা বীভৎস প্রান্তর হইতে সমিধ সংগ্রহ করিয়াছে, তখন কাহারও মুখে 'প্যয়েন' গুঞ্জন ধ্বনি ছিল, কোথাও অজস্র পরিত্যক্ত তীরসমূহ, কোথাও ঈজিপ্তীয়দের বেতের ঢাল, অন্যত্রে কাঠের ঢাল সকল, বিপক্ষের পলাতক সৈন্যসকল। রাজার সৈন্য সকল। গ্রীকদের আগমনে ফেলিয়া উধাও, হায়! সারথিশূন্য রথগুলি পড়িয়া আছে ফলে সমিধের অভাব নাই। ইহার আগুন জ্বলিতেছে, তাহারা মাংস ঝলসাইতেছে, এই জড় আলোকে তাহাদের খাদ্য প্রস্তুত হয়।

উজ্জয়িনীতে একদা বহু পূর্বে টিণ্ডাকরাল নামে এক প্রসিদ্ধ জুয়াড়ী ছিল। প্রতিদিনই সে হারিত, বিজয়ী জুয়াড়ীরা তাহাকে দয়া পরবশ হইয়া সায়ংকালে একশত কড়ি মাত্র দিত। টিণ্ডাকরাল ঐ কড়ি সকল দিয়া কিছু গোধূমচূর্ণ কিনিত। সেই গোধূমচূর্ণ একটি ভাঙা মাটির পাত্রে কোনরূপে গড়িয়া শ্মশানে যেখানে কাহারও প্রিয়জন নিশ্চয়ই—কেননা মানুষ প্রিয়াস্পদ—হয়ত পুড়িতেছে চিতার আগুনে গোধূমচূর্ণ পিষ্টকগুলি সেঁকিত, এবং মহাকালের মন্দিরের প্রদীপ হইতে ঘৃত চুরি করিয়া মাখাইয়া খাইত।

যে অগ্নি আলেয়ার মত। কিয়দংশে মন্দিরস্থিত পবিত্র হোমাগ্নির ন্যায়

যে অগ্নিকে অতীব স্নেহে বর্ষীয়সী আনথিনীয়া যাহারা আর পুত্র সম্ভবা নহেন—তাহারা লালন করিতেন, এ অগ্নি কতবার না বিধ্বস্ত হইয়াছে। একদা যখন মিডস ডেলফীর মন্দির অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করে। একদা, অন্যস্থানে রোম প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সমুজ্জ্বল অগ্নি মিথাম্রিডেটিক যুদ্ধে, অন্যবার পুনরায় তাহাদের গৃহযুদ্ধে, শুধু মাত্র যে বিনষ্ট হয় এমত নহে, উঁহার বেদী পর্যন্ত ধ্বংস হয়।

হায় সে অগ্নি জড় উদ্ভূত নয়।

এই দিব্য অগ্নি রোমনেরা বিশ্বাস করিত এই মর্ত জগত হইতে লাভ করা যায় না. ইহা শুদ্ধ, ইহা সুন্দর। যে হেতু, এই অগ্নি মানুষের চেতনায় আছে। "ইনি বিরাট জগতের আশ্রয় হেতু ইনি বিদ্বান ব্যক্তির হৃদয়রূপ কন্দরে (গুহায়াম) নিবিষ্ট আছেন।"

ইহা যন্ত্র-সম্ভব, ফলে. The kindled with concave vessels of brass, formed by the conic section of a rectangle, whose lines in circumference meet in one central point—
এইরূপ যন্ত্রটি ভাস্বর সূর্যের সম্মুখে রাখা উষ্ণতায় অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। এই নিমিত্ত যাহারা সর্বপাপ বিমুক্ত ব্রণবিরহিত চরিত্র, নিষ্কলঙ্ক প্রকৃতির দ্বারাই সম্ভব (or else because virginity like fire, is barren and unfruitful) ফলে বহু কুমারীজন সে অগ্নি রক্ষা করিতে আপন জীবন যৌবনকে উৎসর্গ করিল।

'ভেস্টাল' কুমারীরাই হোমাগ্নি রক্ষা করিত। ক্রমাগত অগ্নির সাহচর্য লাভ করিত। যদি কখন কপাল দোষে, অগ্নি সঞ্চরিত উষ্ণতায়, অন্য আর উষ্ণতা রোম সকলকে হরষিত করে, আর যে, দীর্ঘায়ত রোমকূপ শ্বাস গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হয়, তখনই তাহার অতীতের অন্ধকার নিচয় সম্মুখের পথ রোধ করে।

বীজহীন নিষ্পাপ কুমারী জীবন, যখন কলঙ্ক, যাহা হোমাগ্নিকে বিদ্রূপ—জীবনকে অবসন্ন করিয়াছে—তাহার অবসান 'কলিন গেট'। এই কলিন গেটে সেই জীবনের জীবন্ত সমাধি। মন্দির হইতে বহুদূরে একটি কূপের নিচে একপার্শে ছোট কক্ষ। এই কক্ষে, রম্য সুঠাম একটি শয্যা রচিত, যে শুভ্রতা অর্থাৎ যে কোন এক ইদানীং কালের শিল্পী মহা ইতস্ততায় ছাড়িয়া গিয়াছেন, বহু পূর্বে কোন এক কবি ছাড়িয়া গিয়াছেন। এই শয্যার নিকট

একটি প্রদীপ—সমস্ত প্রতীকত্ব লইয়া যাহার শিখা স্থির—নিকটে কিছু আহারের সামগ্রী। বিছানা, আলো আর আহার ; সভ্যতার প্রাপ্তি যোগ।

ছোট শোভাযাত্রা চলিয়াছে, মধ্যে একটি ডুলি। ডুলি বাহকরা ধীরে ধীরে চলিতেছে। এই ডুলিতে একজন ভেস্টাল কুমারীকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, যে কুমারী আত্মসত্যকে অপমান করিয়াছে। যাহার পতন হইয়াছে। এই পতিতাকে কেহ যাহাতে দেখিতে না পায় তাহার জন্য তাহার আপাদমস্তক আবৃত, তাহার ক্রন্দন যাহাতে কেহ শুনিতে না পায় তাহার জন্য ডুলি সুরক্ষিত। ডুলির সঙ্গে প্রধান পুরোহিত এবং আরও অনেকে আছেন। ডুলি এখন পবিত্র নগরীর ফোরামের মধ্যবর্তী পথে।

পথচারীজন অবনত মস্তকে, এহেন মর্মান্তিক শোভাযাত্রা দেখে। হয়ত দুঃখিত হয় কিন্তু শোক করে না কেন না এ এই ভেস্টাল কুমারী শ্রদ্ধাকে অবমাননা এবং 'ভেস্টার' মন্দিরকে যে মন্দির নুমা নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাহার সাদৃশ্য গোলাকার (orbicular)—অবশ্য পৃথিবীকে কল্পনা করিয়া ইহা গঠিত নয়, ইহা সারা বিশ্ব সংসারের নিরহঙ্কার পৌত্তলিক কল্পনা ; যাহার মধ্যে পীথাগোরিওরা অগ্নির অস্তিত্ব, তাহার উপাদানকে স্মরণ করিয়াছে—সেই মন্দিরকে অপবিত্র করিয়াছে।

ডুলি নির্ধারিত স্থানে আসিয়া থামিল ; পুরোহিত ঊর্ধ্বলোকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিলেন, ডুলির আবরণ উন্মোচন করা হইল। ভেস্টালকুমারী কূপের সিঁড়ি তুলিয়া মৃত্তিকাররাশি গহ্বর পরিপূর্ণ করিল···

Pythagorean concept of silence দেখা দিল।

অনেক আলোর কথা আমাদের এই বিনিদ্রিত রজনী মনে হইয়াছে। প্রশ্ন সকল ক্ষেত্রেই দারুণ অন্ধকার লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে—আলোতে সে অন্ধকার পরিদৃশ্যমান হয়।

'ভালবাসা' বলিতে কি .য ভাবা উচিত তাহা কখনও ভাবি নাই। Morte dearthur এ আছে, স্যর প্যালমস যখন ইভায়ডের বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া মর্মাহত হন তখন তিনি আর আপনাকে সহ্য করিতে সক্ষম হইলেন না, তাঁহার সেবকদের কহিলেন, 'আমি আর শয্যা ছাড়িয়া উঠিব না, আমার মৃত্যুর পর আমার .দহ হইতে হৃৎপিণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া দুইটি রূপার পাত্রের মধ্যে রাখিয়া তাহাকে দিবে।'

স্যর প্যালমসের প্রেম নিশ্চয়ই র‍্যামান্টিকদের শেষ।

নিয়ে আমরা সকলে বর্তমানবৎ। হয়ত আমাদের ছোট প্রশ্নের বাক্যনিচয় শুধুমাত্র প্রতিধ্বনিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিবে, প্রতিধ্বনিই কি তাহার একমাত্র উত্তর।...

It strikes an awe.
And terror on my aching
Sight ; the tombs
And monumental caves
Of death lo k cold.
And shoot a chilness to
my trembling heart.
Give me thy hand : and
let me hear thy voice.
Nay, quickly speak to me.
and let me hear.
My voice—my own offrights me
with its eches.
Congreve—Mourning birds.

আমার স্বরের প্রতিধ্বনি আমাকেই আতঙ্কিত করে। চরাচরে অতিকায় শীতলতা মূহ্যমান; স্তব্ধতার কাঁধে হাত দিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছি। এবং প্রতিধ্বনি অত্যন্ত নির্মম হইয়া দেখা দিবে, বৈজ্ঞানিক কৌশল যাহার একমাত্র পরিণাম।

[ম্যাকবেথের অম্বয় অছে Macbeth's first words echo the last words of the witches" প্রিয়রসন]

এই অগণিত একের সূক্ষ্মতার মধ্যে, ক্রমবর্ধমান প্রতীক্ষার মধ্যে কখন বা দুরন্ত ভাঙিয়া আমাদের স্মৃতি নিপট হইয়া উঠিবে·· একটি আলোড়ন শোনা যায় "Mon ame est triste Jusqu'a la' morte" ইহা বন্ধুর কণ্ঠস্বর!

"আমার আত্মা মৃত্যু পর্যন্ত মনমরা"—এই গির্জা পিছনের দেওয়ালের রঙিন কাঁচের চিত্র বিচিত্র কি অসম্ভব রঙ লাভ করিয়া প্রকৃতিজনকে চমৎকৃত করিত। তখন কম্পমান ক্রমবিলীয়মান অর্গানের পর্দায় ধ্যান স্তিমিত আওয়াজ ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছে। উপরে সৌরলোক মৃত্যু, নিম্নে দামাল সমুদ্র। এ গাম্ভীর্য শ্রবণে, মানুষে অন্ধকারের অশরীরী দেহে সস্নেহে হাত দিতে চাহে। তৎকালীন স্বর একে অন্যের সহিত আলাপের কালে দেখা দিয়া অনৈসর্গিক মরজগৎ সৃষ্টি করে, বৃক্ষের পত্র সকল পাখা ঝাড়া দেয়। র‍্যমান্টিক ভালবাসা, ধূলিধূসরিত ভূষণ দিবা রমণীর ন্যায় মধ্য আকাশে উদ্ভাসিত। একদা সিভ্যলরী ছিল, কিন্তু সেই সিভ্যলরীর মধ্যে কোন চেহারা ছিল না। এলিনর দ্যাকিতেন ম্যারি দ শ্যাম্পঞ অনুপ্রাণিত হইল। এক অপূর্ব চেহারা আসিল। র‍্যমান্টিক ল্যভ ইত্যাদির আরও অনেক পুরুষালি মনোভাব।

বেতালে আছে, মন্দবতীর চিতাভস্মকে—একজন ব্রাহ্মণকুমার অযাচিতা-বলম্বী হইয়া—শয্যাস্থানীয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। যখন মৃত-সঞ্জীবনী পুঁথি আসিল মন্দাবতীর ভস্মরাশির উপর এক মুষ্টি মন্ত্রঃপূত ধূলি নিক্ষিপ্ত হইল, মন্দাবতী উঠিয়া বসিলেন। তিনজনের মধ্যে কে তাহার স্বামী হইবার যোগ্য এই মীমাংসায় রাজা বিক্রমাদিত্য বলিলেন যে তাহার ভস্মরাশি আলিঙ্গন করত এই শ্মশানেই দিবারাত্র—মন্দাবতীর তপস্যা রত ছিল সেই তাহার স্বামী হইতে পারে; কারণ প্রগাঢ় অনুরাগের অনুরূপ কার্যই সে করিয়াছে।

র‍্যমান্টিক ভালবাসায় মথিত হইয়া স্যর প্যলয়স তাঁহার হৃৎপিণ্ড নিবেদন আশা করেন। কেন সুন্দরী ইতারদা তাঁহাকে চাহে নাই। তাহাকে অনেক-রূপে অপমান করে, স্যর প্যলয়স হাসিমুখে তাহা সহ্য করেন।

এমন আছে অন্যত্রে—তখন, রাখালরা সকলেই গায়ককে তাহার প্রেমের গান গাহিতে অনুনয় করিল, গাহিতে গাহিতে একদা সে রূঢ় সত্য প্রকাশ করিল।

When I spoke to the maid
of Berocal .
Teresa, of thy worth and
thy shape
'You think' she said "You

are in a angle's thrall
And, yet for idol you
adore ape"

অবশ্য বেরকাল কন্যার এই উত্তরের পর অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। সহসা এমত সময় একটি অল্প বয়সী যুবক আসিয়া দুঃসংবাদ দিল। "আমাদের ক্রাইসোসতোম, আরে যে বিখ্যাত ছাত্র এবং রাখাল ছিল, সে মারা গেছে।"

সকলেই বিস্মিত এ হেন খবরে। 'সকলের ধারণা ক্রাইসোসতোম নিষ্ঠুর হৃদয়হীনা মারসেলার জন্য তার ভালবাসা না পেয়ে মরেছে। মারসেলা খুব বড় লোকের মেয়ে এবং সে রাখালি হয়ে এ তল্লাটে ঘুরে ঘুরে বেড়াত।"

"মারসেলার জন্য মরেছে?" একজন প্রশ্ন করিল।

"হ্যাঁ হে, মারসেলার জন্য," বলিয়া পুনরায় কহিল, "সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সে ক্রাইসোসতোম উইল করে শেষ ইচ্ছে জানিয়ে গেছে···তাকে মুরদের মত মাঠেই কবর দেওয়া হবে—কবর দেওয়া হবে একটা ছোট পাহাড় তলে, যেখানে ঝরণা আছে, ঠিক সেখানেই একটি কর্ক গাছে ছায়া···লোকে তার মুখ থেকে শুনেছে, এ জায়গায় ক্রাইসোসতোম সর্ব প্রথম ···মারসেলাকে দেখে। এ ছাড়াও আরও অনেক কিছু সে বলে গেছে···কিন্তু সে সব কথা আমাদের পাদরী মশাই বলেছেন রাখা হবে না···সেগুলো বড় জঙ্গলী জঙ্গলী···কিন্তু তার বন্ধু আমব্রোজিও সেও দারুণ ছাত্র···সে ক্রাইসোসতোমের সঙ্গে রাখাল বেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াত।···সে বলেছে তার শেষ ইচ্ছা পালন করতেই হবে···এতে সারা গ্রাম হাসিতে ফেটে পড়েছে—কিন্তু তারা জানে ক্রাইসোসতোম যা চেয়েছে তা হবেই—"তাকে দারুণ ভাবে কবর দেওয়া হবে—আমি যাবই"

*　　　*　　　*

ডন কুইক্সট পিটারকে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপারটা কি ঐ মৃতই বা কে আর সেই রাখাল মেয়েটিই বা কে।

পিটার কহিল, মৃত যুবক—সালমানাকে অনেক দিন ধরিয়া বিদ্যার্জন করে। সে সত্যই অল্প বয়সে অত্যন্ত খ্যাতনামা হইয়াছিল। ছেলেটি সালমানাক থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরই সে স্কলারদের যে ঢিলে আঙরাখা হয় তা ফেলে দিয়ে রাখালের মত পোষাক পরিচ্ছদ পরলে মানে সাজগোজ করলে—এবং তার বন্ধু আমব্রোজিও তার মতই রাখালের বেশ

ধারণ করলে। বলতে ভুলে গেছি, আমাদের ক্রাইসোসতোম দারুণ পদ্য লিখতে পারত, সে ক্রিসমাস ইভের জন্য ক্যারল লিখত, সেগুলো গ্রামের ছেলেরা গাইত। করপাস ক্রিস্টির জন্যে নাটক লিখত, সেগুলো ছেলেরা অভিনয় করত। সকলেই স্বীকার করত তার লেখার মত লেখা হয় না…! ক্রাইসোসতোম আর তার বন্ধু আমব্রোজিও দুজনেই হঠাৎ একদিন রাখালের বেশ নিল। এতে সকলেই খুব অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এর মানেটা কি…? কেন হঠাৎ এই পরিবর্তন!…অনেক দিন পরে আদত কথাটা জানা গেল ‥যে মারসেলার জন্য‥। মারসেলা মাঠে মাঠে রাখালীয়া বেশে ঘুরে বেড়াত… ক্রাইসোসতোম এই রাখালি মারসেলার জন্যে রাখাল হল।

॥ ৩ ॥

ডন কুইজট পিটারের কাহিনী শ্রবণে যারপরনাই হতবাক। আপনার রক্তের সহিত এখানে এই সূত্রে কোন বাক্যালাপ করিবার নাই, সেখানের আলোড়িত, কর্মব্যস্ত তরঙ্গ সকল শান্ত, তরঙ্গ সকল বোধহীন।

কুইজট সম্ভবতঃ এই প্রথম প্রশান্তি দেখিলেন, যে প্রশান্তি প্যান দেবতার (আরক্যাডিয়ান দেবতা) সিরিঙ্গজ-বাঁশিতে থাকে, যেমন সে স্বর বনে বনান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া ফেরে; কুইজট অগণন তারকারাজির প্রতি অন্তবার রুক্ষ বনস্পতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

হয়ত মানসচক্ষে দেখিলেন, গোলাপের প্রতি দ্রুত পদে সকল সৌন্দর্য ছুটিতেছে অথচ তাহা ঘর্মাক্ত নহে, অথচ পরিশ্রান্ত নহে।

First beautie crept into a rose : (হারাবার্ট জর্জেস)

ডন কুইজট, 'আঃ নাইট অব দি স্যাড কাউন্টেনান্স। তিনি মহা আবেগে কহিলেন, 'তারপর'…

মারসেলা, অপূর্ব সুন্দরী ছিল। অল্প বয়সে তার পিতামাতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই মারসেলা বালিকা, অল্পবয়সী রাখালিয়া বেশে সবুজ প্রান্তরে মাঠে আপনার নিরীহ পশুশাবকাদিকে গোচারণে লইয়া যাইত।

মারসেলার সৌন্দর্য কথা অনেককে মন্ত্রমুগ্ধ করিল। মারসেলা প্রত্যূষের ফোয়ারা যেমত, নিশ্চয় কম্পিত, নিশ্চয় রঙ্গময়ী, অথচ স্থাবর অনেকেই তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল; কিন্তু রূপসী মারসেলা কহিল, 'আমি এখনও মনস্থির করি নাই, বিবাহের দায়িত্ব লইবার মত তাহার সামর্থ্য নাই' এবং

রাখালিয়া বেশে অন্যান্য রাখালির সহিত সেও বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল।

হায় অন্তরতম দীর্ঘশ্বাস।

ধনী পুত্ররা রাখালিয়া বেশে সতত ভ্রমণ করিত; ইহাদের মধ্যে ক্রাইসোসতোম একজন। ক্রাইসোসতোম লোকে বলে, মারসেলাকে ভাল-বাসিত না, তাহাকে পূজা করিত।

মারসেলা এই সকল অযাচিতাবলম্বী রাখাল যুবকদের সহিত সাধারণ-ভাবে মিশিত, তাহাদের সহিত আলোচনা করিত, কিন্তু কেহ যদি তাহার পাণিপীড়ন প্রার্থনা করিত তাহা হইলে ঝটিতি মারসেলা তাহা প্রত্যাখান করিত ইত্যাকার ব্যবহারের ফলে এই অঞ্চলে অত্যধিক ক্ষতি সাধন হয়। প্লেগ রোগও এইরূপ ক্ষতি কখন করিতে পারে নাই।

মহাশয় আপনি যদি এখানে কিছুদিন অবস্থান করেন তাহা হইলে অহরহ এক অদ্ভুত প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবেন। এই প্রতিধ্বনি শুধু পীড়িত আর্ত ভগ্নহৃদয় প্রেমিকদিগের মর্মান্তিক চীৎকার প্রতিধ্বনি, উপত্যকা বিদীর্ণ প্রায়।

এখান হইতে কিয়ৎ পরিমাণ দূরে অনেকগুলি বীচ বৃক্ষ আছে, যাহার গাত্রে এই প্রেমিকগণ মারসেলার নাম উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কোথাও মারসেলার প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকেরা অতীব চাতুর্যের সহকারে 'মুকুট' উৎকীর্ণ করিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, সে সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ মুকুট পাইবার যোগ্য।

সেই বৃক্ষ সকলের তলে দেখা যাইবে কোথাও একজন প্রেমিক রাখাল, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, আবার কোথাও অন্যজন আপনার বক্ষে করাঘাত করিতেছে। হায় হায় রবে আকাশ বাতাস রক্তিম। দূর হইতে আপনি উহাদের প্রেমের রুক্ষ ভাঙা সঙ্গীত শুনিতে পাইবেন।

এমন যুবক অবশ্যই আছে যাহাদের অশ্রুসিক্ত চক্ষুদ্বয় সারা রাত্রি নিমীলিত হয় না, সকালের সূর্যে দেখা যায় সে উদাস হইয়া আছে। এমনও আছে, অত্যুগ্র গরমে বালির উপর শুইয়া ক্রমাগত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

এই সকল ভগ্নহৃদয় যুবকবৃন্দের মধ্যে মারসেলা নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করিয়া ফিরে। তার মনে এতটুকু রেখাপাত করে না। আমরা ইতরজন, শুধুমাত্র অপেক্ষা করিয়া আছি কে মারসেলার দম্ভ চূর্ণ করিবে তাহা দেখিব। চলুন আগামীকল্য সেই মন্দভাগ্য ক্রাইসোসতোমের কবর দেওয়া দেখিতে যাইব।

ডন কুইজট কহিলেন, "নিশ্চয়ই···তোমাকে অনেক ধন্যবাদ কারণ এইরূপ একটি অভূতপূর্ব ঘটনা শুনাইয়া যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছ।

মহাশয় আপনাকে ত আমি সব কথা না জানার দরুন বলিতে পারিলাম না। কল্য নিশ্চয়ই পথে অনেক রাখালের সহিত দেখা হইবে যাহারা আমাদের আরও রোমাঞ্চকর ঘটনা সকল বলিবে।

এহেন আখ্যায়িকা শ্রবণে ডন কুইজটের মন উতলা হইল। উপরে অথৈ আকাশ নিম্নে তিনি, এই ব্যবধানের মধ্যে একজন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার নাম জালসিনা।

*　　　　*　　　　*

সকালের আলোয় পৃথিবী আপনার বিচিত্র বর্ণে দেখা দিয়াছে।

খানিক পথ তাহারা অতিক্রম করিবার পর, তাহারা হতবাক। সম্মুখে একটি ছোট শোভাযাত্রা আসিতেছে। সকালের আলোক তাহাদের মুখমণ্ডলে আছে, এখনও সেখানে রাত্র রহিয়াছে। এই শোভাশাত্রায় জনগণ সংখ্যায় ছয়জন মাত্র, ইহারা সকলেই রাখাল।

এই রাখালগণের সাজ-পোষাক বিস্ময়কর, পরনে কৃষ্ণজিন চর্ম, মস্তকে সিপ্র মাল্য পরিশোভিত, হস্তে পাচন এই শোভাযাত্রার পশ্চাতে দুইজন অশ্বারোহী : তাহারা, দেখিলেই মনে হয় ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। ইহাদের সহিত পদব্রজে তিনজন পরিচারক বর্তমান।

দুইদল নম্রভাবে দুই দলকে অভিবাদন করত যাত্রা সম্পর্কে প্রশ্ন করিল। দেখা গেল দুই দলই কবর দেওয়া দেখিতে যাইতেছে।

*　　　　*　　　　*

ইতিমধ্যে দেখা গেল, দূরে দুইটি বিরাট পর্বতের মধ্যবর্তী পথে প্রায় বিশজন রাখাল যুবক, যাহাদের পরনে কৃষ্ণজিন চর্ম, মস্তকে সিপ্র মাল্য ছিল, কাহারও মস্তকে ইউ মাল্য, উহাদের মধ্যে ছয়জন একটি কফন বহন করিয়া আনিতেছে। এই কফন বহুবিধ পুষ্পমাল্যে ভূষিত।

এই দৃশ্য দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে একজন রাখাল কহিল, 'নিশ্চিত উহারা ক্রাইসোসতোমের দেহ আনিতেছে।'

শবযাত্রীরা কফন রাখিয়া যখন কবর খনন করিতে শুরু করিয়াছে, তখন ডন কুইজট সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন—কেননা ডালা ছিল না, মৃত সম্পূর্ণ-ভাবে রাখালের বেশে ভূষিত। বয়ঃক্রম তিরিশ হইবে বড়জোর।

যুবককে সত্যিই খুব ভাল দেখিতে ছিল। দেখিলেই বুঝা যায় তাহার জীবনও খুব সুন্দর ছিল। এই দেহের পাশে কফনের মধ্যে, সারি সারি

গ্রন্থরাজি, এবং বহু মোহরকৃত, বহু খোলা পত্রগুচ্ছও ছিল। যাহারা সকলে
এই স্থানে উপস্থিত, যথা দর্শক, কবরপ্রস্তুতকারক ইত্যাদি, সকলেই এক অদ্ভুত
মৌন অবলম্বন করিয়াছিল।

ইতিমধ্যে একজন এই অশরীরী স্তব্ধতা ভঙ্গকরত কহিল, 'আমব্রোজিও
দেখিও, এই স্থানই ত নির্দিষ্ট স্থান।'

হাঁ এই সেই স্থান। এই সেই ভয়ঙ্কর স্থান যেখানে আমার বন্ধু তাহার
প্রথম প্রেম মারসেলাকে করে, আর হায়! নিষ্ঠুর মারসেলা সেই প্রেম প্রত্যা-
খ্যান করে। যাহার ফলে আমার প্রাণপ্রিয়বন্ধু মৃত্যু বরণ করেন···

এবং ডন কুইক্সট ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমব্রোজিও বলিতে
লাগিল, মহাশয়,

॥ ৪ ॥

"ক্রাইসোসতোম ভালবাসিয়াছিল, এবং প্রতিদানে ঘৃণা লাভ করিয়াছিল!···
সে পাথরকে দ্রবীভূত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। ক্রাইসোসতোম হাওয়ার
পিছনে ছুটিয়াছিল, সে মরুভূমিতে রোদন করিয়াছিল। একটি রাখালিয়া যে
তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে মানবজাতির মধ্যে অমর করিতে চাহিয়াছিল—
মহাশয় যে কাগজগুলি আপনি দেখিতেছেন সেগুলি আমার কথার সাক্ষ্য
দিবে, অবশ্য ঐগুলি আপনি পড়িতে পারিবেন না। কারণ, তাহার নির্দেশ
মত কাগজগুলি পুড়াইয়া দিতে হইবে।···"

এ বাক্যে ভিভালদো কহিল, "ইহা উচিত নহে, তাহার লেখা বিস্মৃতির
অতলে ডুবিতে দেওয়া উচিত হইবে না···মারসেলার নিষ্ঠুর জীবন মানুষের
কাছে চিরতরে একটি উদাহরণ হইয়া থাক···আমব্রোজিও, আমাকে উহার মধ্য
হইতে কয়েকটি দাও।"

আমব্রোজিওর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া কয়েকটি কাগজ সে টানিয়া
লইল। তাহার মধ্যে একটির নাম 'হতাশার সঙ্গীত'। আমব্রোজিও কহিল,
ক্রাইসোসতোমের ইহা শেষ লেখা, মহাশয় ইহা আবৃত্তি করুন।

O bitter transformation!
Whilst limpid truth is turned to pack
of lies?
O tyrant of love's state, fierce jealousy.

With cruel chains these hands together
dies.

With tuisted rope couple them, rough
disdain,

But woe is me. With bloody victory,

Your memory is by my suffering slain,

And now I die and since all hope
I've lost

Ever in life or death, to prosper now

I obstinate, will rest in fantasy.

অবশেষে আছে।

Despairing song, I beg thee not to
grieve.

* * *

এই রাখালিয়া ঐতিহ্য বনে বনান্তরে নহে মনে মনে আপনার প্রভাব বিস্তার করে। কোথাও কোথাও ভয়ঙ্কর হতাশাও দেখা দেয়।

এমন আর এক রাখালের কথা আমরা কবি স্পেনসারের উক্তিতে পাই :

One day, (quoth he) I sat, as was my

trade under foot of mole……

There a strange shepherd chanc'd to
find me out ;

Whether allured with my pipe's delight

Whom, when I asked from what place
he came

And how he hight ?…

The shepherd of the Ocean by name

And said he came far from the main
sea deep.

'দি সেপার্ড অফ দি ওসন' অনেকেই ধারণা করেন ইনি স্যর ওয়ালটার। স্যর ওয়াল্টারের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, গভীর জীবন সম্পন্ন ব্যক্তি ইতিহাসেই

অল্প তথাপি তাঁহার নিজের উক্তিতে, মানুষ মাইক্রকসম্যস এবং "for out of the earth and dust was formed the flesh of man" ইহা তাঁহার ব্যক্তি জীবনের বহন ধাববান নিয়ত স্রোতের শব্দ।

* * *

তাঁহার এলিজাবেথের প্রতি, যদি বলা হয় ভালবাসা, একনিষ্ঠতা সূত্রে ছেলেমানুষী অথবা রাখালিয়া ভাব অভিব্যঞ্জনা আমাদের অস্থির করে। অবশ্য এ রাখাল কখনও প্রলম্বিত শ্রিপ্র বৃক্ষের ছায়া, দেখিয়া অথবা সবুজতার উপর সান্ধ্য শিশিরের মহিমা দর্শনে, বিশেষত কোন আরকডিয়ানকে আপনার প্রেমের গীত গাহিতে নিশ্চয় বলে নাই।

কেন না ইনি সায়রের রাখাল।

কোন দিন ইনি আপনার প্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন নাই। তিনি তদানীন্তন সহজ সরলতায় জানিতেন আমি আছি এবং আমার প্রেম আছে। যখন তিনি টাওয়ারে নিক্ষিপ্ত হন সে সময়ে একদিন তাহার জানালা দিয়া তখন ব্লাকফেয়ারস স্টেয়ার্সের নিকট নৌকা বজরা ইত্যাদি দেখিতে পাইলেন, খবর হয় রানী স্যর জর্জ কেরীর আলয়ে গিয়াছেন।

র‍্যালে এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত। তাঁহার ধারণা হয় যে তাঁহার শত্রুরা রানীকে ইচ্ছা করিয়া এই পথে আনিয়াছে—যাহাতে র‍্যালে ব্যথিত হন, তাঁহার হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যায়।...ইহার কিছুদিন পরে তিনি রানীকে লেখেন। এ পত্রে একথাই মনে হয় তিনি অসম্ভব ভাষাবিদ্ ছিলেন। I am now left behind her in a dark prison, all alone. While she was yet near at hand that I might hear of her once in two or three days, my sorrows where less. But even now my heart is cast into the depth of all misery—I was wont to behold her riding like Alexander hunting like Diana, walking like Venus: The gentle wind flowing her fair hair about her pure cheek like a nymph sometime sitting in shade like a goddess, sometime singing like an angel, sometime playing lke orpheus.

এখানে প্রকাশ থাকে যাঁর উদ্দেশে এবম্বিধ উচ্ছ্বাস তার বয়স তখন ৬০। এলিজাবেথ এই চিঠির কথা শ্রবণে নিশ্চয়ই উল্লসিত হন।

স্যর ওয়ালটারের জীবন আমাদের নিকট বিস্ময়কর চিত্র। এ জীবন কোন শুদ্ধ গণনায় আসে না। কেন সর্বরূপে আদিমতা ইহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে—নিবিড় বনমালা, সবুজতা যেখানে আকাশকে ক্রমান্বয় আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং সেখানকার জনগণের অদ্ভুত জোনাকী গোনা জীবন, যাহারা মৃত প্রিয়জনের মস্তক সযত্নে নানাবিধ পালকের দ্বারা ভূষিত করে অথবা দক্ষিণ ও বিনোকোর আরওয়াকস (জাতি) যাহারা গতাসু গৃহস্বামীর অস্থি চূর্ণীকৃত করত পানীয় মিশ্রিত করিয়া স্বজনরা এবং গৃহকর্ত্রী সকলেই পান করেন। (Discovery of Juiana) এবং সেই স্থানে থাকিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষার রঙ্গভূমি ইংলণ্ডের ফিরিবার বাসনা তাহাকে নিশ্চয়ই উদ্‌গ্রীব করিয়াছে কিন্তু সেখানেও দেখা যায় একটি অস্থির আদিমতা তাহার মধ্যে আরূঢ় হইয়াছিল।

দ্বীপের নেশায় তখন ইউরোপ মথিত। পুনরায় মাত্র পূর্ণ করিবার জন্য ক্ষীণায়ু জাগরণের মধ্যে সে আপনার ক্লান্তিকে দেখিয়াছে, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না সে কোন ক্লান্তি, কোন অবসাদ। মানুষের আপন দেহ নিবন্ধে একটি সহজাত অবসাদ আছে যাহার নাম দুঃখ।

অবশ্য সাধারণ ভাবে ইতিহাসে ইহাকে ক্লান্তি বলা হয় না, ইহাকে আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা বলা হয়। যাহা হউক যে শান্তি তাহারা ঘরে লাভ করেন নাই···কেননা আমরা পরবর্তী কালে স্যর ওয়লটারের জীবনে দেখি।

তথাপি তিনি শেরবোরনে যখন চলিয়া যান তখন গ্রন্থ, কাব্য, বৃক্ষরোপণ, বাগান-করা ইত্যাদি নানা প্রকারের গ্রাম্য কালযাপন বিধিতে তিনি the hours borrowed from ambition—অতিবাহিত করিতেন। এইখানেই তিনি লেখেন :

> **Heart tearing cares and quivering fears**
> **Anxous sighs, untimely tears**
> **Fly fly to courts**
> **Fly to fond wordlings sports.**

এবং পরে

Fly from our country pastimes, fly
Sad troop of human misery !
Come serene looks,
clearas crystals brooks.

শেরবোরনে তিনি সত্যিই আপনাকে সম্যক ভাবে বুঝিয়া লইয়াছিলেন। এসময় সাগরের রাখাল উপলব্ধি করেন যে মানুষকে অবশ্যই নিশ্বাস লইতে হয়। একথা তিনি স্পেনসারের সহিত যখন (একটি তদানীন্তন পত্রে দেখা যায় "My Lord of Esse had chased Raleigh from court" কিলকোলমানে কাটান তখনও মনে হয়।

স্যর ওয়ালটার স্পেনসারের সাহচর্যে সেই সুন্দর রোমান্টির দুর্গে কাব্যালোচনার সময় অতিবাহিত করিয়াছে।

শান্তির মাধুর্য যেন তখনকার বীজমন্ত্র হইয়াছিল। দৈবাৎ সব সময় চাহিয়াছিল, 'অচাঞ্চল্য'। গ্রাম্য নিশ্চলতা, সময় সেখানে মানুষের অনুবর্তী, মানুষ যেখানে শুধু মাত্র মন, সেখানে দাঁড়াইয়া যদিও দরবারের তুলনায় বলিতে গিয়া কিছু হৃদয়বৃত্তি দেখা গিয়াছে।

Two harmless lambs
are butting one another
Which done, both bleating
run each to his mother
And wounds are nearer found
Save what the ploughshare
gives the ground

এরপরই দেখা যায়

Go let the driving
Negro seek
For gems hid in some
forlorn creek
We all pearls scorn,
But what the dewy morn

Congeals upon cach
little spire of grass
Which careless shepherds
beat down as the pass

এরই অবশেষ

Blest silent groves
O may ye be
For ever mirth's best nursery

আদিমতা এইরূপে ক্রমে সূর্যাস্ত দর্শন করে। যে আদিমতার স্মৃতি উড়ন্ত পাখীর ঝাঁক ছিল, যাহার ছায়া খর স্রোতবহ ঝরণার উপরে ক্ষণিক থাকিয়া ঝটিতি ঊর্ধ্বে বহুদূরে বিলীয়মান, মেঘ উপত্যকায় আস্তীর্ণ অথবা"—

"এই রাজন্যবর্গের একজনের স্ত্রী যথার্থ রূপসী, আহা কি সুন্দর, কি সুন্দর কালো তাহার চোখ, কি সুঠাম গড়ন, অজস্র সুদীর্ঘ কেশভার ভূমি চুম্বন করে, তাঁহার আদব কায়দা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়; ভদ্রমহিলা যথার্থ-শীলা, তাহার হস্তে মদের পাত্র ধীরে ধীরে পান করিতে আলাপ আলোচনা করিতেছিলেন, সব সময় আপনার সৌন্দর্যের জন্য একটা মিষ্টি গর্ব ছিল।

আমাডাস ও বরেল যখন তাঁহাকে লেখেন as if we been in the midst of some delicate garden"

যে লাজুক বাগিচার ঝরা পাতা সকল সমুদ্রে তরঙ্গ তাড়িত হইয়া নাবিকের নিকট নক্ষত্রে রাজি।

সাগরের রাখালকে উপলক্ষ করিয়া পুনর্বার যে কাব্য তাঁহার অন্তরীক্ষে তাহাকে স্মরণ করিয়া—

Why do if send thii
rustic madrigale
That may thy tuneful
car unseason quite ?

* * *

In whose high thoughts
pleasure built her bower

স্টোইকদের মধ্যে কেহ বলিতে পারে "O imagination ! go away... for I want thee not...অবশ্য এখানেই এই উক্তির শেষ নহে কেননা অবশেষে আছে, "কিন্তু তুমি তোমার পুরাতন রীতিতে আসিয়াছ" (ওরেলিয়স)

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় কল্পনার আবেগকে এই ভাবে দূরে যাইতে অনুনয় করা শুধু নহে, ইনি কাব্য ত্যাগও করেন। এই স্টোইকের ভাবধারা কতকাল পর্যন্ত বিস্তার করে তাহা আমাদের অল্প অল্প জানা আছে।

ঠিক হে কল্পনা তুমি আমার মধ্যে আপনাকে ঘনকৃষ্ণ মেঘের ন্যায় বিস্তার কর—আচ্ছন্ন করা। আমাকে প্লাবিত কর। এমন একটি মনোভাব অনেক কাল ব্যাপিয়া ছিল. অনেকেই উদাত্ত কণ্ঠে তাহাকে ডাকিয়াছে।

কাব্য প্রেরণা অবশ্যই আমার তাহায়—'স্যর ওয়লটারের' ইতিহাস রচনাতে দেখিতে পাই, আদিম মনোভাবে, সমস্ত আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, তথা দিগন্তমুখীন সহসা ঋজু একটি রেখায় পরিণত হইয়া, বহু ঊর্ধ্বে নক্ষত্র-রাজির দিকে—নিগূঢ় কৃষ্ণকায়া বিস্ময়ের দিকে আঁখি মেলিল. তখন আমরা জনসাধারণ হতবাক, বিস্ময়মাত্র...।

"By his own word, and by this vissible world is. God perceived of men, which is also the understood language of almighty vouchsafed to all creatures, whose hieroglyphical characters are un numbered..."

(প্রিফেস টু দি হিস্ট্রি অফ দি ওয়ার্ল্ড : স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে)

এ ধরনের চিত্রণের মূলে যে আবেগ যে সততা যে বাস্তবতা সম্পর্কে উপলব্ধি, তাহা কচিৎ অন্যত্রে দেখা যায়, অবশ্য নক্ষত্ররাজিকে Thomas Browne একস্থানে unhuried বিশেষণ ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্মতার আভাস দিয়াছেন। উপরোক্ত কতিপয় লাইনে যে সৌন্দর্য বোধ দেখা যায় তাহার তুলনা নাই। এখানে প্রকাশ থাক hieroglvphical বাক্যই যে আমাদের নব্য মনকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহা নহে। সমগ্র ভাব যেন বা একটি সুন্দর নমনীয় বক্র রেখায় পরিণত হইয়াছে।

তাহারই নিজের উক্তিতে, Our fancy is compared to the moon

in which we seem to live and grow as plants. (Ibid)

*　　　*　　　*

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখা যায় ; ইহা শুধুমাত্র তাহার কলমী শাক, অথবা আপেল খাওয়ার জন্যই নহে। এই সম্পর্ক যে কি প্রকারের তা বিশেষরূপে বলা নিষ্প্রয়োজন ; প্রকৃতি মানুষের সকল তত্ত্বই জানে, তাহার মধ্যে অজস্র রক্তিমতা আছে এবং ধমনীর মধ্যে যাহা রক্ত।

রক্তিমতা ব্যতীত আর একটি তথ্য আর একটি জ্ঞান বর্তমান, যাহা সবুজতা, যাহা লাফান-হরিণ শাবক সোহাগে আরও সুন্দর এবং বিশেষরূপে সবুজ।

আমাদের দৈনন্দিন গণনার সংখ্যায় এই দুই তথ্য যে কতবার একের যোগফল, ফলে একটি সংখ্যা তাহা আমরা জানি না। তথাপি বলা যায় ইহাদের মধ্যে কোথাও না কোথাও লুকাইয়া আছে, নিশ্বাস তাহা নিশ্চিত জানে এবং তাহাকে লইয়া আমাদের নিশ্বাস প্রহর গণিতেছে।

পেসটোরাল কবিতার মধ্যে সভ্যতা ত্যাগ, এবং তাহার কল্পনায় নিরবচ্ছিন্ন সরলতা যোগলব্ধ। এখানে ছোট একটু দূরত্ব, যাহা সত্যই নিকটতমের জ্যামিতিক অভিব্যঞ্জনা ব্যতীত আর অন্য নহে।

And pipe to me—I'll tend thy goats the while……

এখানে এ সময় শূন্যতা নহে। এখানে সময় বিস্তৃত এখানে সময় বস্তু। যে বস্তুকে হাতে করা যায়, যে সময় আদর খায়।

এখন বাটালির গন্ধ ! এখানে আসিয়া আমাদের মন চমকিয়া উঠে।

॥ ৭ ॥

আমরা সারাভারতীয় হিন্দুরা রাখাল বড় ভালবাসি। একটি অল্পবয়সী রাখালই আমাদের জীবনের সর্বতর্ক বিচারের শেষ এবং সর্ব উচ্চ সিদ্ধান্তের প্রতীক। ফলে গোচারণ ভূমি আমাদের যে আনন্দ দেয়, গো-পাল আমাদের যে চরম স্নিগ্ধতা বিতরণ করে, এবং প্রিয়মিলন ব্যাকুলতায় যে অধীরতা দান করে এমন কোথাও আর করে না।

সকালে ভৈঁরোতে যখন জাগো মোহন পেয়ারে গীত হয় তখন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, উদার প্রান্তরে আনন্দ উৎক্ষিপ্ত নবজাত বাছুরের আরবার ক্রীড়া দর্শনের জন্য মন আমাদের ঘুম জানে না। ক্রমাগত বাঁশরীর

ধ্বনি সূর্যের তীব্রতা ক্ষয় করে, অথবা কলস লইয়া গ্রামবাসিনীরা যখন জল লইতে যায় পুনর্বার সন্ধ্যায় গো-খুর উত্থিত ধূলিকণা দেখিয়া গৃহাভিমুখী পক্ষীকুল ঝড়ভ্রমে ভীত হইয়া কলস্বর তুলে…এ সকল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা আমাদের কোনক্রমেই ক্লান্ত করে না।

সমস্ত সবুজতা, নদীমালা, গিরি কন্দরে যেখানে এতাবৎ বিদ্যাধরী কিন্নর রমণীরা বিহার করিয়া ফিরিত অবশ্য আজও তাহারা আসে ;—এবং শুনিয়াছি সুপ্তিআচ্ছন্ন বনভূমির মধ্য দিয়া তির্যক, আলোক রশ্মি দর্শনে বিস্মিত, থ, প্রস্তরবৎ হইয়া সেখানেই সমস্ত কিছু ভুলিয়া পুনরায় সেই তির্যক আলোক দেখিবার মানসে অদ্যও দণ্ডায়মান। সেই স্থানেই আমাদের অত্যন্ত আপনার জন মাধব খেলা করেন, 'বাদয়তে মৃদু বেণুম' বাঁশরী বাজান।

যাঁহারা ভাগ্যবান, যাঁহারা কবি, কেননা কাব্যের মধ্যেই তাঁহার অস্তিত্ব এবং অন্যপক্ষে তাঁহাতেই কাব্যের অমরত্ব তাঁহারা বসুন্ধরা দর্শনে 'ভাবাবিষ্ট' হন, ভগবান রামকৃষ্ণ মহাপ্রভু, ভগবান শঙ্কর জয়দেব ইঁহারা সকলে অনেকবারই গোচারণভূমিকে, নদীকে প্রণাম করিয়াছেন।

আমরা দাস্যভাবে স্বীকার করত সমগ্র প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি। কেননা আমাদের প্রেম এই সকল প্রান্তর বিস্তৃতির মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করে। হে নলিনাক্ষ! তুমি অরণ্যবাসী জনগণের প্রিয়-- সুতরাং আমাদেরও প্রিয়।

অন্যত্রে অপ্রকৃষ্ট চেতন বৃক্ষলতাদি এবং গো পশুপক্ষী প্রভৃতিও তোমার সেই সুন্দর রূপদর্শনে ঈর্ষান্বিত হয়। তাহা আমরা জানি।

একদা যখন, ভগবান অদৃশ্য হন তখন, তাঁহার লীলা সঙ্গীরা

গায়ন্তে উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচি কু রুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম।।
বহির্ভুতেষু সন্তং পুরুষং
বনস্পতীন॥
(রাসপঞ্চোধ্যায় ২য় অ ৪র্থ শ্লোক)

উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম গান করিতে করিতে গোপীগণ বন হইতে বনান্তরে সেই কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন। এবং অচেতন তরুলতাদিকে—আকাশের ন্যায় সর্বভূতের বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থিত নিত্য বিদ্যমান সত্তারূপী ভগবানের কথা প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

শুধু তাহাই নহে—

হে অশ্বত্থ। হে পিপ্পল। হে বটবৃক্ষ, তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি প্রেম, হাস্য একভাবে অবলোকন খবারা নন্দতনয় আমাদিগের মন প্রাণ হরণ করিয়া গিয়াছিল, তোমরা কি দেখিয়াছ।

হে কুরুবক, হে অশোক, হে নাগকেশর, হে পুন্নাগ হে চম্পক, মাননীদিগের পর্দহারী হাস্যবদন রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ গমন করিয়াছেন তোমরা কি দেখিয়াছ ?

এবং এই ভাবে প্রত্যেককেই তাহারা জিজ্ঞাসা করে। যথা— ।

হে মালতি হে মল্লিকে হে জাতিযূথিকে, সেই মাধব স্বীয় করস্পর্শন দ্বারা তোমাদিগের প্রীতি জন্মাইয়া গমন করিয়াছেন। তোমরা দেখিয়াছ ?

সমস্ত বনপ্রদেশ বৃক্ষলতাদির সহিত মানুষের কি অপূর্ব সম্পর্ক ? কেন না এখানে এই পরিদৃশ্যমান বিশাল প্রকৃতির অণুতে অণুতে তিনি বিরাজমান— ইদানীং তিনি আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত নহেন।

ফলে লীলা সঙ্গীরা পুনরায় এই চিন্তা করিল যে "পৃথিবী সর্বদাই সেই ভগবানের চরণের ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাদি উনবিংশ চিহ্নে তিলকাঙ্কিত হইয়া পরমানন্দিতা হইয়াছে, সুতরাং কৃষ্ণ বিরহিণী এই দুঃখিনীদিগের বাক্যে কর্ণপাত করিবেন কেন !

এই ভাবিয়া অন্বেষণকারী সকলে সহসা সকলেই স্তম্ভিত। কেননা এই বৃক্ষলতা সমাচ্ছন্ন, বনপথে একটি সুন্দর হরিণী তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই অগ্রগামী হরিণীকে গ্রীবা পরিবর্তনে যাইতে দেখিয়া ব্রজোগোপীগণ ভাবিয়াছিলেন আমাদিগকে প্রেমাস্পদ লাভের—কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ দেখাইবার জন্যেই হরিণী গ্রীবা পরিবর্তনে আমাদিগকে আহ্বান পূর্বক অগ্রগামিনী হইতেছে।

আমাদের কাব্যের মত এত অধিক উন্নত হইয়া কোথাও দেখা দেয় নাই। অন্যান্য দেশে তথা য়ুরোপে প্রায়ই আধমরা লোকেদের মনোবাসনায় কাব্য সঞ্জীবিত।

আমরাও ভাগ্যহীন···উহা ব্যতীত আমাদের আর ভাবিবার চিন্তা করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত নাই। আমরাও মরিয়াছি।

আমাদের ধারণায় রাখাল বলিতেই এক দিব্য রূপের কল্পনাই বুঝায়। এবং এই রাখালের বাঁশরীঃধ্বনি আমাদের উন্মত্ত করিয়া তুলে।

কেন বাঁশী বায় বড়াই কালীনি নই কুলে।
বাঁশীর শবদে মোর আউলাইল রন্ধন !

শুধু ইহাই নহে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পাচন ধরিয়া আমরাও কত বারই না রাখাল রূপ অনুভব করিয়াছি। কতবার যখন গ্রামাঞ্চলে, গৃহস্থেরা রাখাল ভোজন করাইয়াছে (অনেকটা পিকনিকের মত) কতবার না অনাহূত-ভাবে আমরাও রাখালদের সহিত মিশিয়া গিয়াছি।

॥ ৮ ॥

আমাদের জানা নাই যে দূরদূরান্ত, যে ব্যাকুলতা, যে শোক সঙ্গীত আমরা বুকলিক কবিতায় দেখি তাহাতে কতটা বাতির গন্ধ আছে। তাহার মধ্যে না থাকিলেও পরবর্তী যুগে তাহা ছিল।

অবশ্য বাতিকে একদা লাম বলেন, This is our peculiar and household planet ; আমরা সকল সময়ই বাতি বাক্যটিকে কষ্টপ্রসূ অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু সত্যই কি সকল সময়ই তাহার ব্যতিক্রম নাই ?

আমরা যাহারা শহর প্রণয়ী তাহাদের নিকট দূর গ্রামাঞ্চলে ক্ষণিক মোহ আনিলেও কাব্যের মধ্যে সেই বাস্তবতা যতটুকু বিস্তার করিয়াছে, তাহা আমাদের সুন্দর করে, স্নেহ করে।

থিওক্রিটাস পাশ্চাত্য সাহিত্যের পাসটোরাল ব্যঞ্জনার আদি।

O raise, dear muses,
raise a country-song.

এটি সেই থইরসিস রাখালের গীতের ধুয়া, যে গীতে দাপনিসের বেদনা ছিল। সে সৌন্দর্যের প্রয়াণে বনের ভয়ঙ্কর পশুরা পর্যন্ত বিমূঢ়—এমনকি গোবলদাদি—তাহারা তাহার পদতলে বসিয়া কাঁদিয়াছিল। সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

এই সরলতা যেখানে সমস্ত জীব প্রাণী মাত্রই বিশ্রাম রত, যেখানে সকলেই ভালবাসার জন্য কাঁদিতে প্রস্তুত। একে একে সকলে আসিয়া প্রশ্ন করে, "বল কাহাকে তুমি ভালবাস ?"

এইখানেই সেই ধুয়ার বাক্যপদবিন্যাসে হের-ফের হইল। O muses, raise agin the country-song। পূর্বে শুধু মাত্র অনুনয় ছিল। গ্রাম্য গীতি গাও। এখন পুনরায় গীত শুনাও ?

দাপনিস অলস স্বপ্নের মধ্যে আপনাকে বৃথাই শেষ করিয়াছে। কারণ এখন সেই কুমারী কখন বা ঝরণার নিকটে বারেক বনাঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ ;

দাপনিস একদা তুমি সত্যিই রাখাল ছিলে, গোপালক ছিলে, অবশেষে তুমি but now like a goat herd thou !

এখানে আমরা আমাদের ক্লান্তির সম্মুখে দুইটি অপূর্ব চরিত্র লাভ করিলাম, ছাগ পালক বা বিস্ময়কর তাহারা আমাদের ভাষায় আরও যেন বা লাজুক আরও গোপনচারী, যখন তাহারা দেখে···

...Sees his flock at their wanton

amourous playing.

বেচারী ছাগপালক তখন আপনাকে আর সংযত রাখিতে পারে না—He weeps and says to himself Ah would I were one of you.

এই চিরকালের অস্থির মনোবৃত্তি—কোন কিছুই যে লাভ করে নাই, যে দূর হইতে সকল কিছুই দর্শন করিয়াছে—যে আপনার মত করিয়া পৃথিবীর সৃষ্টি করিতে, পুনরায় প্রকৃতির নিকট ভিক্ষা লইতে ছুটিয়াছে।

আপন মূঢ়তায় একটি ভূয়ো আশায় আপনাকে পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছে। অথচ রাখাল একদা প্রিপ্রাসের উক্তিতে

Daphnis thy vaunt

Was once that

Love were a

Poltry-foeman.

ইহার কিছু পর ধুয়ার পদবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে। Oh, cease, je muses cease the country-song.

এখানে বেদনা একটি শান্ত দ্বিপ্রহর, যে দ্বিপ্রহরে সমস্ত কিছুই পরিচ্ছন্ন, সমস্ত কিছুই আপন স্থানে পূর্ণ অবস্থায় বর্তমান, অথচ শূন্যতা ব্যথিত বাঁশরী ধ্বনিতে মূর্ত হইয়া উঠে। যেখানে ধীরে বায়ু আঘাত পত্র নিচয় মর্মরিত হইয়া কিছু বেদনা শূন্যতা প্রশমিত করিতে ইচ্ছুক। পরে আর একটি অব্যর্থ ইচ্ছার সম্মুখীন আমরা হই।

Turn magic wheel,

and draw my love to me !

সিসিলি দ্বীপের এই আশা আমাদের চমৎকৃত করে। ইহার মধ্যে অনেক আশা থাকিলেও প্রথমত ইহা কাব্য-কাব্যের আধার।···

রাধে মাধবায় নম, তারা তারা, জয় রামকৃষ্ণ! মাগো আমাদের আর কেহ নাই জানিও! যে আমরা বাঙলা লেখা ব্যতীত অন্য কিছু জানি না, যে বাঙলাতেই কথা বলি, ঘরকন্না করি, এখন তদ্বিষয় আমাদের জানা প্রকাশিব।

প্রথমেতেই বলিব আমরা থিয়েটারের লোক; আহা সেদিন কি গর্ব আসে যে দিন মহাকবি গিরিশের দিব্যদর্শন আবৃত্তিয়াছি—

আগো ধিক ধিক লেখনী রে,
বিদরে তাপস হিয়া,
উঠ উঠ চৈতন্যদায়িনি
মোহ দূর করে মা, মোহিনী মায়াময়ি!

যাহাতে আজও রোমাঞ্চিত হই; মধুসূদনের ঐ লাইনে "নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তিজলে" বা যখন পড়ি,

শুনেছি মৈথিলী নাহ আদেশিলে
জলে ভাসে শিলা, নিভে অগ্নি,
আসার বরষে!

আমাদের বক্ষঃস্থল গোঙাইয়া উঠে।

এখানকার প্রতিটি শব্দ আমাদের ঝটিতি এক স্তব্ধতাতে প্রেরণ করিয়াছে; যে এবং আমাদের মধ্যে অভাবনীয় বীরত্ব দিয়া সর্ব ইন্দ্রিয় বা শুধু ত্বাচপ্রত্যক্ষ হইয়াছে! এবং শিশিরবাবু বুঝাইয়া দিলেন, প্রতিশব্দকে কেমনভাবে উদঘাটন করিতে হইবে: এখানে দুই পক্ষ আছে, শ্রোতা ও বক্তা!

অদ্য তাঁহার স্বর আমাদের মধ্যে বিরাজমান, তাঁহার "সীতা, সীতা", তাঁহার "অলকা" অথবা 'কি বাঈজী, গান বন্ধ করলে যে'; তখনই—'সধবার একাদশী'র বহুকথা শুনিতে পাই! (এ সম্বন্ধে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা লিখিয়াছেন। (৭৩ সালের 'দর্শক' পূজা সংখ্যা)।

তিনি, শিশিরবাবু একবার,—সেদিন তাঁহার নিকট ইদানীংকার এক নামজাদা ফিল্ম নির্মাতাকে লইয়া যাই: —সেইদিন তিনি মধুসূদনের বিখ্যাত

খেদোক্তি পাঠ করেন।

'রে প্রমত্ত মন মম কবে পোহাইবে রাতি! জাগিবি রে কবে।' (এখানে 'আবৃত্তি' প্রয়োগিত হয় না—কখন আবৃত্তি শব্দে ভেদ আমরা আনিয়া থাকি —এতদ্ব্যতীত থিয়েটারের যে ডান ও বাম আছে, তাহা বুঝিয়া—মুখ নামাই বা তুলিয়া—স্বর ব্যবহার হয়)।

পড়িবার রীতিতে সব কিছু নির্ভর করে—যেমন যদি পড়ি 'কোনো গুণ' তাহলে মস্করা হইবে, আদতে 'কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন' ইহা উচ্চারণ কর্তব্য! আবার আছে এমনি বাচনভঙ্গী যেমন অমৃতলাল বসু বলিয়াছেন কেশব সেনের ছিল। তিনি ঐ ত ভগবান! বলিলেই, সকলেই তদীয় অঙ্গুলি নির্দ্দেশিত দিকে দেখিত। যখন তিনি সমাজে বলিতেন: গালে হাত দিয়া ভাবি পরমেশ্বর এ কোথায় আনিলে··· ॥ তরুণ দেবতা চিরযুবা ঈশ্বর, চির প্রস্ফুটিত গোলাপ সকলের হও··· ॥ আমার মেয়েটি চুল আঁচড়াচ্ছে, দেখিব তোমার হাতে চিরুণী আমার মেয়ে জীবন্ত, তুমি মৃত; আমার সোনার দেবী তুমি এস! কৃষ্ণকমলবাবু বলেন— অন্যদের ক্ষেত্রে (স্বর) demonstrative ছিল, জানি না এখানে তাহা প্রযোজ্য কিনা। কেশববাবুর শব্দ বিচার লক্ষ্য করিবার।

গিরিশবাবুর বিল্বমঙ্গলের পরম মনোরমত্ব বুদ্ধি সজীব কথাবার্ত্তা 'চিন্তামণি তুমি কি সুন্দর'! উল্লেখ্য এই সুন্দর কথা সিদ্ধ নাট্যকার তিনবার দিয়াছেন, এই তিনবার অতীব তাৎপর্য্যপূর্ণ—সত্যে পরিণত হইল, যে ইহা ত্রিগুণ সম্বলিত, ইহা শিশিরবাবু ভাস্বর করিয়াছিলেন! (শরৎবাবুর সহিত শিশিরবাবুর সম্ভবতঃ দেনাপাওনা নাটক লইয়া (ষোড়শী) কিছু কথাবার্ত্তা হয়; শিশিরবাবু বলেন,···'বলিয়া দিও শিশির ভাদুড়ী যদি কলেজ স্কোয়ারে দাঁড়াইয়া a b c বলে ত লোকে শুনিবে···' অর্থাৎ যে কোন পরিচিত অক্ষর দ্বারা তিনি সর্ব্বৈবভাবে আপনার স্বরবৃত্তি প্রকাশে দক্ষ ছিলেন। যথা; 'ষোড়শী'র 'অলকা' ডাক, উহা নাম এবং নামীর সহিত অর্থগতভাবে যোগ নাই (অবশ্য সাড়া দিবার জন্য সাধারণত তাহা মান্য; যেমন 'সীতা', এক শব্দে আপন মনোভাব অবলম্বন বা আশ্রয় করিল।)

ঈদৃশী সুবাদে, বাচনভঙ্গী বা শব্দ বিচার লইয়া আমাদের বুদ্ধিমত বহুদিন কাজ করিয়াছি। উপরন্তু আমরা সারিগম জানার ফলে কমপক্ষে পূর্ব্বে ও বহুপরে আমাদের ঘরের তুল্য,ও বস্তি আগত বহুকেই স্বরভেদ শিক্ষা

দিয়াছি—এই শিক্ষার ফল আমরা পাই নাই—সকলে অন্ত ধরণ শিক্ষা করিয়াছে। আমরা যে কথকতা, রামায়ণ গাথা, প্রহ্লাদ চরিত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী ইত্যাদি সুর ও আবৃত্তি ভঙ্গী একযোগ নির্ম্মাণ করি—তাহাতে আমরা শব্দ উদঘাটন লইয়া অনেক আপন বুদ্ধিমত চিন্তা করিয়াছি।

এখানেতে তাল, লয়, মান যতখানি পারিয়াছি বিচার করি—বিশেষত আমাদের বড় ইচ্ছা ছিল একটি সংগীতমুখর পালা যেমন, প্রখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ও গিরিশবাবু করিয়াছেন তেমনই ধরণের রচনা করিব—তবে ইহা অনেকটা opera-র মত (প্রকাশ থাক পুচিনি আদি বহু অপেরা আমরা গ্রামোফন রেকর্ডে ইদানীং টেপের মারফৎ শুনিয়াছি) অবশ্যই ঐ অপেরা মজার হাসির হইবে। আমরা কেমনভাবে করি, বলি—গল্পটিকে সাজাইয়া প্রয়োগি, মানে শব্দ বিবেচনায় মনুষ্যোচিত বৃত্তি, বিস্ময়, হতবুদ্ধি, হাস্য, বাচন ভঙ্গী, তোতলা হইতে আপ্লুত স্বর। জিহ্বার আড়। চলিত কথার রকম—ক্রন্দন সহ বাচন ভঙ্গী, ভিক্ষুকের আবেদন, খেলার গোল, রেকর্ড খারাপ হাওয়াতে একই জায়গার স্বর, ইহাতে যাত্রার টান এবং জিহ্বার শেষভাগে শব্দকে ঠেস দিয়া বলার যে রকম প্রচলিত আছে, ন্যাকামী, আঞ্চলিক ভেদ, মন্ত্রপাঠ, শ্রাদ্ধ, অঞ্জলির সমবেত কণ্ঠ, আজান, সত্যপীর, চাহিল্লুমের গীত ফেরিওয়ালার ডাক, চৌকিদারের হাঁক, পশুপাখীর-গর্জ্জন তর্জ্জন কলহ! প্রাকৃতিক যান্ত্রিক। ইহার সাত্যি ছড়া মায়া বিস্তার, (এখনও আমি কত যে ছড়া সঠিক টানে বলিতে পারি) বিবিধ স্বরের সহিত অর্থাৎ মানসিকতার শব্দ যোজনা করিয়া ঘোড়া চোরটি নির্ম্মিত। ঘোড়া চোর আমরা ময়ূরভঞ্জে ও কেনদুয়া পাড়ায় কথান্তর শুনি, আমাদেরটিতে রাজার সহিত সওদাগরের জঙ্গলে দেখা হয়। উপেন্দ্রবাবুতে আছে—সভায়। ইহাতে রাগরাগিণী, লোকগীতি, টপ্‌পা, ছেলেবেলায় চার্চে গীত-সহিতা এবং আমাদের দেশের সিদ্ধ সুরকার রামপ্রসাদ, গিরিশবাবু, আলিবাবার সুরকার, ডি এল রায় হইতে ইদানীংকার শ্রেষ্ঠ সুরকার দিলীপবাবু, ভীষ্মদেব, কুমুদ মল্লিক, কুমার শচীনদেব—ও কর্ণাট ধরণ সবই ভাবিতে চেষ্ট করিয়াছি। প্রত্যেকটি শব্দ বিচার তৎসহ ভাব বিচার এখানে উল্লেখ্য হয়।

যে লেখক যে শব্দই ব্যবহার করুন, তাহা পাঠকের উপর নির্ভর করে। তাই যাহাতে অর্থান্তর না ঘটে তাহা দেখিব।

শব্দসকল কণ্ঠস্বর বৈ আর কি! আমরা সাধারণত একজনকে উপদেশ দিয়া

থাকি। ভৎসনা করি। উত্তর করিতে, মিথ্যা সাজাইতে কেমন কণ্ঠস্বরে বলিব বিচার করি —, ইংরাজী পড়িবার সময় আমরা appropriate preposition সূত্রে পাই (এখানে ওতপ্রোতগুণ উল্লেখ্য) এবং বাঙলাকে ইংরাজী অনুবাদের সময় আমরা শব্দ বাছাই করিয়া থাকি! তখন এক মনোভাব, আচার বিধি, আরেক দেশের লোক যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে (এইজন্য গত শতাব্দীতে জজ পণ্ডিত ছিলেন যাঁহারা দেশীয় বিধানকে ব্যাখ্যা করিতেন!) যাহা হইতে অনুবাদ করিতে হইবে তখন তাহার দেশজ চরিত্র, কেমন ব্যাখ্যায়, বর্ণনায় অন্তর জানিত বোধিত অভিজ্ঞতার মধ্যে লইব, সেই ভাবন জ্ঞান থাকে; ইহাতে নিশ্চয়ই খানিক বাদ পড়ে, বিশেষতঃ ভক্তি যোগের আলোচনাতে ত বটেই। সাধারণ শব্দও যেমন, অভিমান শব্দ ইত্যাদি। শরৎবাবু বলিয়াছিলেন, যেমন ধর অভিমান কথাটা উহার কি ইংরাজী হয়! বলিয়াছিলেন আমের 'মঞ্জরী' কি হয়!—এখানে মন্তব্যের যে উহার মানস ও সঙ্গীতত্ব ক্ষয় হয়।

শব্দ সম্পর্কে আলোচনা সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেরই বিষয়ীভূত ছিল— আমাদের দেশে ধর্ম্ম আর দর্শন একই। এমন কি মহাপ্রভুকে, রামকৃষ্ণকে— বহুমত মানিলেও অন্য অনেক প্রচলিত ধারা খণ্ডন করিতে হয়। তাঁহারা নৈয়ায়িক ছিলেন। সঠিক শব্দে তাঁহারা অদ্বিতীয়!

ভগবান শঙ্করের গল্প অনেক আছে একটি এই— মণ্ডন মিশ্র প্রশ্ন করিলেন, মুণ্ডী কোথা হইতে? শঙ্কর. স্কন্ধ হইতে! এবং 'আগার' শব্দ লইয়া তর্ক আজও আছে, বৌদ্ধ যুগে মিলান্দা (!) শব্দ লইয়া তর্ক জন্য শ্রমণ খুঁজিতেন (শূন্যকে আছে অর্থাৎ, 'শূন্য আছে' বলার মত মূঢ়তা আর নাই— পঞ্চদশী) একথা আমরা জানি। ছেলেবেলায় আমরা খাতুরীর মেলাতে (রাজসাহী পূর্ববঙ্গ) একবার যাই; দেখি, মেলা ছাড়িয়া যাহারা উঁচু থাকের সাধক—কোন আলোচনার নিমিত্ত চলিলেন, পদ্মার চরে; গভীর মধ্য রাত, শুধু গাঁজার ধোঁয়ার কুণ্ডলী, নিস্তব্ধতা, মাঝিদের আলাপ, কাশির শব্দ, মাঝে একতারার ইতস্ততঃ আওয়াজ। ইহারা স্থান ও কালকে আলাদাভাবে বিচার করে, ইহাদের মধ্যে (প্রায় সকলেই) যাহারা তান্ত্রিক, চৌদ্দশ তন্ত্রে পাকা, তাহারাই করিয়া থাকে। এখানে আমাদের অভিজ্ঞতা স্মৃতি অনেক কন্যা যায়, যেমন যে এখানে প্রশ্ন করি: 'ডালিম গাছে পরভু নাচে' এবং এ কেমনে সম্ভবে, যে রাক্ষসী 'মন পবনের নাও' বলিয়া ছড়া কাটিল (লালবিহারী দে)। এবং ইহার অর্থ কি হয় যে 'তুমি যাবে জলে জলে, গুজো কন্যা। আমি যাব কূলে।'

যাহাতে রামেন্দ্রবাবু, তখন কৃষ্ণকমলবাবুদের ফেরে—ধ্রুব দর্শনের বৈজ্ঞানিকতা লইয়া ব্যস্ত, তাই দেখা যায় সবেতেই জড় ঐতিহাসিক সূত্র খুঁজিয়াছেন—রহস্য যে ছড়ার মধ্যে কত আছে তাহার অন্ত নাই।

বাউলদের সবই প্রণালী (process) : *ধরি মাছ না ছুঁই পানি, চুল* ভিজাব না, অষ্টপাশ ভেদ জানিব। সকলেই নূতন কোন শব্দর খবর দিতে পারে কি না, কোন শব্দ তাৎপর্য্য জানে কিনা তাহার তত্ত্ব লয়। তাহাদের ছেঁড়া কন্থা পদ্মার হাওয়াতে মৃদু উড়িতে আছিল, ইহারা এখানও সভয় পশ্চাতের দিকে তাকায়। (এখানে দর্শনেন্দ্রিয়র সব কথা আছে—তাকাইটি ঠিক) ইহারা আপন বা সমষ্টিগত absurdityকে লইয়া চলা-ফেরা করে, যখন নৃত্য করে তখনও, যখন জপ করে তখনও। ইহাদের ধারা চর্য্যা হইতে মানে অদ্যও 'আলেখ' হইয়া রহিয়াছে! (লড়াইএর পর এখনকার বাউল ব্যবসায়ী, ভিখারী, দুষমন, ছোটলোক—সাধক নাই!)

এখানে খাতুরীতে গুপ্ত অবধূতও আসে, একজনা আমাদের বলিয়াছিল—কর্ত্তা হে, ঠায় বসিয়া আলাপ শোন, নাহলে বিভুঁয়ে ঘুরে পড়িবে! শব্দ বড় আলেখ বড় পাঠান মতি। এখানে দেখিয়াছি ভাষা—বঙ্গের সর্ব্বত্র হইতে লোক আসিত—এবং শব্দ লইয়া আলোচনা হইত। ইষ্টিমারের ঢেউ, টেলি-গ্রাফ, এক মণ (ওজন), ইস্কুল, আবার কত না গঞ্জ শহরের নাম—আসিয়াছে ক্রমাগত সাটে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

মনের মানুষ, কেশববাবু ধর্মতত্ত্বে ব্যবহার করেন, যে ব্যবহারিক জীবনেতে মনের মানুষ কথাটা আদিরসাত্মক, (মনের মানুষ সামলে রাখা দায়) মাছ, জল, বাঁশী, মন, জাল, ক্রমে ধাঁধা হইয়া আসিত : সব সময় দেখি, সুর বলে, সুর এখানে আর এক শব্দ, তৎপ্রভাবে শব্দগুলি অন্য বিষয় হইতে, ছোঁয়া মনকে, নিভৃতে লইয়া আসিবে; যখন মন এই শব্দ বুঝিবে, তখন মৃদুহাসি। তত্ত্ব এখানে abstract, সুর অবশ্য abstract তবু, তাহাকে ব্যক্ত করে, শব্দকে সুর দিয়া ব্যক্ত করা। আশ্চর্য্য ইহারা আকাশের দিকে তাকায় না, ইহারা বিবিধ দার্শনিক বিগ্রহকে কোন মান দিবে না, প্রদীপ উহা কোন তত্ত্বই নয়। অনবরত 'মন' কথাটা লইয়াই গম্ভীর! বাউলরা অদ্ভুতভাবে হাই তুলে, আলস্য ভাঙ্গে! তখন চোখের কোণ দিয়া অশ্রু বহে; শুনিয়াছি সাধক হইতে, যে, উহারাই অনাসক্ত সাধন মার্গের। (মাগো—আমার সার্থকতা আসিল)।

আমরা খুব গ্রাম্য; পাশ্চাত্য আমাকে মা বলিতে শিখায় নাই। একবার

এখানে মিঃ ই. এম. ফ্রস্টার এক লেখকের বাড়ীতে আসেন। কালীঘাটের পাণ্ডার মতন তখনকার লেখকদের দেখি ফিরিঙ্গী ধরিত। আমরা কহিলাম ঐ লেখককে, যাঁহার গৃহে ঐ ইংরাজ লেখক আসেন, মহাশয় উহাকে কি প্রশ্ন করিবেন, রবি বাবুকে কেন তামাসা করিয়াছেন—এবং উনি বা নিজে কি পদের লেখক যে নিখিলেশকে, যতদূর মনে পড়ে, Kensingtonian বাবু লিখিলেন—লেখক ঐ প্রবন্ধ পড়েন নাই। লেখক কহিলেন, মহাশয়—আপনারা (আমাদের) আসিবেন না, মানে আমার ভ্রাতাকে বা ' · ' বাবুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। উহারা ভাবে ইংরাজই সব!

এখানে এক পশ্চিম দেশীয় সাহিত্যিকা আসেন, একটি বাড়ীতে সভার আয়োজন হয়—তাঁহার সহিত অনেকে অনেক আলোচনা করেন; আমরাও কিছু জানিতে চাই; কেননা, আমাদের দেশে কৃষ্ণকমলবাবু, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মধুসূদন, ভুবন মুখুজ্জে, ভূদেববাবু—কেশব সেন, ব্রহ্মবান্ধব অনেকেই এই লেখার সম্পর্কে ভাবিয়াছেন! (তৎপরে আর চিন্তা সম্পর্কে আমাদের খবর নাই—শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন বাঙালী চিন্তা করিতে ভুলিয়াছে।)[২]

তাঁহার সহিত, ঐ ভদ্রমহিলার সহিত, তাঁহারই এবং আরও গণ্যমান্য লেখকের লেখা লইয়া কথা হয় ইদানীংকার লেখা অনেকেই ব্ল্যাক এণ্ড হোয়েটে-এ খাড়া করিয়া থাকে অর্থাৎ ভাবে, যেমন আছে তেমন, ঐ লেখিকার পর হইতে অনেক কিছু ভাবনা আসিল—এই সভায় ধরণীবাবু পাহাড়ী সান্যাল ও অসিত গুপ্ত ছিলেন—শব্দ ব্যবহার আবিষ্কার আনিল।

১৯৫৫তে পাশ্চাত্য ইউরোপ খণ্ডে এক নতুন গোষ্ঠী আসিয়াছে। anti-roman বিশ্বাসী! ইহা করিতে উপন্যাসের গঠনের রূপ, কন্টুর (contour) প্রায় একই থাকে। আমরা খানিকটা, এই সূত্রে, এখানেতে, নিজেদের ব্যাপার কি ঘটিতে আছে তাহা বিচারিয়া যদি লই তবে কাজের হয়। এখনও নাটকীয়তার কারণে—মানে লোক বিদিত ঘটনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়: বিমাতার আচরণ, (যাত্রার পালার বিজ্ঞাপন), ভাই ভাই; বড়ভাই একদলে ছোটভাই একদলে, প্রভু মালিক! বহু সম্পর্ক! ছেলে মেয়ের রেডিও প্লে হইতে সর্ব্বত্র আমরা একই ভাবিতেছি—ভুল ভাঙান! ফলে শব্দের ব্যবহারে কোন তারতম্য নাই।

প্রমথ বিশী মহাশয় তাঁহার এক প্রবন্ধে এ বিষয়ে মনোজ্ঞ অনুসন্ধান তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে ইদানীংকার বাঙলার নূতন চিন্তাধারা অদ্যাবধি কখনও

আসে নাই। প্রচলিত আধ্যাত্মিক চিন্তা কোন লেখকের বঙ্কিমবাবু হইতে সুরু করিয়া রবীন্দ্রনাথ) ধ্যানলব্ধ নহে। উপনিষদ বেদান্তই আমাদের সংরক্ষণ করিতেছে। এই বিশ্লেষণ কিয়ৎ নিশ্চিত। তবে আমাদের ধারণাতে, যে ইহাতে লজ্জার কিছু নাই ; বরং যাবৎ কোন নবতম জ্ঞান উপলব্ধি না আসিতেছে তাবৎ উহাই ভাল। উহাতে শব্দ গভীর হইবে।

বঙ্কিমবাবু বিদ্যাসাগরের ভাষা লইয়া বলিয়াছিলেন, গোড়া খারাপ করিয়া দিয়াছেন! (আশ্চর্য্য) আমরা মন্তব্যিতে চাই, যে উহা ব্রহ্মবান্ধব, ইনি মহা নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন তখনকার কাগজেতে বটে ইঁহার সমালোচনা প্রকাশিত হয়, সবই বেদান্তের স্তুতি, কেমনে উপলব্ধির তাহা নাই, শুধু শব্দ আছে, ফলে আমরা কিছু উন্নীত হই নাই; আরও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে মুক্তি অন্দোলনের ফেরে মুক্তি শব্দটা আধ্যাত্মিক হইতে জাগতিক হইল, আমরা ক্রমাগত বাঙালীত্ব ছাড়িয়া ভারতীয় হইতেছি শ্রীঅরবিন্দ ইহাকে নিন্দা করেন, দ্বিজেন ঠাকুর মহাশয় যারপরনাই যাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

এই মুক্তি আন্দোলন ও বিশেষত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্রোতে আমরা উপনিষদ হাতড়াইলাম— আমাদের সাধনার ধারা ভুলিয়াছি। বাঙলাকে (ইডিয়ম! উহা ঈশ্বর গুপ্ত, দাশু রায় ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সম্ভবে না ; ও দার্শনিক তত্ত্ব জড়ভাবে আমরা অনেকদিন লাভ করি। তখন আমদের বিষয় বাস্তবতা পৌরাণিক চরিত্র—কখন তাহারে মানুষ বৃত্তি দিয়াছি—কখনও উহাকে আদর্শায়িত করা হইয়াছে।

যে জড়ভাবে বিজ্ঞান তত্ত্ব তাহার নিজস্ব অভিধান ঠিক করিল—শুধুমাত্র পুরাতন শব্দের মধ্যে আকর্ষণ, পদার্থ, বস্তু ইত্যাদি বহুকে আর এক প্রক্রিয়ার মধ্যে আনিল ; (অক্ষয় বাবু দেখ) বিদ্যাসাগর মহাশয় যেদিন 'স্নায়ু' শব্দটির অর্থ করিলেন, তখন মনেতে নিশ্চয় হাসিয়াছিলেন, তাঁহার আশা ছিল ইহাতে একে নিজেকে বুঝিবে। (কৃষ্ণকমলবাবু তখনকার বাঙলা ভাষা লইয়া যারপরনাই অধীর হইয়াছিলেন।) ইহাতে কতটা দিক উদ্ঘাটিত হইল কে জানে!

এতাবৎ, আমরা চতুর্বিংশতিত্ব বুঝিতাম বিভিন্নকোষ পর্য্যন্ত—অস্মিতা সম্পর্কে সাধক না হইয়াও আমাদের বুদ্ধি ছিল। (মনকেমন শব্দটি ছাড়িয়া আমার নষ্টালজি, মনমরা Melancholy পাইয়াছি এবং বিবিধ শব্দও; কিন্তু এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও—দশকর্ম্ম বিধি, সত্ত্ববিধি—হিন্দু আইন কোথাও ফের হয় নাই।)

প্রথম আমরা দেখি, সাধারণ রগড় আত্মক বইতে বা দৈনন্দিন ঘটনা যুক্ত বইতে সাধারণ বাঙলা আছে—(কেরী ভবানীবাবু, টেকচাঁদ কালী সিংহী এবং মধুসূদনেও বীরত্ব ব্যঞ্জক, ইত্যাকারে নবরসের বহু বাঙলা শব্দ ব্যতীত দেখি,

ঝল ঝল ঝলে তড় তড় তড়ে

দুরন্ত হিংসক

শূলপানি ! যেয়ো না গো তাঁর কাছে

মোর কিরে প্রাণেশ্বরী…… দ্বিতীয় স ৪৬৩

বালাই লইয়া তবে মরি ৩৪৭

কখনও বৈষ্ণব কথাতে যেমনটি 'তৈই দেব।'

এখানে 'কিরে' মানে দিব্যি 'বালাই' অপরিহার্য্য এই গাম্ভীর্য্যের মধ্যে। প্রত্যক্ষ করণে তাঁহার মত কোথাও দেখি না, প্রতিটি শব্দ দ্বারা আলো (জড)ও বস্তুকে তানয়ন করেন। 'উলঙ্গিলা আদি' এখানে আমাদের উলঙ্গিলা শব্দকে ইংরেজী করিতে হয় না—উলঙ্গ শব্দটি খুবই চলিত। অবশ্য বিদ্যাসাগর ইহা পছন্দ করিতেন না; অথচ ব্যবহারিক জীবনে তিনি কখনও 'দধি' বলিতেন না, তাঁহার আরোপ – আর এক অসামান্য পদ্ধতির ছিল।

বিদ্যাসাগার মহাশয়—তদীয় সীতার বনবাসে সুষমার ব্রাহ্মণ্য ধ্বনি ব্যঞ্জনার সহিত বাঙলার ব্যাকুলতা এমত চাতুর্য্যের সহিত বসাইয়াছেন তাহা কল্পনাতীত, যেমন 'আমারই কপাল ভাঙ্গিয়াছে', 'আমার মাথা খাও আর্য্যপুত্রের দোহাই'! ইহা বাক্য হইলেও এক একটি শব্দ (!) নিশ্চয়। এরূপ প্রয়োগ অনেকাংশে যেমন গীতের অদ্ভুত বিস্তারের সহিত (এখানে oration শব্দটির ভাবনা করা যাউক)—আচমকা বাংলা দুঃখময় জীবন!

সাধারণ কথার ফের যেমনটি শুনিয়াছি ফৈয়াজ খাঁর নিকট, ইহা ঠুংরীতেও স্পষ্ট, 'চল বানাও বাতিয়া'তে যাও যাও হাটো ইত্যাদি যেমন সখাসখীকে বন্ধু বন্ধুকে মহা অভিমানে, পিতা পুত্রকে, মাতা কন্যাকে (এখানে স্ত্রী সুলভ কণ্ঠস্বর তিনি লাগাইতেন) ইত্যাদি, কিম্বা 'ছোড় হাত মনে মোহন কানাহি 'চুড়ীয়া টুট জায়গী' ব্যতীত বহু রাগে। গাম্ভীর্য্যের মধ্যে দেশীয় টান!

অবশ্য সংগীত আমাদের বিশেষ অনুমতি দিয়াছে, দাপট, মনমায়া বেদনা, আনন্দ! সুর হয় ব্যক্তিগত শব্দ বাচনভঙ্গী; সবই খেলাইতে আমরা সংসাধন করি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এহেন tension আনিয়াছেন এখন চলতি শব্দে। এমনিতে তিনি সাধারণ বাঙলাতে সিদ্ধ—যাহা, উঁহার নিকট হেলাফেলার নহে; যথা, রটাইয়া দিল, জব্দ, মুখ থুবড়িয়া, ফিকির, খটখট করিয়া, সেইখান দিয়া, খোসামোদ, মিন্সের আক্কেল, তৎসহ চালাকি খাঁটিবেক না, কস্মিনকালেও, মাগী; বিশুদ্ধতাকে নিশ্চয়ই যে তিনি অবাক শ্রদ্ধা করিতেন; তাঁহার মত শাস্ত্রবিদ দেখা যায় না অথচ শকুন্তলাকে মোটেই ব্যাস হইতে লইলেন না– যেখানে শকুন্তলা 'রক্তমাংসের (এখানে এক কৌতুক থাকে রক্ত মাংস বলিতেছি—যেহেতু শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বলিতেছেন, 'তোমার মস্তক শতধাবিদীর্ণ হউক ··বরাহপুরীষতে' এবম্বিধ অশালীন বাক বৈখরী। কালিদাস আছে: কিমিদমুপন্যাসম্ভব 'উপন্যাসের মত' এবং অনার্যা, অকৃত্রিম ক্রোধ; বিদ্যাসাগর মহাশয়ে আছে: রুষ্ট হইলেন—অর্থাৎ আমরা পুরাণে বা মঙ্গলকাব্যে নীচ প্রকৃতি যখনই দেখি, অসভ্যতা যখনই বুঝিতে পারি। (বেশ ভালোভাবেই পারি, তখনি বলি—ঠিক আমাদের মতন! আমাদের এই পরোক্ষ স্বীকার প্রশংসনীয়।) বিদ্যাসাগরের আদর্শ অদ্যাপি চলিতেছে।

আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতেই ভাবে এবং ব্যঞ্জনা ক্ষেত্রে এক শুদ্ধ আদর্শ, মধুসূদন কৃষ্ণকমল বঙ্কিম সত্ত্বেও মান্য করিয়া চলিয়াছি যাহা কালিদাস হইতে আর এক যে অবশ্যই আমাদের ভাষা হয় তাঁহার দ্বারাই বিবেচিত। শব্দ যেখানে যেমন এই তাঁহার উপলব্ধি।

আমরা স্কুলেতে সংস্কৃত ক্লাসে শুনিয়াছিলাম এক সমালোচনা, যে কোনজন বড় কবি, কালিদাস না ভবভূতি! এখানে দেখা যাইবে, নীরস তরুবর পুরতভাগে—পদে অদ্ভুত ছন্দ সংগীত মর্য্যাদ', তখনই 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠৎ অগ্রে' বাচকতা ওতপ্রোত হয়! যে এই ভেদ, নিশ্চয় বাঙলা দেশে বহুদিবস চলিয়া আসিতেছে—আমাদের মজ্জায় একটা বুদ্ধি দিয়াছে!

ওতপ্রোত-তা শুধু মাত্র দর্শন করা যায় এমত জ্ঞান জড় হইতে আসিতেছে, কিন্তু যে ধারণা বা মন ইহা দেখিতেছে তাহাকে নিশ্চয় বলা যায় 'আমি' দেখিতেছি; সত্যই কি দেখিতেছি, এবং কখন আমরা মায়া শব্দটি আনিতেছি—এ সকল তত্ত্ব সাধন পথের, সেখানে রজ্জুভ্রম ভয়াল সত্য! আমরা যেমন বুঝি তেমন করিয়া কি বলতে পারি। (ভুবন মুখুজ্জে তাঁহার কামাখ্যা অধ্যায়—এই ভেল্কীর কথা বলিয়াছেন,—'দর্শক' বছর ৫।৬ আগে কাগজে rope dancer সম্পর্কে এক নিবন্ধ বাহির হয় তাহা খুব মনোজ্ঞ।) কিন্তু এই ওত-

প্রোত' জ্ঞান শুধুই অস্থাবর সম্পর্কে না অন্ত লাগসই আছে :

এইকে আমরা বাস্তবতা বলি—মানে ছবিত্ব করাকে আমরা পাঠকরা হৈ দিয়া উঠি ; গীত বা পদ্যর প্রতিসাড় দিতে এক পুরাতন মন বা আদিম মন আমরা ভাবি, বিশ্বাস করি ; দেখিব, পশ্চিমারা কি ভাবে গীতে মুখিয়া উঠে তাহা ভাবা যায় না—অচৈতন্য হইতে এই শব্দ ! অচেতন অবস্থাকে, একের, কি ভাবে কবি জানিতে পারে ! প্রয়োজন, যে মন আধার ও আধেয়, আরাধনা ! (সাধন পথের সংজ্ঞা' যুগপৎ হইবে।

আমাদের ভাষাতে এই প্রমাণ করে যে স্বাভাবিক ভাবে আমাদের শব্দ বা পদ ব্যবহারে ওতপ্রোত করার প্রতি ঝোঁক বর্ত্তমান—দড়াম করিয়া, কটুস্ করিয়া, ম্যাও ধরিয়াছে, পপ্ পড় ছিঁড়িয়া ফেলিল, শব্দ ইইতে কার্য; আবার জিনিসের নাম—যথা ভ্রমর drill, ঝিঁঝি পোকা>শারীরিক, 'ভোঁ বাজা' সম্পর্কে (Semantics) চেহারার দিক দিয়া : মাছি (Splitpin) দিক। আবার বাঙলা করা হইয়াছে— যেমন eccentric—আঁশ পাট, proscenium —কপালি)

আর কৃষ্ণকমল বাবু জ্ঞাত করিলেন যে, 'পর্ব্বতের শীত বাত হু হু শব্দ করিয়া আমার মুখে লাগিয়া দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে লাগিল। আমি এই অচেতন পদার্থের বারণ না শুনিয়া রাজকুমারীর জানালায় উঠিলাম।' এই মানুষ কি বহু দিবস এই মরদেহে বাস করে! যে অচেতন পদার্থ শুনিতে পাইত—আ! কি বা মানুষ্য রূপ : '…যে অবশেষে আমি তাহার দেহ সমাশ্রিত করিয়া স্থানের পরিচয়ার্থে মল্লিকার চারা বসাইয়া দিয়াছি' এখানে সব শব্দই 'অচেতন পদার্থের' পদ অবলম্বন করিয়া আছে।

সুধীনবাবু তখন হাজরা রোডে থাকিতেন। কেহ জিজ্ঞাসিলেন তাঁহারে মহাশয় আপনি লিখেন : যে, "বন্ধু মহলে আমার লেখা দুর্ব্বোধ্য বলে নিন্দিত। হিতৈষীদের বিচারে সংস্কৃতে আর ইংরেজী ভাষার বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে আমি অস্পৃশ্য রচনারীতির জন্ম দিয়াছি, বঙ্গ ভারতীর নাট মন্দিরেও সে হরিজনের প্রবেশ নিষেধ ; এবং আত্মনির্ভরের অভাব বশতই আমি যে কালে গুরুজনদের ভর্ৎসনা ভাজন. তখন ওই অহেতুক অপবাদকে অমূলক বিবেচনায় উপেক্ষা করা আমার সাধ্যাতীত।' এখানেতে অনেক পদ আমাদের সরল করণে বাধা দিয়া থাকে ('আত্ম নির্ভরের' পরে 'অহেতুক অপবাদকে' পরেই 'অমূলক') তবে ইনি সুধীন বাবু যিনি, নিরন্তর বাঙলার জন্য চেষ্টা

করিয়াছেন, উত্তর করেন নাই।

কেন প্রয়োজন হইতেছে! কবিতা সকল প্রাকৃতিক ভাবনা ও প্রেম বা স্বভাব ও নীতিজ্ঞান হইতে তত্ত্বজ্ঞান যে এবং ঐ তত্ত্বজ্ঞান হইতে এখন নিপীড়িতদের কথা, গল্পো, নারী নির্যাতন প্রবন্ধ সকলই বিজ্ঞান হইল। আমাদের বর্ত্তাইবার কথায় ব্রহ্মবান্ধব, চন্দ্রবাবু, নলিনী গুপ্ত, ব্রজেন শীল মহাশয়, ইহারা বলেন মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে—কৃষ্ণকমল বাবু শব্দের কথা বলিয়াছেন যথা—ভিত্তিহীন ইত্যাদি অর্থ বদলাইয়াছে।

পেট কাটা ব আর নাই 'ব'এর উচ্চাণ করে আমাদের স্বরস্থান হইতে তাহার বিশেষতঃ লইয়া অদৃশ্য হইয়াছে, তেমনি যুক্তাক্ষর অনেকগুলি—হ্ম, স্ম আবার হ্ন, হ্ব।

এখন আমাদের পক্ষে উজাইয়া যাওয়া সম্ভব মোটেই নহে—আমরা বাচন-রীতি (idiom) দিকে যাইতে পারি।

কিন্তু এই রচনারীতিতে যদি শাস্ত্রীয় তত্ত্ব শব্দ—বাউল গীতে যাহা, যাহা নিজস্ব, আকছার—তবে তাহা বেপট হইয়া থাকে! কিছুদিন পূর্ব্বে কোন কবিতাতে এইরূপে 'আলো' শব্দটা ব্যবহার দেখি, এখনো আলো শব্দটি উপনিষদ তত্ত্ব ও বাইবেলীয় সূত্র আছে। আমাদের ব্যক্তিগত ধারণায় তাহা লাগসই হয় নাই। বাচন ভঙ্গী বলিতে আমাদের নিজস্ব বাস্তবতা বোধ—যাহার দ্বারা আমার চেতনাকে অভিব্যক্ত করিবার কথাই বুঝাইবে, অতএব বাচন ভঙ্গী বলিতেই দেশজ চিন্তা ধারাই সিদ্ধ হয়।

ভাব যদি না থাকে, তবে কম্পন সৃষ্টি করে না, শব্দ কম্পন সৃষ্টি করেই—তাহা নির্ঘাৎ ভাববাচক। এবং মধুসূদন বলিয়াছেন,

কে কবি—কবে কে মোরে। ঘটকালি করি
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দামী!

এবং জানাইয়াছেন: Over refinement is as destructive of beauty as a total absence of it... On Poetry—M. S. D.)
আমাদের এখানে 'ঘটকালি' শব্দটি মনে রাখা প্রয়োজন: যাহা সাধারণত, প্রথম হাত তাহা পরের মিলের সময় মাত্র—একের ভাবনা হয়।

মাধবায় নমঃ জয় তারা—জয় রামকৃষ্ণ।

আমরা আমাদের সব কিছু বিষয়কেই একটা সম্পর্কে লইয়া যাই—বিচার করিয়া থাকি ; ঐ সম্পর্ককে কতখানি আপনার করা যায়, তাহারই চেষ্টা মন ও যুক্তি লইয়া সাধারণত স্বভাবত কাজ করিয়া থাকি। আমরা বিশেষত নৈতিকতা লইয়াই কাজ করি যখন গল্প লিখি, তখন ঐ নৈতিকতা খুবই সমাজিক ভালমন্দ! কবিতাতে, ঐ নৈতিকতার সহিত আত্মার যোগ খুবই নিকট—আনন্দ!

এখন ইহাকে ফুটাইয়া আমরা কেমনে তুলিব, বা আমরা কেমনে ঐ লেখার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিব—কেননা আমাদের একজন মহৎ সমালোচক বলেন, বাল্মীকি ফুটিয়া রামায়ণ। এমন সত্যটি আর কেহ পায় নাই। আমাদের অভিজ্ঞতাকে অনুভবকে কি প্রণালীতে বিস্তার করিব। যাহাতে পাঠক বা শ্রোতা অনায়াসে তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে—বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং নিজে হদিশ করিতে সক্ষম হইবে যে সে কোথায় আছে।

কোন কিছুতে আরাম হওয়ার আঃ! বলিলাম ; কখনও সুন্দর লাগিল বলিয়া আঃ! ইত্যাকারে বহু আওয়াজ করে সেই ভাব অনুকারাত্মক অক্ষর বসাইলে, কোনটি সুন্দরের কোনটি আরামের বুঝা যাইবার নয়। কোন আঃ যে কোন বিশেষ অনুভবের কি রূপে নির্দ্দেশিত হইবে ; এখন একটি বড় অক্ষরটিকে ছোট লিখি তবে উহা বোধক হইবার! এবং সেই সেই এর বিশেষত্ব লইয়া উজরিব। এখন বিশেষত্ব সেইটির মিশ্রিত হওয়ত একটি হইবে!

সব থেকে আমাদের বিস্ময় লাগে তখন যখন একটি বিজাতীয় অর্থ, যাহা একটি শব্দের, কেমন করিয়া মানুষ গ্রহণ করে! যেমন মন কথাটা আমরা জানি : ইহার চরিত্র প্রকৃতি আমাদের নিখুঁত ভাবে জানিয়াছি : হঠাৎ একদিন ঠেক্ লাগিল! রেলে কালনা হইতে আসিতেছি, এক ভিখারী বৈরাগী গাহিতেছিল :

'এক মন ওজন যাহার সেই চলবে নিতাই চাঁদের বাজারে —

এখানে ওজন শব্দটিতে এই মন সেই মন নয় যাহা মানুষের অন্দর। এই মন কোন পথ ধরিয়া, যদি তকাশ্রয়ী হয়, আমাদের বুদ্ধিতে প্রবেশ করে ! গীতের অর্থ হইতেও আমাদের অবাক করিল আমাদের বৃত্তি (!) ; মন শব্দটি হাট মাট ছাড়িয়া মুহূর্তেই অদ্ভুত মনোরমত্বের রূপ ধারণ করিল।

এখানে 'পান' (ইংরাজীশব্দ) কথাটা অনেক সময় বেশ কাজের হয়।

অনেক বিদগ্ধ ঐ পদ্ধতি সূক্ষ্মতা দস্তুর মত অবহিত আছেন : তাহারা এক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তুকে সুদারুণ যুক্তিসহ ফের সম্যক দিতে পারেন ! যাহাতে আমরা এক সৌন্দর্য্যের বর্ত্তমানতা উপলব্ধিয়া থাকি।

আমরা সেই চাতুর্য্য কৌশল যাহারা জানি না, অর্থাৎ যাহাদের নিজেদের অন্তত বাহির বিষয়েতে কোন হিসাব নাই, তাহারা, কেমন তরিখা অবলম্বনে সেই সত্য পালন করিতে আছি দেখা যাক্ : এই সূত্রে আমরা যদি আলোচনা করি ত বেশ হয়।

আমরা দেখিব সচরাচর যে শিল্পীরা তাহাদের বিষয় বস্তুতে (মোটিফ।) ম্যাপিং পদ্ধতিতে রঙ দিয়া থাকে, সেখানে ছবি তথা আরোপিত বস্তু লাইনের প্রকৃতি হইতে, স্থান বাচকতা হইতে, আর কিছুই খেলিয়া উঠিতে পারে না। অনেক অংশে সঙ্গীতের যেমন নিপটত্ব মারা পড়ে বিভিন্ন পর্য্যায় স্বর লাগাইলে, তেমন ঘটিল।

সঙ্গীতের রহস্য আরও বিস্ময়কর ; সকলে বনেতে যখন বিবিধ পাখীরা ডাকে, উঠা পড়া বা ছন্দের কোন সুসংযত ব্যবহার নাই, ইহা বিরক্তিকর। এখন আমরা যদি সেই বনস্থলী হইতে দূর যাই, তখন দূরেতে সেখানকার কলরবে এক মাধুর্য্য সূচিত হয় ; এই দূরত্ব এবং স্বরভেদ তারতম্য দুই লইয়া গায়ক তাহার গীতকে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন করিয়া থাকে ! ইহা আমাদের ভাবনা !

ছবিতে আমরা প্রায়শঃই ঐ ম্যাপিং পদ্ধতি কাজে সমগ্রতা চোট খাইল, এদিকে দেখনসই একটি সংস্থান খাড়া করা হইয়াছে, অথচ সেইগুলির বেদ বা ডাইমেনসন কিছুই খোলাতেই নহে—কেন্দ্রত্বর কথা এখন বাদ দিতেছি না ; অনেকে ডাইমেনসন কর' বুদ্ধি লাভ করে না। কতটুকুতে তাহা বিকশিয়া তথা ওতঃপ্রোত হইবে, তাহা খবর করিতে পারে না !

অবশ্য এই সূক্ষ্ম খবর তখনই আমাদের কজাতে আসিবে যখন সমগ্র করণের পারদর্শিতা আছে ; ঐটি ছবির আদত মেজে বা সমতল। এখন উহা এক

বিশেষ আলোর ও কালোর ঘটা নিশ্চয়ই, যাহারে ধরিয়া সকল, ছবিতে আরোপিত যাহা, বস্তু ফুটিয়া উঠিল। এখানে রঙের ব্যবহার ও বস্তু সবই আর এক ছাঁদের হইয়া যায়—বাস্তবতাকেযদ্যপি তাহা আপাত ভাবে ছুঁইয়া থাকে।

এখন তর্ক এই ঐ যে অন্তর্নিহিত, না থাকিয়াও আছে, যে আলো কালো মিশিয়া নিপটত্ব তাহারে ফুটাইতে যে সকল বাচকতা বা বস্তু তাহা কি নিখাদ আপনকার প্রকৃতি লইয়া ঐখানেতে আছে—১৮ শতাব্দী হইতে ঈদৃশ ভাবনা, ফরাসী শিল্প গোষ্ঠীকে খুবই আতান্তরে ফেলিয়াছে; কোন শ্রেষ্ঠ মনীষী হদিশ দিলেন এক শিল্পীকে যে 'সুরসত্তাস' বস্তুর সারে পৌঁছাইতে হইবে! কবিদের কহিলেন তেনেব্রক্‌ করিতে (তেনব্র মানে আঁধার) হইবে, অর্থাৎ কুহকময় করিতে হইবে। ইনি দিদেরো।

এখন ছবিতে প্রতিফলিত যাহা তাই এখানে, বিচারে আসিবে, উপলক্ষ্য প্রতীক বলিল কি না। কিন্তু ইহা ত সরঞ্জাম, কাঠের বিড়াল! যুগপৎ ইহাও খটকা লাগে যে ইহা অর্থ ঐ সবে ত অদৃশ্য একটি উপস্থিতির হদিশ দিতেছে।

সাধারণত আমরা যথার্থ উক্ত বিচার মানিয়া কাজ করি না; এখনও ম্যাপিং পদ্ধতিতে আমরা ধাঁধাইয়া আছি; এই তরিখায়, এখানে একটি ঘটনা আপনা হইতে স্বীকৃত যে আমরা লাইন সম্পাত করিতে লায়েক আছি. প্রতি বস্তু এক বিশেষ সংস্থানের মিমিত্ত হইলেও, ঐ ম্যাপিং জন্য আলাদা হইয়া রইল। শুধু যে ফ্রেমের সত্য লইয়া সেইগুলি একত্র আছে।

ইয়েরোগ্লিফিক ভাব প্রকাশ আমাদের বেজায় ফাঁকড়াতে লইয়া যায়; ইহাকে প্রতীক বলা হয়, অবশ্য অক্ষরও প্রতীক; এখানে এমন অনেক আরোপিত চেহারা আছে যাহার বাস্তবতা যথাযথ আছে—অতএব বিশেষ মনোভাবের প্রকাশের একেক মাত্র। এইরূপ সবক্ষেত্রেই হয়—যেমন শ্রাদ্ধতে, হিন্দুগণের একটি পারলৌকিক কর্ম্মানুষ্ঠান! দর্ভময় শব্দটা বিরাট যুক্তিবিবেচনার ক্রমে যাহা।

এখানে আমাদের ইয়েরোগ্লিফিক একেক বড় ভঁাতে নিক্ষেপ করে, বিশেষত ঈজিপ্তীয় (চৈনিক নহে) আমরা ভাবি ঐ আঁক আমাদের, কত না রহস্যের নির্দ্দেশ দিবে, রামঃ কোথায় খুবই হেঁসেলের কথা।

সঙ্গীতে সুরটাই প্রতীক, বাণীর বাস্তবতার সহিত তাহার যোগ থাকে, উহা আমাদের বিশেষ এক মানসিকতাতে লইয়া যায়, ঠাকুর বলিয়াছেন কথা

ইসারা বটে! অর্থাৎ প্রতিটি শব্দ আমাদের জানা, এমনও যে ঐটির যথার্থ ধারণা নাই।—এখন ঐটিকে সুরে লাগান হয়, লাগা মাত্রই এক প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন শ্রোতার দেহে আলোড়িত হয়। অবাক এক মৌন (!) চকিতে উদ্ভূত হইল।

হবির কথাতীর্থ নিবাসী আমরা।

এখানে কথা অর্থই ভাব! কেশববাবু পড়িলে আমরা পরমাদ্ভুত এক সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ পাই! যথার্থ ঠাকুর যেমন সাদামাটা শব্দে সুদারুণ তত্ত্ব সকল বুঝাইলেন তেমনই কেশববাবুও—কেশবাবু কাব্যময়তা অলৌকিক। যেমন, হৃদয় আমাদের ঝামা হইয়া গিয়াছে।

এখন ঐ স্বীকারোক্তি অনুসোচনা, খাঁটি রক্তমাংসর এবং তাহা হইয়াও নৈসর্গিক চেহারা লইয়াও উহা আধ্যাত্মিক। বিশেষত যখন তিনি বলিলেন, হে মাতঃ গীতি যাত্রা করি।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করার আছে যে, বাইবেল কেশববাবুকে খুবই অনুপ্রাণিত করিয়াছে তথাপি দোষ দেখি না। আমাদের কাব্য ধারণা আবহমান আছে তাহাতে নাড়া পড়িল মাত্র, ভগবান ব্যতীত কবিতা হিসাব মাত্র। এই আলোড়িত উচ্চ কাব্যাদর্শতেই কেশববাবু সকলকেই উজ্জীবিত করিলেন; ঐ কাব্যধর্ম্ম তাঁহার প্রবর্ত্তিত। এখন আমরা নিশ্চয় করিলাম ঐ আকছার ব্যবহৃত শব্দগুলি আমাদের এমন এক কম্পন দিল, যাহা অন্যতে মেলা ভার, এইগুলি প্রতীক! কখনও বিশেষ্য কখনও বিশেষণ!

আমরাও তেমনই কতকগুলি সূক্ষ্ম অনুভূতি মনোবৃত্তিকে লইয়া তথা বিশদ স্পষ্ট করিতে গিয়া নয়ছয় করিতে আছি। এখন দেখা যাইবে, সাধারণত যে সব সাময়িক ব্যাপার ঘটে, তাহাকে পটস্থিত করিয়া সেই মনোবৃত্তিগুলি চারাইয়া তোলা। নাটকীয় করা!

কতকগুলি টাইপ-চরিত্র এখানে বিস্তার হইতেছে: ষড়রিপু ও নৈতিকতা লইয়া বৈখারী। এমন চরিত্রকে লইয়া অতি সূক্ষ্ম চাতুর্য্যে বিখ্যাত লেখকরা কাজ করেন—আমরা তাহার তরিখা ধারণাই করিতে পারি না। আমাদের হাত হইতে যখন তাহা ঘাটে, তখন যাত্রাই ব্যাপার হইয়া যায়। ঐ সব চরিত্র এত জনপ্রিয় হয় যে, যে কোন লোককে আমরা সেই চরিত্রের নামে সনাক্ত করি, যখন দেখি সেই চরিত্রের মতই আমাদের লোকটির কিছু গুণ আছে। ইহা রূপক! অন্তত আমরা ভাবি।

তেমনি উঠিতে বসিতে, আমাদের শারীরিক স্ফূর্তি হইতে যাবতীয়

ব্যবহারে আমরা এমন রূপক ব্যবহার করি। আঃ ঠিক স্বর্গ। আঃ প্রসাদ! লক্ষ্মী। উপমার সহিত ইহার কতটা তফাৎ তাহা এখানে আলোচনার নহে: প্রসঙ্গত ডঃ জনসন বলেন সিমিলি কিছু উদাহরণ দেওয়া নহে।

এখন আমাদের প্রশ্ন রূপক ও প্রতীকে কতটা তফাৎ।

শ্রীমদ্ভাগবতে বহু প্রতীককে ব্যাখ্যা করা আছে; ঈজিপ্তে একটা নৃত্য ছিল, ইহা মণ্ডলাকার হইতে—উহা সৌরলোকের প্রকৃতির প্রতীক। আমরা মেয়েদের হাতে যে নোয়া শাঁখা দেখি তাহারও একটা এয়োস্ত্রী চিহ্ন ব্যতীত মানে আছে। আগেতে, বাড়ী তৈরী করার সময় দেখা যাইত, একটি লম্বা বাঁশের আগায় একটা ভাঙা ঝুড়িতে ঝাঁটা ও ছেঁড়া জুতা রাখা হইত। মাতাপিতা বিয়োগের পর এক খণ্ড লৌহ ধারণ করে। কত যে তুকতাক আছে তাহাকে লোকে প্রতীক বলিয়া চালায়।

আমাদের দেশের দেব-দেবী এক বিরাট প্রতীক তত্ত্ব, এই সকল মূর্ত্তি ভাঙ্গা যেমন, মূর্ত্তিকে মিথ্যা বলা যেমন কুৎসিত তেমনি, ইহার অর্থান্তর এখাকার মনোভাবে শাসক ও শাসিত দাস—কত বিশ্রী: যেমন:

'লেখক দেখিলাম নানা ঐতিহাসিক তথ্য এবং যুক্তি সন্নিবিষ্ট করিয়া একটি কথাকে খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এই যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণে বর্ণিত যাগ-যজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠানের বিরোধী রাক্ষসগণ হইল আসলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিদেশী শাসক শক্তি।...

ইহার পরে একদিন একটি বিশেষ পরীক্ষার বাঙলার কাগজ দেখিতে বসিলাম দেখিলাম লেখক কৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ণিত কৃষ্ণ কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিষয়ীকৃত রূপ নহেন, মানবীয় প্রেমেরও মূর্ত বিগ্রহ নহেন,—তিনি হইলেন চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে বাঙলা দেশে প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাচারী শাসক ও শোষক শ্রেণীরই প্রতিভূ—শক্তিমান ক্রুর এবং কৌশলী অশেষরূপে প্রলুব্ধা, হীনরূপে অত্যাচারিতা এবং লাঞ্ছিতা এবং সর্বশেষে নিষ্ঠুররূপে প্রবঞ্চিতা রাধা হইল তৎকালীন নিরীহ অত্যাচারিত এবং প্রবঞ্চিত বাঙলার জনগণেরই প্রতীক।.. ...মনে হইল, রাধা-কৃষ্ণের এই সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্য মুখ্যভাবে দায়ী হইল কৃষ্ণ কীর্ত্তনের বড়ায়ি বুড়ী। শোষক ও শোষিত, অত্যাচারী ও অত্যাচারিত, বঞ্চক ও বঞ্চিতের ভিতরকার যে অভিনব, ক্রুর প্রেমাভিনয় তাহা কখনই জমিয়া ওঠে না যতক্ষণ আবার তাহার মাঝে একটি দালালশ্রেণী আসিয়া না জোটে; এই দালাল শ্রেণীর প্রতিভূ বড়ায়ি বুড়ী।

এই দালালের সাহায্যে কৃষ্ণ রাধাকে কতবার কত প্রলোভান দেখাইয়াছেন। সাহিত্যালোচনায় ইতিহাস-চেতনা, 'ঘরে বাইরের' ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ॥

অবশ্য ভগবান যে আমাকে যেরূপে চাহে আশ্বাস এখানে খাটে না, কেন না ঐ দুইটি অবয়ব আর এক ছবি হইল।

এখানে নিশ্চয় ছোকরাটি, মানুষের বা যাহারা ঐ অন্ত প্রাণ তাহাদের ভুল ভাঙ্গাইতে প্রয়াসিল ; এখানে ভাবিতে স্বভাবতই মন করিবে যে, আজুকে গো বাঁশরী বাজায়! এত কভু নহে শ্যামরায়॥ এই হৃদয় আবেগটির কি দশা হইবে ; অথবা – চলে নীল সাড়ী নিঙাড়ি নিংড়ি পরাণ সহিত মোর !

ছোকরার অর্থান্তর যাহাই হউক তবু কিন্তু ঐ দুটিরূপ আমাদের সামনেই আছে ; কোন কিছুই খোয়া যায় নাই ! ছোকরাতে কালা পাহাড়ীত্ব নাই ! সে কোন ছত্রে ঐ বর্ত্তমানতাকে খাট করিতে স্বপ্ন দেখে নাই ! ছোকরা কহে নাই রাধার ভাবে যে কৃষ্ণ বঙ্কিম ইহা ভুল ; সখি সে কেন আবার চূড়া বাঁধে ও যবে শুধুই রূপে নয়ন ভুলে, সে কেন আবার—এই চূড়া মুছিয়া দিতে চাহে নাই ! সবই রাখিয়াছে। উহা আমাদের জিজ্ঞসা সূত্রে, ঐ পুরুষ প্রকৃতি আর এক প্রতীক হইল। আদতে আমরা ঠাকুরের নিকট হইতে জানিয়াছি, যে,··· যোগমায়া অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির যোগ। যা কিছু দেখছ সবই পুরুষ প্রকৃতির যোগ শিবকালীর মূর্ত্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এই সমস্তই পুরুষ প্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের যোগ প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির মানে ঐ। ঐ যোগের জন্য বঙ্কিমভাব। সেই যোগ দেখবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা, শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর। শ্রীমতীর গৌর বরণমুক্তার ন্যায় উজ্জল। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ তাই শ্রীমতীর নীল পাথর আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতী নীলবসন পরেছেন। (পৃ ১২৯ শ্রীম কথিত)

জ্ঞানযোগাদি দ্বারা শ্রীভগবানের বিশেষ বিশেষ শক্তি সমন্বিত আবির্ভাবের অনুভব হয়, কিন্তু ভক্তির দ্বারা তাঁহার পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি সমন্বিত স্বরূপের অনুভব হইয়া থাকে। তাঁহার একই বিগ্রহে অনন্ত রূপে প্রকাশ হয়।

ঐ অনন্ত রূপ প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। উক্ত তিন ভাগ যথা স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ রূপ। এবং এই সকলের এক একটির বিভিন্ন পর্য্যায় বা রকম আছে।

আমরা যে বলিয়া থাকি, গদ্য, পদ্য, ছবি, গীত এখন সরল মনেতে ইহা উঠে যে, ঐ সব নিজেই চাতুর্য্য কৌশলগুলি প্রতীক করিবার এক এক উপায়। প্রতীক না যদি হয় তাহা হইলে লোকে ভাবিতেও পারে না! কি নৃশংসকাণ্ড, কি মমতা, ঝগড়া, সামনে যাহা ঘটিতেছে এবং যাহা বেশ কিছু লইয়া—বলা বাহুল্য, তাহা সঙ্কুচিত হওয়ত একটি শব্দ—অবশ্য যেহেতু একটি বিশেষ মনোবৃত্তির হইতে উহা ঘটে। ঐ ঐ শব্দে সে শ্রোতা, আপন অভিজ্ঞতা মত উহা গ্রহণ করে।

পাশ্চাত্য দেশে, এই প্রতীক বিষয়ে অনেক তর্ক ও সিদ্ধান্ত আছে; দেখা যাইবে অ্যাকুইনস লিখিয়াছেন, লেখা মাত্রেই দ্বিবিধ মর্ম্ম থাকিতে পারে: ইহা ইতিহাস বিষয়ক বা সাহিত্যগত এবং আধ্যাত্মিক—ইহা তিনটি পৃথকভাবে বিভক্ত হয়, আলেগ্যারিক, (স্পেনসার ফেয়ারী কুইনের ভূমিকাতে এ্যালিগরীকে 'ডারক কনসিট' বলিয়াছেন।) মরলে, আনাগজিক। (ত আ সোম—খণ্ড ১, ১ম অধ্যায়)।

মোলিতর চারি, সাঁস, তথা মর্ম্মর কথা নির্দ্দেশিয়াছেন: সাহিত্যগত, আলেগরিক, প্রতীকতত্ত্ব, আনাগজিক। এই প্রতিটি ধর্ম্মই একটি কথাতে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে এবং সেই কথার আদ্যক্ষর দ্বারা পুনঃ একটি শব্দ গঠিত হইয়াছে: পারাদি বা পারদে। Paradis on Parades—এখন আমরা জানি, যে হেব্রু ভাষাতে স্বরবর্ণকে অক্ষররূপে নির্দ্ধারণ করা হয় না। Pashut, Ramnes, Derath, Sod, এক এক মর্ম্মকে এডেন উদ্যানের চারিটি নদীর নামে নামকরণ করা হয়। দান্তের বিশ্বাস একই, তিনি উক্ত চারিটি মর্ম্মর উপর জোর দিতেন (It convitoi) ভাজ্জিলে যদি ঐ সকল গোপন মর্ম্ম তিনি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেন তাহা হইলে গুরুরূপে মান্য করিতেন না।

এই সকল তত্ত্ব আমরা ল্যু য্যকৃরে দ্য লা সিভাল্যরই ভিকৃতর এমিল মিস্‌লে লিখিত, নামক বই পাইয়াছি।

সব থেকে গত শতাব্দীতে, সিম্বল কথাটা খুবই সকলকে ভাবাইয়াছে; ক্রমে অনেকেই উহাকে 'সিগ্‌নিফিকানট ফরম' রূপে বিবেচনা করিলেন। প্রসঙ্গত ইহা পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট চিত্র তত্ত্ব। ছবির ভাবনা সকল বিশেষত ১৮ শতাব্দী হইতে সাহিত্যে সাঁদ করিয়াছে, আবার সাহিত্যর অনেক ছাঁদ ছবিকে যুক্তি দিয়াছে। যাঁহারা একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য ধারণাতে বর্ত্তাইতে আছেন, তাঁহারা ঐ তত্ত্বর কোন সার্থকতা পাইলেন না; ক্রেম আছে, তবে যে কোন

কিছু যে ছবি হয় না তেমন সত্য তাহারা বুঝিলেন না। নব্যরা পুরাতন 'পরিপ্রেক্ষিত' শব্দটিকে লইয়া চুলচেরা বিচার করিলেন। এখানে একটি মজার খবর বলা যায়, একবার সেজানকে কোন সমালোচক আঁকা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, সেজান উত্তর করেন, আমি মনুষ্যকে (অবয়বকে) বোতলের মতন দেখি, ইহা শুনিয়া সমালোচক পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বোতলটাকে কিসের মতন দেখেন।

এখন আমাদের মনে এইসূত্রে এতাদৃশ কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক, যে abstraction এবং উৎপ্রেক্ষা তথা রূপক ইহাদের প্রয়োগ বা ভাবনা কেমন করিয়া, কোন মুহূর্তে, কোন ক্ষেত্র সূত্র ধরিয়া আমাদের মনে সাঁদ করে বৃদ্ধি হয়! এবং ইহা ঐগুলিকে কি প্রতীক বলিতে বিবেচনা দাঁড়াইবে।

প্রতীক সর্ব্বেব রূপে একেক তাত্ত্বিক করিতে মহা গভীরে লইয়া যায় যেখান হইতে সেই এক ঐ বাহ্যিকতা কে পরিত্যাগ করিয়া নিহিত অর্থে পৌঁছায়। সেই এক প্রত্যক্ষভাবে ঐ চাতুর্য্যে অপরোক্ষভাবে স্বীয় ক্ষমতা তথা গভীরতা দর্শনে আনন্দিত হয়।

ঢোক্‌রা কামার

বাংলার জাতিতত্ত্বে উল্লিখিত অষ্ট কামারের মধ্যে এক কামার 'ঢোক্‌রা'। ইহা ব্যতীত সেক্‌রা, চাঁদ-কামার, লৌহ-কামার ও অন্যান্য আরো কামার আছে।

যাঁরা হাওয়া বদলাতে সাঁওতাল পরগণা যান, কিংবা যাঁরা, যাঁদের বাড়ি লালমাটির দেশে যথা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন—যে ধান মাপার পাইগুলি অথবা কুন্‌কে পিতলের হয়, এবং হাট-বাজারে দেখা যায়। কাঠের যে হয় না, এমন কথা আমরা বলছি না; কিন্তু পিতল নিয়েই আমাদের কথা।

এই পিতলের কুন্‌কে অথবা পাইগুলি ভারী সুন্দর দেখতে। এর আকারটা বাটির মতন, ঠিক এমনি আকারের নিত্য প্রয়োজনীয় বাসন কোসন আমরা সাধারণত ব্যবহার করি না, তাই অনেক শৌখিন লোকের কাছে এর চেহারাটা ভারী আনন্দদায়ক। তাঁরা এগুলি খরিদ করে বাড়ি নিয়ে আসেন এবং আর পাঁচ শৌখিন জিনিসের সঙ্গে খুব যত্ন করে রাখেন। বন্ধুবান্ধবরা তারিফ করেন। অনেক বিদেশীও এগুলি কিনে নিয়ে যায়।

পাই-এর ধার ঘেঁষে, বেড় ঘিরে, বহু নকশা থাকে—মাছ থাকে, জোয়ারের জলরেখা থাকে, ঢ্যাড়া-কাটা, দাঁড়ি-কাটা অনেক জ্যামিতিক রেখা থাকে। দেখে মনে হবে—ওইটুকু ব্যাপার করতে বহু ভাবতে হয়েছে, অনেক চিন্তা এর পিছনে রয়েছে। মাছের চিহ্ন ভারী লক্ষ্মী। মাছ-চিহ্ন অনেক অনেক জায়গায় দেখা যাবে, এমনকি 'ত্রিরত্ন' প্রতীকের দু'টি দু' পাশে মাছ আমরা দেখেছি। মীন অবতার বহু ব্যাপারে রয়েছে। এখানে, সত্যি বলতে, মাছ-চিহ্ন প্রতীক হয়ে নেই। যেমন সুন্দর সুন্দর আঙুলের চুটকিতে পলকাটা রুপোর মাছটি থাকে, তেমনি শুধু পলাতক-ভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত ভঙ্গীটি এখানে গোটা মাছটির মধ্যে রেখার জোর বাঁধনে দেশ বা স্পেস্‌ হয়ে দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সেই ভঙ্গীটি আপনা থেকেই এসে যায়। সোজা হক হলেও, মাছটি মনে হবে যেন কিছু বাঁকা—খুব সোহাগ করে মাছটি বসিয়ে দিয়েছে।

পাই-এ যে ধরনের কাজ, ঠিক অবিকল সেই ধাঁচের কাজ করা বহু সামগ্রী

দেখা যাবে। গৃহস্থের নিত্যপূজার ঘট থেকে সুরু করে রকমারি প্রয়োজনীয় জিনিস এই রীতিতে তৈরি। দেবদেবীর মূর্তি, কাজললতা, প্রদীপ ইত্যাদি।

পৌষ মাসে যখন ধান কাটা প্রায় মাঠ থেকে খামারে উঠে আসে, মাঠে মাঠে যখন গুড়ের ভাটি বসে—বোল্‌তা মৌমাছি ভারী ব্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করে, বদ্‌রাগী শব্দ উত্থিত হয়। তখন গ্রামের বার সীমানায় ভাটি জ্বালাবে ঢোক্‌রারা—বুনোরা। এরা ছেলে-পুলেদের কাছে খুব অবাকের বিষয়। এদের কাঁধে বড় থলি, কখনো ঝুড়ি কাঁধে বা বাঁকে। বাঁকে অনেক এটা সেটা। কখনও কখনও মনে হয় এরা ভেল্কী দেখায়, যাদু জানে।

লোকগুলো যেন রোদের দিকে চাইতে জানে না, জুজু হয়ে রয়েছে। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে, হাঁকে না। গৃহস্থরা এদের চেনে, তারা বলাবলি করে "সাত সকালে ঢোক্‌রা কেনে গা?" ঢোক্‌রারা অপয়া নয় বটে, তবু লোকে ওকথা অভ্যাস মত বলে থাকে। যার দোরে দাঁড়ায়, তাদের পড়শীরা ভাবে, বরাত দেবার ছলে গৃহস্থ তৈজস পত্তর বেচ্‌ছে, যারা এ হেন কথা ভাবে তাদের দোষ দিব কি সাহসে, সময় বড় এলো হয়েছে। বয়াটে ছোক্‌রা যারা, যারা 'সাত গাঁয়ের ভোমরা এ গাঁয় কেন হায়' গান করে—গানটা ঝুমুরে বাঁধা—যারা গাঁজা সবে ধরেছে, তারা বাড়ির ঘটি বাটি ছেনতাই কোরে, চুরি কোরে, ঢোক্‌রাদের কাছে বেচে দিয়ে—খেজুর গাছ তালাগাছ ডাকে। তাই বটে গৃহস্থদের ভয়।

কিন্তু আবার তখুনি খরপায় বউটি পাশের বাড়ির বৌ-ঝিকে বলে—"ও সই সইলো, ঢোক্‌রা গো, হিঁ গো, কাজললতা দিবে মন করেছিলে—ইসছে গো ঢোক্‌রারা।"

বাড়ির গিন্নী—"হি মিন্‌সে পারবি, একটা ননীচোরা গড়ে দিতে।"

ঢোক্‌রারা উঠনে ক্রমে ক্রমে যায়, দেহে একটা সুস্থির পাক দিয়ে থলি নামায়। ঝুড়ি বাঁক নামায়। প্রথমেই বলে—"একটা আগা দেন্ না গো, চুটা খাব।"

এখনো এরা বুনোদের মত চুটা খায়, হুঁকো-কল্কে জিনিস এদের কাছে বড় অদ্ভুত। তা দেখে কতবার এরা যে মুচ্‌কি হেসেছে তার ঠিক নেই। এদের হাসিটা যে মুচ্‌কি হাসি, তা ভিন্ন জেলার লোক বোঝে না। শালের জঙ্গলের মধ্যে হলে, তখন বোঝায় এটি মুচ্‌কি হাসি। এরা যে নিমবুনো। এদের মধ্যে কেহ কেহ মৌজার পর মৌজা পার হয়ে, রেল বিজ্‌লী আলো দেখেছে, লরী

চেপেছে। আবার জানি না, হয়তো এদের অনেকে আজও কোঁড়া খায় স্কন্ধ খায়। আগুন হয়তো এদের শীত মানিয়ে জামা হয়ে গেছে।

গেরস্তরা একটু আগা এনে দেয়, এরা ট্যাঁক থেকে একটু কালো তামাক পাতা বার করে, শালপাতায় জড়িয়ে টানতে শুরু করে, মেয়েরা খুক্ খুক্ করে কাসে, গা টেপাটিপি করে। চুটা মৌজ করে, থলি থেকে নমুনাও দেখায়। "এই লাও ননী চোরা গো—ও ধনি দেখ্ গো মদনমোহন শ্যাম" বলে ভক্তিভরে নমস্কার করে, যেন প্রসাদ দিচ্ছে—এমনই মনোভাবে তুলে দেয়। 'ননী চোরার' খর ছায়া সাঁৎ করে লালমাটির উপর দিয়ে ঘুরে উঠে যায়।

জীবন্ত না হলেও এ মদনমোহন বাস্তব। নবোঢ়া মেয়েটির হাতের তাল্‌ হলুদ—তার উপর ছোট্ট মদনমোহন এই সকালের রোদে কথা কয়ে উঠে। কি এসে যায় এর কাজের ধাঁচে, মনে হয় যেন একটাই সুতো সুরে ঘুরে উঠেছে, শেষ যে কোথায় হয়েছে তার ঠিক নেই। চোখ দু'টি আড় হয়ে আছে, মুখে একটি মোটাসোটা হাসি। গভীরতা আছে, প্রদীপ আলোতেও যা, দিনমানেও তাই।

ঢোক্‌রারা নাকি কথা বলে না। চুটার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, "লাও নয়ন ভরে দেখ্ গো, উজানের ভালবাসা ঠিক লাইনে যাবে গো ধনি।" এরা নিশ্চয়ই বাউল নয়, তবু যেন কথার পিছনে কোথায় যেন এক তারার আওয়াজ আছে বা? এই ছোট শালপাতার দোনাভরা রহস্যে মেয়েরা একটু কাছে ঘেঁষে বসে, শীত বলে নয়। ঢোক্‌রারা আবার জিজ্ঞাসা করে "পসন্দ হলো, কেমন কাজ গো, তবে যেন বড় দোষ ঘাট হয়েছে, কেনে? কেনে সোনার মানুষকে পিতলে গড়েছি? গঙ্গা শুকাবে গো, কি করি।" তারপরই কি যেন মনে পড়ল। "হায় গো রাধাসতী দেখালাম না গো। রাধা, ব্রজবুলি ঘন টান।" দু ফোঁটা জলের ইহকাল পরকাল। মদনমোহনের বাঁশি ধরার কায়দা যেমন অদ্ভুত, রাধার তেমনি আঁচল ধরার কায়দাটি। হাতটি চতুরভাবে ঘুরে গেছে, আঁচল তো আর কিছু নয় সোজা সুতোর মতন। যে কোন বড় বড় রাগের পিছনে যেমন একটি সহজ ঠাট্ থাকে। যাকে কিছুতেই তেমন-কান না হলে ধরতে ছুঁতে পারে না; তেমনি এখানেও দেখতে পাই, ধরার একটা ঠাট্ মাত্র জেগে আছে। হাতের আঙুলগুলো অনেকটা ব্যাঙের আঙুলের মত, ভারী ছেলেমানুষের আঁকা মানুষের হাতের আঙুলের মত।

এত সত্ত্বেও এ-দেহতরণী, আমার আপনার মতই, এতটুকু লাগলে যারা মাগো বাবাগো বলি।

গৃহস্থরা এদের দিকে খুব করে তাকায়, বুঝতে চেষ্টা করে ঢোক্‌রা মিন্‌সেগুলো কোথায় এত চতুর। গা থেকে মহুয়ার গন্ধ জেল্‌লা দিচ্ছে, খুব যে কখনও দেখাশুনো হবে এমন মুখ এদের নয়। কোথায় যেন একটা ছাড় ছাড় ভাব, আঙুলগুলো সুতকো-রোগে খাবার জড়ির মত। কোথাও ইঁদুর-ইঁদুর ভাব নেই। ঢোক্‌রা তখন বলছে, "চার ধামের পুন্নি হলো গো, মদনমোহন রাধা সতী এক ঠাঁই, শীল নোড়া বুকজুড়ে থাক্‌বে, ভেন্‌ন্ন হলেই পাপ—গো মা··! লাও বল।"

"হিঁগো, এগুলা তোমরা কেমন করে কর গো?"

এরা হেসে উত্তর দেবে—"আমরা লায়েক বটে, আমাদের ছ্যানা আছে গো···তোমাদের মত···।"

ওদিকে ধান ফুটে, বাষ্প উঠে উঠে মেঘ হয়ে যায়, আর সামনে শাড়ীর মোটা মোটা ভাঁজ, রেখা আঁকাবাকা, এ-হেন উক্তিতে হেসে দুলে ওঠে। এরা হাসে, মন ঠিক ঠিক বলে। এবার যখন আবার এরা 'ননীচোরা' 'মদনমোহন' 'রাধাসতীর' দিকে চায়, তখন তারা অবাক হয়ে থাকে। আড়ে বুঝে নেওয়া হ'ল যে ঢোক্‌রাদের হাতযশ আছে, তাই এই রূপগুলি আরও নিকট হয়ে উঠলো।

স্বপ্নের কথা যেমন ছাড়া ছাড়া, তবু সে কথা কত গোপনের মানুষকে আর একা থাকতে দেয় কই, গাছ পাতা, উড়ে যাওয়া খানিক রঙ সবই যেন ডাঙা ছেড়ে গেছে, কিছু নেই সামনে,—চাহনিতে! কম্পিত আধাভাঙা কথাগুলো, একটি অটুট দোহারা কলেবর নিয়ে দেখা দেয়। মেয়েদের হাতের ছোট ছোট বস্তুগুলি, তেমনি হয়ে উঠে। গানের কলিও হয়তো ভেসে আসে, "বাজন নূপুর" পায়। এখন আর কোন ধাঁধা রইল না, তুলসীর গন্ধও এই ঝঝ্‌ঝরে হাওয়ায় আসে।

এবার আবার থলি নড়ে উঠলো, হাত চালা সুরু হ'ল—এবার যা বার হয়ে এলো, তার সঙ্গে বাঙালীর জীবনের বুকজোড়া সম্বন্ধ। মেয়েরা ধন্য ধন্য করে উঠলো, আহা কি রূপ গো, সিঁথেরসিঁদুর বা এটি লক্ষ্মী প্রতিমা যেন। হাতে পদ্মটি পর্যন্ত রয়েছে। পদ্মর শ্রীটি অনেকটা ঈজিপ্‌সীয় লিপি ফুলেরই মত। অনেকটা কেয়া ফুলের পাতার মত হয়ে যাওয়া। চক্‌চকে পিতলের গায়ে

ঈষৎ টুনটুনি পাখীর পিঠের সবুজ আভা। সেই সবুজের ঠিক উপরে কল্যাণময়ী হাসি, এবং তারই অস্থায়ী আয়ত দুটি লোচন। ভারী আশ্চর্য রূপ তার। মা যেন বর দিতে পারেন। এ বাড়ির গিন্নী লক্ষ্মীর দিকে এক ভাবে থ হয়ে তাকিয়ে আছে, চোখের পাতা—ধান যেন বুলবুলি খেয়ে গেছে! গৈরিক রঙের ঘটের গা বেয়ে পাঁচটা আম্রপল্লব, অজন্তার রেখায় ভর করে নেবে গেছে, পান আছে, গুয়াও আছে। আর এয়োরা গুনতে বসেছে ধান দুব্বো হাতে। ব্রত শেষ হলেই, উলু দেবে এই বিবিধ। এই লক্ষ্মীকে দেখে গিন্নীর চোখ একটু লাল হয়, বহু দিনের এক অজর দীর্ঘশ্বাস ঠেলে দিল। এই দীর্ঘশ্বাসই আঁচড়ে-আঁচড়ে যখন দেখা দেয় তখন কত তার নাম, কখনো ইতিহাস কখনও বা কাব্য।

ঢোক্‌রা বলবে, 'ওগো পসন্দ হলতো বরাত দাও, দান, আর কি লবো? ক পাই ধান দিও।'

এবার দর দস্তুর। এত ভাব, এত মতি, ঝড়ে এঁটো পাতার মত উড়ে গেলো। "যা তো সেই খেত্তুরে (শ্রীক্ষেত্র) বাটীটা লিয়ে আয়, যা তো সেই ঘঁ্যাস (গ্যাস আলোর শেড অনুকরণে) বাটীটা লিয়ে আয় দেখি, কিন্তু এ সব দিয়ে গড়লে পাপ লেই ত?"

আগা সব্ব পাপ ভাগা, আগা খাটি করবেক গো" ঢোক্‌রারা উত্তর দিবে।

—কুলাবে তো গো?"

"হি গো, লথ পরা পেঁচা, দুল পরা হাতী, সব হবে গো। লাও, এখন দাও দিকি কিন্তু মাগো চার পইতে পোষাবেক লা গো, ছেনাপোনা আছে, লিজে পেট আছে, আর দুমুটা দিও গো। বলি, কত মশালা লাগে করতে, জননী তা বুঝলে, বলবে লাও আর ধান লাও।

"হি যে মোমটা লয়, ইটা জঙ্গলে যাই, চাক ভাঙ্গি তবে আসে গো, বনদুর্গার পূজা দি গো এক কলসী হাঁড়িয়া, লয় মহুয়ার রস, এক পাই চিঁড়া, সিন্দুর, আলতা, মুরগী। বুঝ, কত খরচ। যত খরচ তত দাম। শুধু তো মোম দিলেই যে হবেক তা লয়, বড় খাটালীর কাজ, তেল সিন্দুর লা (গালা) মিশাবে, পড়্‌তা আছে, তার'পর জঁাত পুঙ্গি ফেলি আয়স্তে আয়স্তে গড়বো আমরা—ঠাকুর গড়ি মিছাই বলব না গো। তোমার সামনেই করবো এখানে।"

"তাই হোক, পিতলের উপর নজর দেওয়া যাবে।"

আধ সেরই বাটির মত একটা মুচি এদের আগেভাগেই করা ছিল। মুচিটা

দেখতে ঠিক মনে হয় একটা মেয়ে কিছু গড়েছে—যার খুব হাত নেই। শুধু হাতে কুমোরে গড়লেই যে ভাল হত এমন বলি না, চাকের জিনিস আর এক রকম, বড় হাঁড়ী কল্‌সীর তলা যেমন এক বনেদের তেমনি নয়, আথল দিয়ে তাকে মোলাম করতে হয়। জোড় খাওয়াতে হয়। মুচিটা তারা রোদে দিলে, একজনা উনুন খুঁড়তে লাগলো, অন্যজন গেল আর দু চারটা মুচি তৈরি করতে। কারণ একটা যদি বেগাড় করে, তখন আর একটি চাই।

তৈরি মোম ছিল সেটাকে গালিয়ে, জাঁতপুঙ্গিতে ঢাল্‌লে। জাঁতপুঙ্গি জিনিস নেবু নিঙ্‌ড়ানো যন্ত্রর মতন, তলায় ছোট ছোট হাজার ছেঁদা, মোম ঢেলে উপরে জাঁতাটি বসিয়ে চাপ দেয়—হাজার হাজার সুতোর মত মোম বার হয়।

বালি মাটির কাঠামোর উপর সেই সুতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উঠোয়, হাত পা, চোখ নাক ঠোঁট সবই হবে। শেষে, তার উপর মাটি ছেনে পলেস্তারা দেয়, এইভাবে মোমের পুতল ঢেকে যায়, শুধু দুপাশে বা একপাশে থাকে নালিকাটা। তারপর রোদে এগুলোকে শুকোতে দেয়।

আগুন ধরিয়ে তাদের স্বরচিত ছাগলের চামড়ার হাপর দিয়ে খুব বাতাস দিতে থাকে। মুচিতে পিতল। আগুন যখন গনগনে, পিতল গলে ক্ষীর, এরা নুনের ছিটে দেয়, সোহাগা দেয়। তারপর সেই মাটি বন্ধ পিতলের ছাঁচ্‌টি আগুনে ধরে মোমটি গালিয়ে নালি দিয়ে বার করে নেয়। মোম বার হয়ে গেলে দু পায় চেপে ধরে পিতল ঢালে।

মূর্তিগুলো নরুন দিয়ে জট মারে, চিকন করে। তারপর গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে গৃহস্থদের জিনিস বুঝিয়ে দেয়।

ভারতে মাটির কাজ বহু পুরাতন দিন থেকে চলে আসছে। এগুলি একদার জীবনযাত্রার ইঙ্গিত। দলবদ্ধ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের প্রহেলিকা মৃন্ময়রূপে প্রকাশিত। ক্রমে মৃত্তিকাবিচার, ক্রমে প্রলেপ বিচার এলো। ফলে একটা স্থিরতা পেলো। এ দক্ষতা অনেক পুরানো। বাংলার পলিমাটি ও লালমাটি অঞ্চলে এ দক্ষতার নিদর্শন আজও দেখা যায়।

বাঁকুড়া অঞ্চলে একটি থানে দেবতাপ্রীত মানসে ঘোড়াগুলি উৎসর্গ করা হোয়েছে। ঘোড়াগুলি ইদানীংকালে খুব জনপ্রিয় হোয়ে উঠেছে। (সময়—৪৭ সেকেণ্ড)

বাহুলারা

(দৈর্ঘ্য ঃ ৩৮ ফুট, সময় ঃ ৩৫ সেকেণ্ড)

এইরূপ লোকশিল্পের কিছু দূরেই বাংলার বিরাট পোড়ামাটির মন্দির দণ্ডায়মান—বাহুলারা। এর গঠন ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মতন। এককালে নিষ্ঠা ও শিল্পদৃষ্টির সাক্ষাৎ পরিচয় দেয়। পার্বতী ভঙ্গিটি অপূর্ব। এটুকুর মধ্যে হিন্দু ভাস্কর্য্যের সমগ্র মূল সূত্র সেই অচিন্তনীয় রূপ কেমন কোরে ধরা পড়ল? ছোট ছোট মূর্তির সরলতা, তার গতি ও লীলায়িত ভঙ্গিমা আমাদের বিস্মিত করে।

গোপীবল্লভপুর

(দৈর্ঘ্য ঃ ১৫৬ ফুট, সময় ঃ ১০৫ সেকেণ্ড)

গোপীবল্লভপুরের মন্দির সুবর্ণরেখার তীরে বৈষ্ণবদের পুণ্য তীর্থক্ষেত্র।

মন্দিরের বহু ধরণের কাজ বর্তমান। এগুলি দ্বারপালআকারে প্রায় চারফুট। একাজের সঙ্গে বহু পুরাতন সুঙ্গ-রীতির বেশ মিল আছে। তখনকার কাপড় পরার ধরণ, রমণীদেহের সৌষ্ঠবে নয়নের সুস্পষ্টতায় মুখমণ্ডলের গাম্ভীর্যে কর্তব্যপরায়ণতায় প্রাচীন ধারণা মুখরিত। বহু উচ্চে স্থাপিত দুটি মূর্ত্তির মধ্যে পোড়ামাটির নিদর্শন হিসাবে এগুলি যেন কথা কয়। অপূর্ব কল্পনা—সরলতা সুঠাম অবয়ব এবং কি দুঃসাহসিক তার নির্মাণকৌশল। এদের ঋজুভাবের সঙ্গে ইজিপ্সীয় সরলতার মিল আছে।

মন্দিরের তোরণদ্বার দুই পার্শ্বে দুই মাতৃমূর্তি। একটি দুর্গা ও অন্যটি কালী।

বিষ্ণুপুর

(দৈর্ঘ্য : ৭৩ ফুট, সময় : ৫৬ সেকেণ্ড)

এ রাশমঞ্চের স্থাপত্য, আমাদের একাধারে আনন্দিত ও বিমূঢ় করে। মল্লরাজারা অত্যন্ত কৃষ্ণঅন্ত প্রাণ ছিলেন। এখানে এককালে নিয়মিত নামজপ হ'ত! তার নাম গোপাল সিংহের ব্যাগার।

ইঁটগুলি কখনও সঙ্গীতমুখর—বড্ড নৃত্যরতা। শুধুমাত্র বেণীর সর্পিল রেখাই চঞ্চলতা আনেনি। শুধুমাত্র খোলের বর্তমানতাই মুখরতার ইঙ্গিত নয়। সমস্ত বিষয়ে নাটকীয় গতি উদ্ধত। ভঙ্গিমা স্বাভাবিক। প্যাটার্ণকে ছাড়িয়ে চলে গেছে। যেখানে ছায়া আতপ নির্দিষ্ট কোনও বশে বাঁধা নয়।

জোড়বাংলার মন্দির

(দৈর্ঘ : ৭৪ ফুট, সময় : ৫৬ সেকেণ্ড)

জোড়বাংলার মন্দির ভক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। আজও এখানে সেই গোপীজন-বল্লভের মূর্তি আছে। শুধুমাত্র আর্টের উৎকর্ষতার চিহ্নস্বরূপ। এখানে নাটকীয় ভঙ্গিমার কৃষ্ণলীলা বা ভগবান রামচন্দ্রের কথা বলেই শিল্পী ক্ষান্ত হননি। আটপৌরে জীবনযাত্রার কথাও আছে। এ রমণীর দেহ আর এক বিস্ময়। যেন বা কোনও প্রসাধনরতা বাউরী রমণী। ধনুকের মত পিঠ ভেঙ্গে গেছে। সমস্ত দেহ সৌষ্ঠব সুখশয্যার উষ্ণতায় এক অমোঘ কান্তি লাভ করেছে।

দুঃখিনী সীতা—এখানে মহামায়ার প্রতিমা, নীচে অসুর। অসুরের একটি হাত ফ্রেমের সীমাকে লঙ্ঘন না কোরে আশ্চর্যভাবে উঠে গেছে। কম্পোজিসনকে এতটুকু ব্যাহত করেনি।

বাশুলীর মন্দির

(দৈর্ঘ্য : ২৯ ফুট, সময় : ১৯ ৩/৩ সেকেণ্ড)

চণ্ডীদাসের বাশুলীর মন্দির। একাজ অন্যরীতির। নির্মাণকৌশল সুচিন্তিত। মূর্তি ফ্রেমের বাইরে চলে এসেছে। বিশেষতঃ এই রমণীমূর্তির মহাস্থানগড়ের সঙ্গে বেশ মিল আছে।

তারাপীঠ

(দৈর্ঘ্য : ২৩ ফুট, সময় : ১৫ ৩/৪ সেকেণ্ড)

এখানকার কাজ সম্পূর্ণ রীতির। মহাভারতের কথা মন্দিরগাত্রে খুবই কম। সমস্ত ঘটনাটিতে কত ছাড়াছাড়া ভাব—তবুও সামঞ্জস্য কোথাও হারায়-নি। এ কৃষ্ণ এক অভিনব কল্পনা। এমন লম্বাটে অবয়ব আর কোথাও নেই। বাংলার দৈনন্দিন জীবনের ছবি অনেক মন্দিরে আছে—এখানেও আছে।

বক্রেশ্বর

(দৈর্ঘ্য : ৪৬ ফুট, সময় : ৩/৪ সেকেণ্ড)

বীরভূমের আর একটি পীঠস্থান। এখানে পোড়ামাটির কাজ অনেক কমে এসেছে। যে ক'খানি আছে, সেগুলি কেশবের রূপধারণের আলেখ্যর দু একটি। কি ভয়ংকর রূপ। আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে।

সোন্তর

(দৈর্ঘ্য : ৪৬ ফুট, সময় : ২৪ সেকেণ্ড)

সোন্তরের কাজের বিশেষত্ব আছে। অবয়ব বেশ দোহারা এবং পট ধরনের। রাশমণ্ডল অতীব সুন্দর। বস্ত্রহরণ পালা। ধাবমান বহমান যমুনায় আকর্ষণীয় রেখার মধ্যে ব্রীড়াবনত একগঙ্গা যৌবনশালিনী ডাগর, রমণীদেহসকল যার রস বিচিত্রতা আমাদের কল্পনাবিলাসী করে তোলে। অনন্তশয়নে বিষ্ণু কোথাও সংস্থান ছবিহারা হয়নি।

বড়নগর

(দৈর্ঘ্য : ১৩৮ ফুট, সময় : ১ মি: ৫২ সেকেণ্ড)

এই গঙ্গার তীরেই বড়নগর। রাণীভবানীর কীর্তি—চার বাংলার মন্দির। এত সবল ও সাত্ত্বিক স্থাপত্য আর কোথাও দেখা যায় না। কোনও প্রতিমাই ভাস্কর্যে অনুপ্রাণিত নয়। দৃষ্টিভঙ্গীও পৃথক। রামচন্দ্র এখানে ভক্ত হনুমানের স্কন্ধে আরূঢ়। রাবণও অদ্ভুতসৃষ্টি—ভক্তভাব। কৃষ্ণলীলার হস্তি-মর্দন। এটি কংসবধ। সমস্ত ব্যাপারটিকে বিশেষভাবে নাটকীয় করার দিকে যথাযথ লক্ষ্য ছিল। কংসের মুকুট ধূলায় লুণ্ঠিত। ছোট ছোট ইঁট মহামায়ার বিভিন্নরূপ। একাজগুলি অত্যন্ত ডেকোরেটিভ্। এত বড় শিব আর কোথাও দেখা যায় না। দুই পাশে দুই পার্শ্ব সহচর। নন্দী ও ভৃঙ্গী।

এড়ুয়ার

(দৈর্ঘ্য : ৪০ ফুট, সময় : ২০ ৩/৪ সেকেণ্ড)

এড়ুয়ার ধর্ধমান জেলায়। খুব কেয়ারী করা ফ্রেম ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ মুখমণ্ডল অত্যাধিক বাস্তব। নানান আকৃতির ফ্রেম এখানে লক্ষণীয়। ঘর কেটে প্যানেল করে বিষয়কে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

কালনার শিবমন্দির

(দৈর্ঘ্য : ৬০ ফুট, সময় : ৪০ সেকেণ্ড)

খুব কম বিষয় আছে যা শিল্পীর চোখে পড়েনি। রাধাকে তার সহচরী কৃষ্ণলীলার জন্য নিয়ে যায়। এর ভঙ্গী সত্যই মনে রাখবার মত। রাধার পরণে ঘাঘ্‌রা, মাথায় লজ্জাবস্ত্র। এটি বস্ত্রহরণ। এখানে কৃষ্ণের বসার ধরণটি বড় সুন্দর। গাছটি অত্যন্ত লীলায়িত। কাজটি খুব ছোট ইঁটে করা, তবুও এর মাধুর্য্য বর্তমান। তুলনায় অথবা পরিপ্রেক্ষিতে কোনও কিছু দাঁড়ায় না। তবুও নিজস্ব শিল্পকলা অবৈজ্ঞানিক আদিম অভিব্যক্তি নিয়ে প্রকাশিত।

গুপ্তিপাড়া

(দৈর্ঘ্য : ১১০ ফুট, ১ মি: ৬ ৩/৪ সে:)

গুপ্তিপাড়ায় কৃষ্ণচন্দ্র পুরাতন জোড়াবাংলা বৃন্দাবনচন্দ্র ও রঘুনাথজীর মন্দির দেখলেই সব মন্দির দেখা হয় একথা ঠিক নয়। প্রথম শিল্পীর রুচি-ভেদ, দ্বিতীয় সম্ভবতঃ মন্দিরগুলি বিভিন্ন সময়ের।

রঘুনাথজীর মন্দির সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাম এ আলেখ্যতে যার পর নাই রাজসিক। শর মোচনকালের এ দেহভঙ্গি আমাদের অপরিচিত ছিল। রাবণকেও বীরভাবে বর্ণনা করা হোয়েছে। এদিকে অগণন জীবন সমুদ্র মনে হয় সমস্ত ক্ষেত্র দুলছে; যেন নাটকের গতিশীলতায় উদ্বেল। কৃষ্ণলীলায় যুগল-মিলন বিষয়টিকে অলংকার হিসাবে ব্যবহার করা হোয়েছে। আত্মার সঙ্গে মনের, কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলনদৃশ্য।

আনন্দময়ীর মন্দির শ্রকুরিয়া

(দৈর্ঘ্য : ৭৪ ফুট, সময় : ৫৬ সেকেণ্ড)

এখানে অনেক পদ্ধতির কাজ এক একটি যেন পট। বিষয়বস্তুকে সোজা-সুজি মধ্যবর্ত্তীস্থানে রাখা হোয়েছে। দেখলেই মনে হয় ভারী নরম, স্নিগ্ধ ও ঠাণ্ডা, যেন কালীঘাট পটের মত। অবয়ব অতি সরল, কোথাও গাঁট নেই।

অতি মৃতৌল। রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন, কালীর ছবি, এটি আনন্দময়ী অন্নপূর্ণার আলেখ্য। সিংহটি সনাতন পদ্ধতির নয় অত্যন্ত বাস্তব ধরণের।

জয়রোগপীঠ বলাগড়

(দৈর্ঘ্য : ৩১ ফুট, সময় : ২০ সেকেণ্ড)

বহু সাধক এখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন। মন্দিরে যোগীদের ব্যতীত অন্ত আলেখ্য নেই। এরূপ কৃচ্ছ্রসাধনার জীবন উচ্চ অবস্থা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

বংশবাটী

(দৈর্ঘ্য : ৭২ ফুট, সময় : ৪৮ সেকেণ্ড)

এই বাসুদেবের মন্দির। মন্দিরের বিগ্রহ গত বছর অপহৃত হোয়েছে। নিশ্চয়ই কোনও আর্ট বিলাসী মানুষের বৈঠকখানায়। শিল্পকলার নির্দশন হোয়ে শোভা পাচ্ছে। ফলে মন্দির শূন্য। শূন্য বেদী দেখলে মন চমকে ওঠে। যাক্, সে কথা। এ মন্দিরের প্রশংসা সর্বত্র। কৃষ্ণলীলা এর প্রধান বিষয়বস্তু। এখানে চোখের টান যেমন আয়ত—তেমন ওষ্ঠদ্বয়ও অসম্ভব ভারী।

অন্যান্যদের রচনা ও স্মৃতিকথা

ব্যক্তিগত জীবনে উনি খুবই অনাড়ম্বর ছিলেন। যাবতীয় ইঙ্গ, বঙ্গ, রীতি নীতি, আচার আচরণ, বিলাস, সংস্কার সম্বন্ধে জানতেন প্রচুর কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে ভারতীয় তথা বাঙ্গালীয়ানার প্রতিই ঝোঁক ছিল বিশেষ।৮

ওঁর ব্যক্তিগত জীবন যা আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখতে শুরু করেছি সেটা শুরু হয় ১৯৪৭ সাল থেকে। এখানে খুব ছোট কোরে জীবনের সামান্য কিছু বিবরণ দেওয়া দরকার।

১৯৪৭ সালের ৮ই মার্চ আমাদের বিবাহ হয়। সেই থেকে একটানা ৫ বছর চলল আপোষহীন সংগ্রাম, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড কৃচ্ছ্রসাধন। সব থেকে আনন্দের কথা এই যে তাতে কেউই আমরা ক্লান্তি বোধ করিনি, হার-জিতের প্রশ্নটাই মুঠো করে ধরা ছিল সামনে।।

এই পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা ১৪টা বাড়ী বদলিয়েছি। কাছ থেকে দূরে, আরও দূরে এইভাবে নানান জায়গায় ঘুরে আমরা শেষে এলাম পাতি-পুকুরে, এস, কে, দেব রোডে। বাড়ীটা ভারী সুন্দর। একতলা একটা বাংলো টাইপের বাড়ী সামনে অনেক জমি পিছনেও তাই। পিছনে জমির শেষে মস্ত একটা পুকুর ছিল। এখানের আসার পর আমার একটা মস্ত শিক্ষা হল সেটা না বোলে থাকতে পারছি না। অনেক জমি থাকায় বাগান করার ইচ্ছে কার না হয়। উনিও লেগে পড়লেন। ফুল ফোটা দেখতে কার না ভালো লাগে। অনেক ফুলগাছ বসলো, সামান্য সজি, বাগান বেশ ঝামরে উঠল কিন্তু এই সময় মাঝে মাঝে গরুর উপদ্রব শুরু হোল। একদিন দেখি দুপুরের দিকে একটা গরু ফুলের গাছগুলো একেবারে মুড়িয়ে দিচ্ছে। কাছে গেলাম কিন্তু নড়লো না। আমি ছুটে এসে ওনাকে ডাকলুম, উনিও উঠে এলেন। দেখলুম উনি সিঁড়িতে দাঁড়াতেই গরুটা পালালো। বুঝলাম জন্তু-জানোয়াররাও স্ত্রী-পুরুষ হিসেব কোরে সমীহ করে। আমার একটি অমোঘ জ্ঞান লাভ হয়েছিল।

আমাদের বাড়ীর পাশাপাশি যাঁরা ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি। সুনীল পাল (ডাক্তার) ছিলেন আমাদের পূবের প্রতিবেশী। প্রথমদিন ওখানে রাত কাটানোর পর প্রতিবেশী পঞ্চাননবাবুরা

আমাদের খোঁজখবর নিতে এলেন। আজও মনে আছে প্রথমে জিজ্ঞেস কোরেছিলেন 'কেমন ঘুমোলেন'? উনি বল্লেন, 'খুব ভালো'। কিছুটা অবাক হয়ে ওঁরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি করলেন। আমরাও একটু থতমত খেলাম। সেদিন রাত্তিরে শোবার সময় সেই কথাই মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা কী কে জানে। আর বেশীক্ষণ ধৈর্যধারণ করতে হলো না। সারারাত মশারির মধ্যে জেগে বসে থাকতে হোল। লক্ষ লক্ষ মশার ঐকতান এবং আক্রমণ; মশারি ভেদ কোরে যেভাবে মশা ঢুকেছে বলা যায় না, এমন মশা আমি জীবনে দেখিনি। দিনে রাত্তিরে অসংখ্য মশায় দেওয়াল কালো হয়ে থাকতো। কেন যে প্রথমদিন আমাদের ছেড়ে দিয়েছিল আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

এখানে আমরা ন'বছর ছিলাম। প্রথমে এখানে আসার সময় উনি বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের সেনসাস ডিপার্টমেন্টে ছিলেন, পরে Rural Arts and Crafts-এ কাজ করেন। এরপর কিছুদিন ললিতকলা একাডেমীতে কাজ কোরে উনি সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ঢোকেন। একটা কথা, উনি যখনই বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের কাজের কথা বলতেন সেই সময় খুব আন্তরিকতার সঙ্গে উল্লেখ করতেন শ্রীঅশোক মিত্রের (দিল্লী) নাম। আমরা হাজরা রোডে থাকাকালীন মনে হয় ১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে একবার দেখা করতে আসেন ও পরে চঞ্চলবাবুর সঙ্গে আর একবার আসেন। এরপর উনি (আমার স্বামী) চলে যাবার পর, বিদেশ থেকে ফিরে এসে অশোকবাবু আমার সঙ্গে দেখা কোরে যান।

কর্মস্থল থেকে বাড়ী, বাড়ী থেকে কর্মস্থল এই যাতায়াতেই দিনের বেশির ভাগ সময় নষ্ট হয়ে যেত, তারপর বৃষ্টির দিনেও চরম দুর্ভোগ। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চায়ের কাপ একহাতে ধরে অন্য হাতে বই খোলা হতো আর সেটা চলত স্নানের আগে পর্যন্ত। তারপর রাত্তিরে খাওয়ার পর বহু রাত পর্যন্ত মশারির মধ্যে পড়াশোনা চলত। এর ফলে এক একদিন নানা ঝামেলার সৃষ্টি হত। একদিন, সেটা হবে গ্রীষ্মকাল, ভারী গরম, উনি মশারির মধ্যে ঢোকার আগে ঘরের দুটো দরজা খুলে দিলেন, আমি আপত্তি জানালে বললেন, 'আমি তো জেগে থাকবো, ভয় নেই, ঠিক সময় বন্ধ কোরে দেবো'। ঘরের মধ্যে একটা দুশো পাওয়ারের আলো জ্বলছে; তারপর গরমও খুব, আমি পাশের ঘরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। আমার যখন ঘুম ভাঙলো, রাত্ত

তখন থমথম করছে, অজস্র ঝিঁঝির ডাক, মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। দু'টো ঘরের মাঝখানে আরও একটা দরজা ছিল। চেয়ে দেখি উনি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন, দুদিকে দুটো দরজা খোলা। ভয়ে, আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না, পা দুটো কাঁপছে। ওনাকে ডাকবার মত স্বর গলা দিয়ে বেরুচ্ছে না, মনে হচ্ছে বাড়ীর ভেতর কে বা কারা যেন ঢুকেছে, কি যে করবো বুঝতে পারছি না। একটু পরেই দেখি মস্ত মোটাসোটা একটা বেড়াল আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি যেন একটু ধাতস্থ হলুম। টপ কোরে দরজা দুটো বন্ধ করতে গেলুম, কিন্তু হাত দুটো এত কাঁপছিল যে দুমদাম শব্দে হাত থেকে একটা খিল পড়ে গেল। সেই শব্দে ওনার ঘুম ভেঙে গেল। এরকম আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল।

বাড়ীতে থাকলে আমি ওনাকে কখনও দেখিনি এক মিনিট বই ছাড়া থাকতে। সঙ্গে সঙ্গে চলতো আঁকা অথবা লেখা। এমন ঐকান্তিক আগ্রহ একান্ত নিষ্ঠা আর অক্লান্ত পরিশ্রম, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না যে মানুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। সত্যি, দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, শুধু পড়া আর পড়া, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কাজ। ছুটির দিনগুলো এইভাবেই কাটতো। কাজের দিনেও যেটুকু সময় থাকতো তার মধ্যে বই-এর মধ্যে ডুবে থাকতেন। অনেক সময় আমার নিজেরও রাগ হোতো, কি চব্বিশ ঘণ্টা বই আর বই। পরে বুঝেছিলাম এছাড়া প্রজ্ঞা, ধী, মেধা এ তিনের সংমিশ্রণ হয় না।

জীবনে যে জিনিষটা সব বিষয়েই পছন্দ করতেন সেটা হচ্ছে perfection। ছোট বড় সব বিষয়ে যার যেটুকু হওয়া দরকার সেটা যেন সম্পূর্ণ হয়, তা সে লেখাই হোক আর রান্নাই হোক। তাই পাঁচফোড়ন, রাঁধুনি থেকে আরম্ভ কোরে গরমমশলা পর্যন্ত কোথাও গোঁজামিল দেওয়া যেত না। তাছাড়া, দেশী, বিদেশী, মোগলাই এমন কোনো রান্না ছিল না যাতে উনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন না। তারপর কুটনো কোটা, একটু উনিশ বিশ হলেই রান্না বরবাদ। প্রত্যেকটা রান্নার আলাদা আলদা স্বাদ এবং রং চাই। এছাড়া, নানা রকম ফলের রস দিয়েও রান্না, অবশ্য এগুলো আজ বলা নিষ্প্রয়োজন কারণ চালিয়াত বলে মনে হবে। তবে তখনকার দিনে তো এরকম ছিল না, তাই সে সব সম্ভব হোতো। রান্নাবান্নার রীত ধরণটাই পছন্দ হোতো বেশী তবু সাদা চেহারার ভাজা মশলা ছড়ানো তরকারী বা অল্প তেলে সাঁৎলানো গোটা ফোড়নের ঝোল মাঝে মাঝে রুচিকরও লাগতো। তবে ভোজনের

পাত্র আলো কোরে কালচে-সোনালী আভা যুক্ত ঘৃতপক অথবা তৈলাক্ত পদই ওনার সমধিক প্রিয় বস্তু ছিল।

পাতিপুকুরে নয় বছর থাকাকালীন মাঝে মাঝে উনি বেশ ভুগেছেন। আগাগোড়াই সর্দির ধাতটা ছিল বেশী। একটু ঠাণ্ডা লাগলেই দারুণ কাশি। অসম্ভব কষ্টের কাশি হোতো, যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো চিকিৎসার কথাই শুনতেন না, কিছুতেই না। এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা মোটেই পছন্দ করতেন না। উনি আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকা অফিসে বেশ যাতায়াত করতেন। সেখানে ডাঃ মুন্সীকে ওঁর খুব পছন্দ ছিল। তাই তিনি যখন ওনাকে ফেনসিডিল্ খেতে বলেন সেটা উনি নির্বিবাদে খেয়ে যেতেন, কিছু ফলও পেয়েছিলেন। প্রায় প্রতি শীতেই এই ভয়ঙ্কর কাশির কবলে পড়তে হোত। শেষে ঠিক হোল সেবার পুজোর আগে একবার বাইরে ঘুরে আসার। সালটা আমার মনে নেই। মহালয়ার দিন ঠিক হল, আমরা দ্বিতীয়ার দিন বেরিয়ে পড়লুম। রাত্তিরের ট্রেন, তখন এতো বুকিংএর ঝামেলা ছিলো না। সকালেই টিকিট এবং টুকিটাকি জিনিষ নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। আমরা যথা সময়ে প্রস্তুত হয়ে হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হলাম। আমাদের যাত্রা দুবরাজপুর। আমার খুব চিন্তা ছিল কোনো থাকার ব্যবস্থা হয়নি, ডাকবাংলোয় যদি ভীড় থাকে, কি হবে! উনি অবশ্য বলেছিলেন যে ওসব দিকে এত ভীড় হবে না।

কি ভীড় হাওড়া ষ্টেসনে। পুজোর মরশুম, হবেই। ট্রেনে তো উঠলুম কিন্তু কি ভয়ানক কাশি আরম্ভ হ'ল। সমস্ত কমপার্টমেন্ট যেন ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকলো। যাই হোক, ট্রেনটা কিছুটা এগোতে কাশিটা থামলো। পরদিন ভোরে, আমরা দুবরাজপুরে পৌঁছুলুম। সেখান থেকে ডাকবাংলোয় যেতে খুব বেশী দেরী লাগলো না। বাংলোটা খালিই ছিল। আগেকার দিনের সাহেবী কায়দায় করা বাংলো। একটা বিরাট হল ঘরের মতন। মেঝেটা সাদাটে ধরনের চকচকে। হলদে চৌকোকাটা; অনেকটা মারবেলের মতই লাগছিল। সিলিংটা দারুণ উঁচু। তিনদিকে খুব বড় বড় দরজা জানলা কাঠ ও কাঁচের। তবে সবই ভাঙাচোরা। মোটামুটি সাধারণ বাংলোর চেয়ে খুব ভালো, অনেক উঁচু প্লিন্ত, চারিদিকে অনেকটা জমি নিয়ে কম্পাউণ্ড, কিছু কিছু গাছপালা, সামনে লাল মাটির রাস্তা।

ডাকবাংলোয় পৌঁছুতে একটি ছেলে এসে দরজা খুলে দিল এবং সবকিছু

কাজ সে বেশ গুছিয়ে করে দিল। জায়গাটা বেশ ভালোই লাগছিল, অনেক দিন পর কলকাতার বাইরে আসা হ'ল। সকাল থেকেই একটা ব্যাপারে আমার মন খুঁতখুঁত করছিল। ক্রমশঃ দুপুর গড়িয়ে বিকেলে পড়লো। উনি একটা ইজিচেয়ারে ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে থাকলেন। আমি কম্পাউণ্ডের চারিদিকটা ঘুরে দেখতে লাগলুম। ধীরে ধীরে আকাশ কালো হোল। রাত নাবলো, আমরা ঘরের ভেতর চলে এলুম। এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোনো বাড়ীঘরদোর চোখে পড়েনি। ডাকবাংলোর বেয়ারাকে (ছেলেটিকে) বলা হ'ল রাত্তিরে থাকার জন্যে, সে রাজী হ'ল না, কিছুতেই না। যদিও ঘরের দেওয়ালে নোটিশ বোর্ডে লেখা ছিল থাকার কথা, থাকলো না সে।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি শোয়া হ'ল। ক্লান্ত লাগছিল খুব দুজনেরই। সারাদিনের মধ্যে ওনার একবারও কাশি হয়নি। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন, বেশ নাক ডাকতে লাগলেন। আমি এতক্ষণ মনের মধ্যে যে আতঙ্কটা চেপে চুপচাপ ছিলাম, কিন্তু শুতেই দেখি সেটা যেন ডবল্ হয়ে উঠল। বৃথা শোবার চেষ্টা না কোরে উঠে বসলুম। ঘরের সব জানলাগুলোর একটাতেও রড নেই। কাঠের খড়খড়ির একটা আছে, সার্সির অবস্থাও সেইরকম, ফ্রেমটাই আছে কাঁচ নেই। জানলাগুলো দরজার মতন বড় বড়। সবই খোলা রইল। ঘরের পিছনে বিরাট জঙ্গল। বড় বড় গাছের তলায় জমাটবাঁধা অন্ধকার, আকাশের আলোয় যতদূর দেখা যায় ধূ ধূ করছে অনন্ত। ঘরে হ্যারিকেনের অল্প আলো। কিছু কিছু এলোমেলো জিনিষপত্তর। তারই ছায়া দেওয়ালে দেওয়ালে। উঁচু সিলিংএ জড়িয়ে আছে যেন একটা ভয়। খাটের ওপর শোয়া ঘুমন্ত মানুষ, কিছু ছোট ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস, তারই আওয়াজ। তারি পাশে অস্থির মন নিয়ে বসে আছি আমি। চৌকিদার হাঁক দিতে দিতে চলে গেল...।

এমন সময় ওনার ঘুম ভেঙে গেল। আমাকে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'এত রাত পর্যন্ত জেগে বসে আছ? ভয় করছে না কি?' আমি বললুম, 'না মশা'। উনি বললেন, 'এত মশাতো নয়, চাপা দিয়ে শুয়ে পড়, অসুখ করবে। পাশেই চৌকিদার থাকে, কোনো ভয় নেই।' একটু পরেই ফের ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি বসে থেকে থেকে যখন ফর্সা হয়ে আসছে, একটু শুয়ে পড়লুম। পরদিন সকালে কাছাকাছি একটু ঘোরাঘুরি কোরে বাংলোয় ফেরা

হ'ল। উনি বিকেলেও বারান্দায় শুয়ে থাকলেন। আমি এপাশ ওপাশ ঘোরাঘুরি কোরে সন্ধে নাগাদ ঘরে ঢুকে পড়লুম। রাত বাড়তে থাকে আর আমার মনও চঞ্চল হয়। যথা সময়ে খাওয়া শেষ হ'ল, এবার ঘুমুতে বোলে উনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম যে আমার আসবে না তা আমি আগেই বুঝেছি। একটু একটু কোরে রাত গভীর হতে থাকে, চৌকিদার হাঁক দিয়ে গেল। আমি কিছুতেই শুতে পারলুম না। এমন সময়ে উনি একেবারে উঠে বসলেন, আমাকে বসে থাকতে দেখে ভীষণ চটে গিয়ে বল্লেন, 'জেগে বসে আছো? আচ্ছা, এবার আমিই বসে থাকছি, তুমি ঘুমোও। আমরা কালই এখান থেকে চলে যাব। একটা মানুষ ঘুমুবে আর একজন পাহারা দিয়ে জেগে থাকবে এরকম ভাবে থাকা যায় না। কাল কোলকাতায় ফিরে যাব।' মনে মনে যে খুশী হইনি তা নয়।

আমরা যে ঘরটায় থাকতুম তার পাশেই একটা ঘর ছিল। পরের দিন সকালে উঠেই দেখি ঘরের দরজাটা খোলা। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করতে জানলুম যে ওঘরে আজ একদল লোক আসবে, তারা একদিন থাকবে। আসলে তারা আসছে West Bengal Govt. থেকে যে কৃষি ঋণ দেওয়া হয় তাই দিতে। একদিন থেকে তারা অন্য জায়গায় চলে যাবে। সুতরাং আমরা সেদিন আর ফিরলুম না। পরের দিন ষষ্ঠী। সেদিন রাত্রের ট্রেনে আমরা ফিরে আসবো, ঠিক হোল। বিকেলে আমরা কাছাকাছি একটু বেড়িয়ে ফিরে এলুম। সন্ধ্যার আগেই ডাকবাংলোর কমপাউণ্ডের ভিতরে অনেক লোকজন জড় হোল। সতরঞ্চি পাতা হোল, একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বালা হোল। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। আমি খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ছিলুম। অবশ্য মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙলেও ভয় আর করেনি। পরের দিন ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হচ্ছিল কোলকাতায় চলে যাওয়ার কথা। ওনার শরীরটা অল্পদিনে বেশ ভালো সেরেছে। আর কিছুদিন থাকতে পারলে ভালোই হত কিন্তু এমন আতঙ্ক নিয়ে থাকা যায় না। সকালে আর আমরা বেরুইনি। উনি ছেলেটির সঙ্গে জায়গাটা সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। কথায় কথায় জানা গেল কাছেই একটা মন্দির আছে। ঠিক হোল আমরা বিকেলে বেরিয়ে মন্দির দেখে আসবো।

আমরা ঠিক সময়ে বেরুলুম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর কাছাকাছি পৌঁছতেই

ছেলেটি বল্লে, "ঐ যে"। চেয়ে দেখলুম দূরে একটা ঘরের মতন। মন্দির বোলে মনেই হয় না অবশ্য এটা পিছন দিক। প্রকাণ্ড একটা গাছের ডালপালা আছড়ে পড়েছে মন্দিরের চালে। মনে হোল আমাদের সামনে দিয়ে কে যেন চলে গেল। ছেলেটি আমাদের ছেড়ে ছুটে সেইদিকে চলে গেল। একটু পরেই তাঁকে নিয়ে ফিরে এল, তিনি পূজো শেষ করে তালাবন্ধ করে চলে যাচ্ছিলেন।

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গাছে গাছে পাতায় পাতায় ছায়াচ্ছান্ন জায়গাটি, তারই ফাঁকে ফাঁকে ষষ্ঠীর আকাশ। মন্দির থেকে ভেসে আসছে সুন্দর ধূপের গন্ধ। আমাদের সামনে বিরাট বট গাছ, অশথ গাছ, আরো কয়েকটি গাছ, সব মিলিয়ে সেটি একটি পঞ্চবটী। তারই ডালপালায় মন্দিরে যাবার পথটি অন্ধকার হয়ে গেছে।

সামনে বটগাছের প্রকাণ্ড গুঁড়ি, তারই কাছে একটি বেদী, বেদীতে দেদীপ্যমান কালভৈরবের মূর্তি। পাশে মাটিতে রাখা একটি নরমুণ্ড (মড়ার মাথা), কাছে জ্বলছে একটি মাটির প্রদীপ। অদূরে ছোট্ট একটু জলের রেখার নদী, চাঁদের স্বল্প আলোয় যা চিক চিক করছে। তারই পাশে শ্মশান।

তালা খোলা হোল। প্রকাণ্ড দরজা, পাল্লা খুলে আমরা গেলাম মন্দিরে। আমরা শুনলাম মন্দির এবং দেবীমূর্তি স্বপ্নাদেশের নির্দেশ মত তৈরী। দেবীর বেদীর তলায় আছে ১০৮টি নরমুণ্ড। এবং দেবীর হাতে আছে শৃগালের হাড়। এ মন্দিরে পূজারী ব্রাহ্মণ হতে পারেন না। জানিতে তাঁরা নমঃশূদ্র।

মন্দিরের ভিতরটি বেশ বড়। মেঝেটি ইঁট বসানো মাঝে মাঝে সিমেন্ট দেওয়া। তারই খানিকটা জুড়ে একহারা ইঁটের গাঁথুনি দিয়ে উঁচু করা, তারই উপর বেদী করা, সেই বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছেন দেবী কালিকা। কি ভয়ানক সে মূর্তি। বীভৎস রস আর হাস্যরসের এমন অপূর্ব সমন্বয় আর দেখা যায় না! এলোকেশী কি ভঙ্করী মূর্তি মায়ের আবার তেমনি অপার্থিব করুণধারার-হাস্যধারা ঠোঁট দু'খানি। স্তিমিত প্রদীপের আলো, নৈসর্গিক স্তব্ধতা আর মিষ্টি ফুলের গন্ধ ভয় আর শ্রদ্ধাকে একীভূত করে রেখেছে। অপলক দৃষ্টিতে আমরা চেয়েছিলাম বহুক্ষণ॥ তারপর নত মস্তকে দেবীর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম রেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম। অনেকক্ষণ আমরা কেউই কথা বলতে পারিনি।

ডাকবাংলোয় ফিরে এলাম। ট্রেনের সময় হয়ে এলো ষ্টেসনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ট্রেনে বেশ ভীড় ছিল। পরদিন সপ্তমীর ভোরে আমরা কোলকাতায় পৌঁছুলুম। দিন কেটে গেছে বহু। কালের পরিবর্তনে কিছু আছে, কিছু নেই। তবু সে রূপ মনে চির জাগরূক। এমন মূর্তি আমরা কখনও দেখিনি।

তারপর আমরা আরো কয়েকবার বেরিয়েছি, কিন্তু আমাদের 'প্রথম ভ্রমণ' হিসেবে দুবরাজপুর যাওয়াটা ঘটনা হয়ে থাকবে চিরদিন। আমরা যখন বিষ্ণুপুরে যাই তখন আগে জয়রামবাটী হয়ে পরে কামারপুকুর গিয়েছিলুম। খুব ভালো লেগেছিল জয়রামবাটীতে যেমন লাগে ঠিক বাপের বাড়ীতে। তখন যামিনী দিদি ছিলেন, স্বামী পরমেশ্বরানন্দ ছিলেন। মনে হয়েছিল যেন কতদিনের সম্পর্ক কত জীবনের চেনাশোনা, কিন্তু সেটাই ছিল প্রথম দেখা। কথা ছিল আবার যাবো কিন্তু হয়নি। তবে স্বামী পরমেশ্বরানন্দ একবার ৬১ কিংবা ৬২ সালে ঠিক আজ মনে নেই কলকাতার বাগবাজারে (উদ্বোধনে) এসেছিলেন, তখন দেখা হয়।

আমরা পাতিপুকুরে আসার পর থেকেই আমাদের বইএর সংগ্রহ বাড়ছিল। নানা ধরনের বই ও ধর্মপুস্তক থাকা সত্ত্বেও ঠাকুরের বই বিশেষ ছিল না। এইখানে আসার পর থেকেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদার তাবৎ যত বই প্রকাশিত হয়েছিল সবই প্রায় আমরা রাখতে পেরেছিলুম। উনি অবশ্য আগেই ঠাকুরের সব বইই পড়েছিলেন। তবে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিদিন, আমি দেখেছি ঠাকুরের বই, বিশেষ, কথামৃত এমন আগ্রহ সহকারে পড়েছেন যেন মনে হত এই বুঝি প্রথম পড়ছেন। বই পেয়ে আমার খুব ভালো লেগেছিল। মনে হত এমন কোরে মনের কথার প্রাণ ভরিয়ে কেউ উত্তর দিতে পারেনি। জানি না কখন একটু একটু কোরে ঠাকুর আর মা আপন হতে আপনার কোরে নিয়েছেন। তাই আজ বিষণ্ণ সায়াহ্নে একান্তে ভাবি না চাইতেই যা পেলাম, তা চাইতে কেন মন দিলাম না।।

অনেক দিন থেকেই ওনার নানান পুরনো জিনিষপত্র কেনার ঝোঁক ছিল যাকে 'কিউরিও' বলা হয়। অনেক জিনিষের মধ্যে একটি ভারী সুন্দর মূর্তি ছিল। মূর্তিটি একটি একক কৃষ্ণমূর্তি। নয় ইঞ্চি লম্বা অষ্টধাতুর, বুকে ভৃগু-পদ-চিহ্ন আঁকা। ক্রমে মূর্তিটি একদিন পুজোর জায়গায় এসে দাঁড়ালো। মাধব এলেন। কি সুন্দর দেখতে! ফুটফুটে একটি মিষ্টি চেহারা নিয়ে ধড়া-চূড়া আর

বাঁশী হাতে নিয়ে দাঁড়াতেই জায়গাটা আলো হয়ে গেল। উনি নাম রাখলেন 'ফ্লুট-ওয়ালা'। যে দেখতো তারই ভালো লাগতো। যেমন রূপ তেমন গুণ। গুণের কথা কত যে, অন্তত একটা আধটা না বললে অকৃতজ্ঞ হতে হয়।

একদিন মাঝ রাতে, সময়টা শীতকাল ঘুমের মধ্যে দেখছি আমার মুখের কাছেই বড় কোরে মাধবের মুখ। ঘুমটা পাতলা হয়ে এল। তারপর আমার একেবারে যেন মুখের ওপর মাধবের মুখ। ঘুমটা আমার একেবারে ভেঙে গেল। আমি উঠে বসলুম। স্বপ্নটা ভালো লাগল। ভাবলুম আমার এখন মাধবকে মনে করাই উচিৎ। এই ভেবে আমি মনটাকে স্থির করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। যতোবার মনটা জড়ো করি ততোবার একটা অস্পষ্ট মৃদু আওয়াজ শুনি, ঠিক মনে হয় কে যেন ঘরের দরজার বাইরে থেকে মৃদু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। হঠাৎ দরজার কড়াটা মৃদু নড়ে গেল। মনে হোল চোর কি আর কড়া নাড়ে। নিশ্চয়ই কুকুর। নিজের ওপর রাগ হোল। মনটা আজ কিছুতেই বসবে না। চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগলুম। আমার ডান পাশে একটা জানলা ছিল। সেটা বন্ধ। জানলাটা কাঠের ওপরে দু' দিকে দুটো কাঁচ বসানো ছিল। একটা কাঁচ পুরোপুরি ভাঙা। ছিটকিনিটা উপরে। হঠাৎ আমার সেদিকে নজর যেতে দেখি সাদামত কি একটা, চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। আমি বেড়াল ভেবে হুস্ হাস্ করতে প্রথম নড়লো না পরে চলে গেল। জানলাটার তলায় ছিল জমা করা অনেক ভাঙা শিশি বোতল। হঠাৎ সেগুলো পড়ার শব্দ হতে লাগলো। কুকুরগুলো দারুণ চীৎকার করে উঠলো। আমার তখন মনে হ'ল বেড়ালতো বয়ে উঠতে পারে না। তারপর আমার বেশ মনে হ'ল একটা লোক সাদা কাপড়ে মাথা মুড়ি দিয়ে জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখছিল। আমি ঘুমিয়ে থাকলে ছিটকিনিটা খুলে সোজাসুজি রডগুলো ফাঁক করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়তো। ভয় হ'ল খুব। ওনাকে ডাকতে লাগলাম। সকালে উঠে দরজা খুলে দেখি বড় বড় পায়ের ছাপ বাইরের উঠোনে।

আমরা পাতিপুকুরে যখন প্রথম আসি, উনি তখন শ্রীযুক্ত ডি কে গুপ্তর 'হরবোলা' ক্লাবে সংযুক্ত ছিলেন। সেই সময়টায় লক্ষ্মণের শক্তিশেলের রিহার্স্যাল চলছিল। একদিন হঠাৎ কয়েকটি ছেলে একটু বেলাতে ওঁকে খুঁজতে আসে, উনি তখন কাজে বেরিয়ে গেছেন। আমি দরজা খুলে বেরিয়ে এলে তাদের মধ্যে একটি ছেলে এগিয়ে এসে নমস্কার কোরে বল্লে, 'আমার নাম

সুনীল গাঙ্গুলী। ওঁর কাছে এসেছিলুম'। তারপর বাড়ীর ঠিকানাটা জেনে নিয়ে একটা কথা বোলে বেশ খুশী হয়ে ওরা চলে গেল। আমি বেশ বুঝতে পারলুম ওরা এসেছিল ঠিকানাটা যাচাই করতে। আমাদের তখন অজ্ঞাতবাসের পালা চলছিল, ঠিকানা কেউই জানতো না বা পেত না। সুতরাং ওদের এজন্যেই এখানে পাঠানো হয়েছিল। এত ঘন ঘন বাড়ী বদলানো হচ্ছিল যে ঠিকানা দেওয়ার উপায় ছিল না। আমরা এখানে আসার পর অনেকেই এই বাড়ীতে আসেন। তার মধ্যে প্রথমে আসেন শ্রদ্ধেয় বিষ্ণু দে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। আরও কয়েকবার এসেছিলেন, সস্ত্রীক আসেন এইখানেই। শ্রীচঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ও এসেছেন। অবশ্য তিনি আমরা আগে হ্যারিসন রোডে থাকাকালীন একদিন মানিকবাবুকে (সত্যজিৎ রায়) সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। এই পাতিপুকুরে স্থায়ীভাবে বেশ কিছুদিন থাকার ফলে অনেকেই এসেছিলেন। আজ আর সব নাম উল্লেখ করা সম্ভব হোল না। পাতিপুকুরে থাকার ফলে যাতায়াতের টানাপোড়েনে ক্রমশঃ ওনার শরীর খারাপ হতে থাকে। কিছুটা কাছাকাছি থাকার চেষ্টা চলতে থাকলো। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমরা বেলেঘাটার কাছাকাছি একটা জায়গায় আসি। প্রকাণ্ড বড় ১টি ফ্লাট। খুব খোলামেলা। তিনতলা। কিন্তু জলের খুব কষ্ট ছিল। মনে হয়, মাস ছয়েক ছিলাম সেখানে। ওখানে থাকতে ওনার আধখানা দূরত্ব কমেছিল। কিছুদিন এখানে থেকে আমরা সি, আই টি, রোডে চলে যাই। যেটাকে এখন ভি, আই, পি রোডও বলা হয়।

১৯৬১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী আমরা সি, আই, টি, রোডের বাড়ীতে এলুম। বাড়ীর কাজ তখনো শেষ হয়নি। দোতলার ফ্ল্যাট। দুটো বড় বড় ঘর আর একটা ছোট ঘর, বারান্দা, খাবার জায়গা ইত্যাদি। সামনে ৮০ ফুট চওড়া রাস্তা, বাস চলাচল করে। জায়গাটার নতুন পত্তন হচ্ছে। সুন্দর নতুন নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি, কিছু কিছু জমি ছাড়া মাঝে মাঝে পার্ক হবে বলে। চমৎকার গোছানো আমাদের বাড়ীটা যা সচরাচর চোখে পড়ে না। প্রচুর জল। পূব দিকটা ছাড়া সবটাই খোলা ছিল। আমরাই সেখানে প্রথম বাসিন্দা হলাম। প্রথম ওখানে আসার পর মনে হোতো যেন বিদেশে এসেছি, খোলামেলা কি সুন্দর শান্ত আবহাওয়া ছিল। ওনার খানিকটা পড়াশোনার সময় বাড়লো। আমার অবশ্য একটা মস্ত সুবিধে হোল বাপের বাড়ীটা খুবই কাছে। তাছাড়া বিবাহের পর হঠাৎ হঠাৎ উধাও হওয়ায় আমাদের সম্বন্ধে নানান

গুজোবের সৃষ্টি হচ্ছিল। সেটা ঘুচলো। এরপর সবাই এলেন, কিছু দেখে গেলেন, কিছু শুনে গেলেন ও বুঝলেন যে আমরা সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কথাটা বলা ঠিক হবে কি না জানি না তবে এখানে আসার বেশ কয়েক বছর পর আমি লোক সঙ্গে নিয়ে একা বেরুতে থাকি। যত দিন যেতে লাগল ওনাকে পড়াশোনা থেকে তুলে বাড়ীর কাজের জন্যে সময় দিতে বলাটা অসম্ভব হতে লাগলো। অতএব লোক সঙ্গে নিয়ে একা বেরোনোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা আমাকে নিতেই হয়েছিল। প্রথম প্রথম বেরুতে পা কাঁপতো, ফেরার পথে মনে ভয় হত। স্ত্রী স্বাধীনতার সুযোগটা বোধহয় বেশীই নিচ্ছি। বেশ কয়েকটা বছর এখানে ভালোভাবেই কাটলো। অসুখবিসুখ ওনার হয়েছে অনেকবার, তবে শরীর স্বাস্থ্য ভালোই ছিল, চেহারাও একই রকম ছিল।

ছেলেদের নিয়ে উনি অনেকদিন আগে থেকেই 'চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ' নামে একটা সংস্থা করেছিলেন, সেখানে তখন দুটো নাটকের রিহার্স্যাল চলছিল লক্ষ্মণের শক্তিশেল আর এমপারার জোনস্ এই দুটো নাটক নিউ এমপায়ারে শো করা হবে। সময়টা ছিল বর্ষাকাল। জুনের শেষের দিকে প্রচণ্ড বর্ষা নাবলো। প্রতিদিনই দারুণ বৃষ্টি ভেজা হয়ে উনি বাড়ী ফিরতে লাগলেন, বুঝলাম এবার আর রক্ষে নেই। একদিন এতো বৃষ্টি হতে লাগলো বাস-ট্রামতো বন্ধই হয়ে গেল, ট্যাক্সিও। বাড়ী ফিরলেন যখন রাত বারোটা। বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করে শেষে পায়ে হাঁটা পথে ফিরতে এত দেরী। রাত দু'টো পর্যন্ত চলল গরম জলের সেঁক, কারণ রিহার্স্যালে যেতেই হবে পরদিন। অভিনয় জিনিষটা ওনার বড় প্রাণের জিনিষ ছিল। কোনো প্লে থাকলে ছোট বড় যাই হোক সেটা নিয়ে এতো ভাবনা চিন্তা থাকতো তা বলা যায় না। কত যে স্কেচ আর কত যে লেখা সে বোলে শেষ করা যায় না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অদল বদল। ছেলেরাও যেমন পরিশ্রম করতো উনিও প্রতিটি ছেলের সঙ্গে করতেন অকুণ্ঠ পরিশ্রম। তারা বকুনিও খেয়েছে, হয়তো মারও খেয়েছে কিন্তু তারা জানতো এখানে এমনিই হয়। তারা এটাকে কখনও ভাবেনি ওটা ব্যক্তিত্বের জয়। নাটকটিকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিখুঁত করার চেষ্টা চলতো। অনেকবার অনেক সময় ছেলে বদলানো হতো, যেটা অনেক সময় মনে হতো এটা একটা জেদ। কিন্তু ওনার অভিনয় দেখে একথা মনে হয়েছে যে এখানেও একটা ছবি আঁকার চেষ্টা। একটি ছবিতে যেমন সবকিছু মিলিয়ে

থাকাই রীতি, একটি অসামঞ্জস্য যেমন সমস্ত ছবির Construction-কে নষ্ট কোরে দেয় তেমনি একটি দুর্বল নাটকীয়তা সমস্ত দৃশ্যটাকে ম্লান কোরে দেয়। তাই দেখেছি, স্টেজ, তার Depth তার hight থেকে পোষাক আশাক, অলঙ্কার, উষ্ণীষ প্রতিটির সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই বিবেচনা করতেন। তারপর হাঁটা চলা, হাত-পা নাড়া প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির similarity রেখে তবে সবদিক ঠিক করতেন। এরপর কথা বলা। শব্দ থেকে যে স্বর সৃষ্টি হচ্ছে তার স্পষ্টতা, শুধু বাচনভঙ্গী, স্বর নিক্ষেপণের দক্ষতা আর স্বর থেকে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তার শ্রুতিমধুরতা এবং স্বচ্ছন্দগতি যা অনায়াসে উপরে উঠতে পারে বা নীচে নাবতে পারে। এইসব দিক বিবেচনা কোরে এবং সবরকম সামঞ্জস্য সৃষ্টি মনে রেখেই কাজ করতেন যার ফলে অভিনয়টি ছন্দোময় ছবির মতো মনে হতো, তাই তাঁর কাছে মানুষের প্রত্যাশা ছিল অনেক। নিউ এম্পায়ারের শো হবার আগেই একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ১৯৬৭ সালের ৩রা জুলাই ওনার বড় বোনের স্বামী মারা যান। এই প্রথম আঘাতটা ওনাকে খুব বিচলিত কোরেছিল।

এরপর আরো বিপর্যয় এলো। মাস তিনেক পরেই মাত্র কদিন ভুগেই ওনার বাবা ২৬শে অক্টোবর পরলোক-গমন করেন। এইরকম পর পর আঘাত পাওয়ার ফলে উনি খুব মানসিক দুর্বল হয়ে পড়েন। পিতৃবিয়োগের এগারো দিনের দিন উনি যখন গঙ্গাস্নান এবং ঘাটের ক্রিয়া সেরে বাড়ী ফিরলেন তখন থেকেই একটু জ্বর জ্বর মতন। প্রথম দু'তিন দিন কিছু বোঝা যায়নি পরে জানা গেল একটা ইনফেকশান্ হয়েছে। আস্তে আস্তে সারা শরীরে ছোট্ট ঘামাচির মত দেখা দিল। মুখ নাক পর্যন্ত ফুলে গেল, কি সাংঘাতিক আকার ধারণ করলো। দারুণ ভোগ ভুগলেন। এসময় উনি ডঃ প্রশান্ত ব্যানার্জির চিকিৎসায় ছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত ভুগেছিলেন। সেইসময় থেকেই চেহারা খুব খারাপ হয়ে যায়। তারপর সেই আগের চেহারা আর কোনদিন ফেরেনি।

এর পর থেকেই শ্বাসকষ্টের প্রবণতা বাড়তে থাকে। কিছুটা ভালো হওয়ার কিছুদিন পর আবার একটা নিউ এম্পায়ারে শো হয়।

সেই সময়ে একটা রাজনৈতিক অস্থির অবস্থা চলছিল। আস্তে আস্তে তার আগুন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। স্কুল কলেজ বন্ধ হতে থাকলো। বোমা বারুদ, খুন-জখম বাস ট্রাম বন্ধ হওয়া একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে

দাঁড়ালো। তখন থেকেই সুরু হ'ল নকশাল মুভমেন্ট। আমাদের এরিয়াটা দারুণভাবে জড়িয়ে পড়লো। যাতায়াত অসম্ভব হয়ে পড়লো। সি, আই, টি, রোড থেকে বালীগঞ্জ প্লেস দুরত্ব কম নয়। তারপর অসুস্থ শরীর। সুতরাং এদিকে চলে আসবার চেষ্টা চলতে লাগলো।

১৯৭০ সালে ২রা ডিসেম্বর আমরা ৫০/ডি হাজরা রোডের তিনতলার ফ্ল্যাটে চলে এলাম। সি, আই, রোডের বাড়ীটা ছাড়তে আমাদের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। যেমন সুন্দর ছিল বাড়ীটা তেমনি ভদ্র ছিলেন সস্ত্রীক বাড়ীওয়ালারা। আমাদের চলে আসায় তাঁরাও খুব দুঃখিত হয়েছিলেন।

হাজরা রোডের তিনতলায় আসাটা আমাদের পক্ষে অসুবিধাই ছিল, বিশেষ, ওনার পক্ষে এতটা সিঁড়ি ভাঙা খবই কষ্টের হতো। কিন্তু তখন আর গত্যন্তর ছিল না তবে এটাই সবচেয়ে সুবিধা ওনার পক্ষে যে বাড়ীটা স্কুলের ছে, উনি পায়ে হেঁটে (প্রথমে) স্কুলে যেতে পারতেন।

ফ্ল্যাটটায় দুটো ঘর, খাবার জায়গা এবং ছাদ আছে। বেশ আলো হাওয়া আছে, তবে আমাদের জিনিষপত্র নিয়ে আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। তারপর মাধব আছেন।

এখানে আসার পরেই ঠাণ্ডা লেগে উনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একটা বাড়ী থেকে আর একটা বাড়ীতে উঠে আসার আর এক ঝামেলা। তারপর উনি অসুস্থ। এসময় আমি খুবই অসুবিধেয় পড়েছিলাম।

এই সময়ে অনেকের সঙ্গে আলাপ হয় এবং অনেক নতুন মুখের আমদানি হয়। আস্তে আস্তে উনি একটু ভালো হয়ে উঠলেন। এই সময়ে উনি বস্তির ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা স্কুল করেছিলেন। সেখানে তাদের পড়া শোনা এবং অভিনয় শেখানোর চেষ্টা চলতো। বেশ কিছুদিন ধরে স্কুলটা চললো। উনি মাঝে মাঝে অসুস্থ হতে লাগলেন, ছেলেমেয়েদের সংখ্যাও কমতে লাগলো। আস্তে আস্তে স্কুলটা উঠে গেল। আমার গোড়া থেকেই এই কথাটা মনে হোতো যে ধরণের প্রচেষ্টা উনি চালাচ্ছেন সেটা এরা নিতে পারবে না। অনর্থক। অনেক পরিশ্রম এবং অনেকটা শরীর পাতই সার হোল।

১৯৭১ সালের মাঝামাঝি ওনার মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, প্রায় মাসখানেক বেশ ভোগার পর একটু সামলে যান কিন্তু নভেম্বরের মাঝামাঝিতে যে অসুস্থতায় পড়লেন, আর সেরে উঠতে পারেননি। ৯ই ডিসেম্বর শেষ রাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বাবা চলে গেলেও ওনার মা ছিলেন, প্রকৃতির সঙ্গে যেন মাটির সংযোগ ধরা ছিল, কিন্তু মা চলে যেতে সবই যেন শূন্য হয়ে গেল। উনি খুব মুষড়ে পড়লেন। এই সময়ে অনেকেই ওনার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমার বাবা-মাও আসতেন। আমার বাবা ওনাকে একটি কথা বলেছিলেন, "তোমার মহাগুরুর পতন হয়েছে, সাবধানে থেকো বাবা"। এই 'মহাগুরুর পতন হয়েছে' কথাটি ওনার খুব পছন্দ হয়েছিল।

সি, আই, টি, রোডে থাকার সময় আমার বাপের বাড়ী খুবই কাছে ছিল। কিন্তু ১৯৬৭ সালে ওঁদের বাড়ী তৈরী হওয়ার পর নিউ আলিপুরে এইচ ব্লকে চলে আসেন। সেই সময়টায় আমি খুব ফাঁকা হয়ে গিয়েছিলাম। এমনিতে আমার যাতায়াত খুবই কম হোত। এখানে হাজরা রোডে আসার পর বাবা মা প্রায়ই আসতেন কিন্তু ১৯৭২ সালের জানুয়ারী থেকে হঠাৎ বাবা একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন, তারপর থেকে আর কোথাও যেতে আসতে পারতেন না। সুতরাং বাবা এরপর আর কোনদিনও হাজরা রোডে আসেননি।

এখানে আসার কিছুদিন পর থেকেই ছোট ছোট পত্রিকার ছোট ছোট সম্পাদকরা ওনার কাছে আসতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত এদের অনেকেই ওনার কাছে লেখা পেয়েছিলো। আমরা যখন পাতিপুকুরে ছিলাম তখন থেকেই 'এক্ষণ' পত্রিকাটির সঙ্গে ওনার যোগাযোগ হয়েছিল এবং 'এক্ষণ'এ ওনার অনেক লেখা প্রকাশ হয়। তারপর 'কৃত্তিবাস'এ লেখা দেন। তারও আগে কবীর সাহেবের 'চতুরঙ্গ পত্রিকাটি (আতোয়ার রহমানের সম্পাদনায়) যখন বার হয়, তখন লেখা দিতেন। এই পত্রিকাগুলির সঙ্গেই ওনার বিশেষ যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া, দেশ, আনন্দবাজার এবং আরও অনেক পত্র-পত্রিকায় ওনার লেখাও প্রকাশিত হয়েছে, তবে সেটা খুব বেশী নয়।

১৯৬০ সালে কথাশিল্প প্রকাশনার মাধ্যমে ওনার প্রথম বই 'অন্তর্জলী যাত্রা' প্রকাশিত হয়, পরে 'নিম অন্নপূর্ণা' এবং 'আইকম বাইকম'। আমরা হাজরা রোডে থাকাকালীন ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় "গল্প সংগ্রহ" (প্রথম ভাগ) প্রথমে এবং পরে 'দানসা ফকির' প্রকাশিত হয়। এরপর 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' এবং 'অন্তর্জলী যাত্রা'র ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই বই দুটি উনি আর দেখে যেতে পারেননি। ওনার অনেকগুলি বই এখনও প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। ১৯৭৭ সালে 'ঈশ্বর কোটির রঙ্গ কৌতুক'

প্রকাশিত হয়। একবার আমি ওনাকে প্রশ্ন করেছিলাম ওনার লেখার মধ্যে যে পদবিন্যাসটা দেখতে পাই সেটাতো আমরা ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমবাবু যাঁরা বাংলাভাষায় পিতৃতুল্য তাঁদের মধ্যেও দেখতে পাই না। প্রচলিত পদবিন্যাসের ধারাতো এটা নয়—'ফজল হয় ভালোলোক' এটা কেন হোল? উত্তরে উনি যা বলেছিলেন—"এটা অপ্রচলিত নয়, এ ধরণের পদবিন্যাস এককালে ছিল"। আমি আরও দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করায় উনি আমায় একটা বই বার কোরে দেখালেন। বইটা পড়ে আমি তো অবাক। তারপর থেকে আমি আর এ নিয়ে কখনো কথা বলিনি। বইটার পুরো নাম ঠিক মনে আছে কিনা বলতে পারি না তবে প্রথমটা ঠিক মনে আছে 'ব্রাহ্মণ্য যুগের ভাষা'। ভাষা কথাটা ঠিক কি না মনে করতে পারছি না। অন্য কিছুও হতে পারে। তবে 'ব্রাহ্মণ্য যুগের...' এটুকু ঠিক। আর একবার প্রশ্ন তুলেছিলাম 'লেখাটা যদি পড়বার জন্যে ছাপা হয়, আর সেটা যদি পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্য হয়, তাহলে...'? উনি যা বোলেছিলেন, যা মনে আছে, লেখকদের পাঠক তৈরি করার একটা দায়িত্ব থাকে। তবে এটাতো ভাবা ঠিক নয় যে পাঠক মাত্রেই বুদ্ধিহীন হবে, তারা কিছু বুঝতে পারবে না। এই কোরে কোরে গোটা জাতটা নষ্ট হয়ে গেল। তাদের mass ছাড়া ভাবা যাবে না। লেখাটা mass-এর জন্য লিখছি ভেবেই লিখতে হবে। তাছাড়া বহু লেখাইতো আছে, এ-লেখাটা না পড়ে তারা অন্য লেখা পড়তে পারে. আমিতো কাউকে পড়তে বলিনি। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা। অনেক সময় শোনা যায় উনি কিছু শেখাতে চান না, সে কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তরে যা ব'লেছিলেন, তারই কিছু......দিনের পর দিন রক্ত জল কোরে যেটা আমি জেনেছি. যেটা আমি শিখেছি, এককথায় সেটা জেনে ফেলবে? অনেক নিষ্ঠা চাই, অনেক কষ্ট করতে হয়, তবে হয়। অমনি বল্লুম আর হয়ে গেল তা হয় না। আমাকে কে শিখিয়েছে? একজন বল্লে—'মার্সাল প্রুস্ত সম্বন্ধে কিছু বলুন। আমি জিজ্ঞেস করলুম—কি এক কথায় বলতে হবে? এতটুকু ধৈর্য নেই, কেউ কিছু পড়বে না, চেষ্টা করবে না। কি ত্যাগ কোরেছে জীবনে? ত্যাগ ছাড়া কি জীবনে কিছু হয়? ঠাকুর বোলেছেন—কাঠুরে জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেল। কাটতে কাটতে সে যখন গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল তখন সে চন্দন গাছের সন্ধান পেল। তখন তার বস্তু লাভ হল।। ফাঁকি দিয়ে কি কিছু হয়? অন্য লোকে তার গলায় ঢুকিয়ে দেবে আর সে পাখীর

মতন বুলি ঝাড়বে, কপচাবে।

অধ্যয়ন আর অধ্যবসায় এ দুটো যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সে কথাটা প্রত্যেক ব্যাপারে প্রত্যক্ষ করেছি। শুধু সাহিত্য চর্চাই নয়, চৌষট্টি কলার একটিও বাদ ছিল না। একটিতেও অসম্পূর্ণতা ছিল না। এতৎসত্ত্বেও তিনি স্থির ছিলেন, নিজের মধ্যেই ছিলেন। তাই মানুষের কাছে তিনি ছিলেন এত শ্রদ্ধার, এত ভালোবাসার।

কাঠ-খোদাইএর কাজের সময় দেখতাম কি অমানুষিক পরিশ্রম। রাত-ভোর কাজ চলছে, হাত কেটে রক্তারক্তি, তবু বিরাম নেই। একটা ধারালো নরুন আর একটা বুলি, এতেই কি অপূর্ব কাজ হতো। 'পানকৌড়ি'র পুরো কাজ এবং ভরতচন্দ্রের কিছু কিছু। খুব সামান্য সাধারণ জিনিষ দিয়ে সব সময় কাজ করতেন কিন্তু তাঁর সৃজনীক্ষমতায় তা হয়ে উঠতো অপরূপ। যেমন সাধারণ বঙ্গলিপি বা 'তাম্রলিপি'র পাতায় স্কেচ বা সাদাকালোর কাজ অথবা সময়ে সময়ে জলরংএর কাজ কি এক অসাধারণ শিল্প সৃষ্টি কোরতো। তা বোলে বোঝানো যায় না। নাচ, গান সম্বন্ধেও গভীর জ্ঞান ছিল। দিশী, বিলাতী দুয়েরই ভক্ত ছিলেন। পড়াশোনাও চলতো প্রচুর। গলার volumeও ছিল তেমনি। ওনার অভিনয় লক্ষ্য করলেই বোঝা যেত foot stepএর ছিল বিশেষ ভঙ্গী। প্রত্যেকটি নাটকেই দেখা যেত এর শিল্প-সৌকার্যের ভঙ্গিমাময় গতিবিধি। সে ভূতেরই হোক আর রাজারই হোক। ভীমবধের, দুস্থ-প্রায় শায়িত 'ভীমের' স্টেজের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যাওয়াটা একটি অপূর্ব ভঙ্গিমাময় নৃত্য। ভালো গল্প যাঁরা লিখতে পারেন তাঁরাই যে শুধু ভালো গল্প করতে পারেন তা নয়, সেটা সব সময় সম্ভবও হয় না। এটা একটা আলাদা ক্ষমতা। এ ক্ষমতাটি ছিল দারুণ। আসর জমিয়ে জমজমাট আড্ডা দেওয়ার স্বভাব সুলভ ভাবটি ওনার বড় মজার ছিল। হঠাৎ খাদে নেমে লঘুরসের অবতারণা করেই দ্রুত লয়ে পঞ্চমে উঠে গম্ভীর রস সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছিল চমৎকার। তাই আড্ডায় থাকতো অপেক্ষমাণ প্রতীক্ষা। যেমন ছিল দরাজ মন, তেমনি ছিল প্রচণ্ড মেজাজ, প্রায় চণ্ডমুণ্ড দগ্ধ করার মতই। আমিও সময়ে সময়ে ঝাঁঝিয়ে উঠতাম, বলতাম, অনেক জন্মের সঙ্গী, তাই এবার আর সঙ্গে আসবো না, একদিন পাতিপুকুরে দুজনে খুবই কলহে লিপ্ত আছি, হঠাৎ ঠাকুরঘরে টুং টাং আওয়াজ হতে থাকলো। গিয়ে দেখি বিরাট একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ষাঁড়, গলায় ঘণ্টা বাঁধা, চুপ কোরে দাঁড়িয়ে আছে।

শিংএর দিকে চেয়ে আমি ভয়ে অস্থির। উনি বল্লেন, "বাবা বদ্রিনাথকে দেখতে এসেছে বেটা। কিছু করবে না"। সত্যিই, 'বেটা' তারপর চুপচাপ চলে গেল।

হাজরা রোডের বাড়ীতে থাকার সময় নাটকের মহড়া প্রায় চলতো, আবার বন্ধও হয়ে যেতো। ওনার শরীর খারাপের জন্যে উনি অনেক সময় বসে থাকতেন, ছেলেরা শেখাতো। দুবার বালীগঞ্জ শিক্ষা সদনে নাটকের শো হয়। উত্তরপাড় লাইব্রেরীতে এবং বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে ছেলেরা অভিনয় করে। ১৯৭৬ সালের শেষ দিক থেকে ওনার Arts and Crafts নাম দিয়ে একটা স্কুল খোলার ইচ্ছে হয়, যেখানে আঁকা, আবৃত্তি শেখা ও নানান ধরনের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে।

শরীর কিন্তু মোটেই ভালো যাচ্ছিল না। চিরকালই এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার বিরোধী ছিলেন তাই সব সময়ে হোমিওপ্যাথি করা হোতো। একটু ভালো হলেই ছেড়ে দিতেন সব। আবার নতুন ক'রে সুরু হোত। এবার সকলের পরামর্শ মত ম্যাকলিয়ড স্ট্রীটে ডাঃ গাঙ্গুলীর কাছে যাওয়া হল। তিনি আগে এ্যালোপ্যাথিক ছিলেন পরে এ লাইনে এসেছিলেন। বৃদ্ধ অভিজ্ঞ ডাক্তার হিসেবেই তাঁর যথেষ্ট নাম। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরের শেষাশেষি আমরা ওনার পেসেন্ট হই। একটা কথা ঠিক ওনার পক্ষে হোমিওপ্যাথি করাটাই প্রশস্ত ছিল, কারণ ১৯৬৭ সালে ওনার যে infection হয়েছিল তার ফলে অনেক কিছুই বিধি-নিষেধ ছিল। আমরা কয়েকবার ডাক্তারবাবুর কাছে যাবার পর ওনার মনেও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের বিশ্বাস জন্মাতে লাগলো। আমিও ভরসা পেলুম।

১৯৭৮ সালে ২৫শে এপ্রিল হঠাৎ আমার বাবা চলে গেলেন। আমার বাবা অনেকদিন যাবৎ ভুগছিলেন ঠিকই, তবে সেইদিনই যে মারা যাবেন বোঝা যায়নি। আমি পৌঁছানোর অল্পক্ষণের মধ্যেই বাবা চোখ বুঝলেন। আমার বাবার সঙ্গে ওনার বহুদিনের আলাপ। হৃদ্যতায়, ভালোবাসায় অন্তরঙ্গতা ছিল অনেক, তাই মনে হয় আমার মতন ওনারও লেগেছিল খুব। আস্তে আস্তে ওপরতলাটা ফাঁকা হয়ে এলো, নিয়মের জগতে এটাই ঠিক, কিন্তু মনের বেঠিক হিসাবে তার সায় মেলে না।

নানা রকম ঘাত-প্রতিঘাত, চিন্তাভাবনা ওনাকে ক্রমশঃ কাহিল করতে থাকলো। এই সময়ে আর্টস্ এ্যাণ্ড ক্রাফ্ট্সের স্কুলটা খোলার জন্যে ব্যস্ত

হলেন। পুজোর আগেই এটা করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু হঠাৎ গোড়াতেই দারুণ বৃষ্টি, বান বন্যায় কোলকাতা ভাসে ভাসে সুতরাং পড়লো। তারপর অনেকটা দ্বিধান্বিত অবস্থায় পুজোর আগে অক্টোবর মাসে উনি Statesmanএ স্কুলের একটা বিজ্ঞাপন দিলেন। সেটা দুর্গাপুজার মহাষ্টমীর দিন বেরুল— K. K. Mazumder's Arts and Crafts school. সুরতীর্থে ঘর নেওয়া হয়েছিল। পুজোর ছুটি চলছিল সুতরাং এসময়টা বাদ দিয়ে উনি Arts and Crafts স্কুলটা চালু করবেন কিন্তু তখন থেকেই ভর্ত্তির জন্যে খোঁজ খবর চলছিল।

নভেম্বরে স্কুল খুললো। শরীর কিন্তু ভালো নয়, মনের জোরেই চলছে। আমি বারবার জোর করছিলাম একটু বাইরে যাবার জন্যে, বাইরে থেকে ঘুরে এসে স্কুলটা খোলা হবে। উনি খালি বলছেন জানুয়ারীতে স্কুলটা খুলে দিয়ে ছেলেদের হাতে কিছুটা ভার দিয়ে উনি বাইরে যাবেন। নভেম্বরের শেষে একদিন সুরতীর্থে ঘুরে এলেন। গোড়া থেকেই আমার মনে হোতো শরীরের এই রকম অবস্থা নিয়ে উনি কি কোরে স্কুল কোরবেন।

কিছুদিন যাবৎ খাওয়া-দাওয়া নিয়ে খুবই ঝামেলা যাচ্ছিল। যে ধরণের খাদ্য ওনার খাওয়ার কথা সেটা উনি কিছুতেই খাবেন না। অর্থাৎ হাল্কা, প্রায় বয়েল (boil), শেষে খাওয়া প্রায় না খাওয়ার মতন হতে লাগলো। দারুণ জেদ—কাজেই ওনার পছন্দ মত কিছুটা করতেই হোত। কিন্তু সেটা শরীর কিছুতেই নিল না। ফলে অসম্ভব শরীর খারাপ হয়ে গেল। ক'দিনের মধ্যেই একটু একটু কোরে সারা শরীর ফুলে গেল। দারুণ অবস্থা, তেমনি সর্দি, কাশি শ্বাসকষ্ট। ডাক্তার ওষুধ দিলেন, আর একটু একটু করে সারা শরীরে মালিশ চলতে লাগলো। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে বেশ সেরে গেল। ১লা জানুয়ারী খুব ভালো ছিলেন, ২রা জানুয়ারী বাড়ী থেকে বেরিয়ে ম্যাকলিয়ড স্ট্রীটে ডাক্তারের কাছে গেলেন, নিউ মার্কেট ঘুরে কিছু জিনিষপত্র নিয়ে কলেজ স্ট্রীট ঘুরে সুস্থ ভাবেই বাড়ী ফিরলেন। বেশ ভালোই ছিলেন। কিন্তু ভালো থাকলেই জেদ বাড়ে, আবার সেই একই ব্যাপার। জানুয়ারীর মাঝা-মাঝি আবার একই ভাবে হাত পা মুখ ফুলে গেল। এবারও ডাক্তারবাবু ওষুধ দিলেন, মালিশ কিন্তু বন্ধ কোরে দিতে বললেন। খাওয়া দাওয়া প্রায় হতই না। কোনো ফুড শরীরে যাচ্ছে না। কিছুতেই কমপ্লান খাওয়ানো গেল না। ক্রমশঃ শরীরে আর কিছু থাকলো না। শরীর প্রায় রক্তশূন্য। সবাই বহুভাবে

এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার জন্যে অনুরোধ উপরোধ জানালো, কিছুতেই রাজী হলেন না।

প্রায় যখন সব শেষ, তখন ক'টাদিন আগে শুধু কমপ্লানটা খেতে সুরু করলেন। চলে যাবার আগের দিন ডাক্তার বদলানোর কথা বললেন। শেষের ক'ঘন্টা আগে সবই হলো। কিন্তু কিছুই হ'ল না। বাইশ ঘন্টার মধ্যে সব শেষ। ১৯৭৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী শেষ হলো সব। তবে একথা ঠিক আমিও বুঝতে পারিনি, আর যাঁরা কাছে ছিলেন তাঁরাও বোঝেননি যে এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে যাবে।

পুজো কোরে যখন আমি কাছে এলুম তখন সবাই অস্থির। আমাকেই মাধবের নাম শোনাতে হলো। যতবার বলেছি ততবার শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সে নাম উচ্চারণ হয়েছে। তারপর সব ধীর হয়ে এল, সব স্থির হয়ে গেল। শুধু ভেতরটা কেমন ঠাণ্ডা লাগলো আমার। আমি কাঁদিনি। চোখে আমার জল ছিল না।

আমার চোখে জল নেই, চেয়ে দেখি সবার চোখে কত জল। আমার চোখে কিছুই নেই। সবার চোখে কত জল, কত ভালোবাসা। আমার চোখে কেন নেই? মনে হয় কিছুই কি আমার ছিল না! তাই কি আজো নেই!! তাই কি কিছুই আমার থাকলো না!!!

কমলবাবু/সত্যজিৎ রায়

বছর পাঁচেক আগে কোনো এক শ্রাদ্ধবাসরে কমলবাবুর সঙ্গে দেখা হয়। আগে প্রায় সাক্ষাত হত ; কোনা একটা বিশেষ কারণে দীর্ঘকাল ছেদ পড়ে। ভদ্রলোককে দেখে অসুস্থ মনে হওয়াতে জিগ্যেস করলাম কী হয়েছে। বললেন হাঁপানি। তার জন্য কী করেন জিগ্যেস করতে বললেন, 'রাত্তিরে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকি।' প্রশ্ন করলাম, 'চিকিৎসে করান না ?' কমলবাবু বললেন, 'নাঃ। সাফারিং-এর মধ্যে একটা গ্র্যাঞ্জর আছে।'

কথাটা অন্য কেউ বললে আদিখ্যেতা বলে মনে হত ; কিন্তু কমলবাবুকে যারা চিনতেন তারা বুঝবেন এ ধরনের কথা তাঁর মুখে মানিয়ে যেত। তিনি মানুষটা ছিলেন একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া ; আর পাঁচ জনের সঙ্গে সে গড়নে বিশেষ মিল নেই। তাঁকে যে না চিনত, তার কাছে অল্প কথায় মানুষটাকে ফুটিয়ে তোলা আমার সাধ্যের বাইরে। অপোজবিরোধী এতগুলো দিক তাঁর চরিত্রের মধ্যে ছিল যেমন আর কোনো একজন মানুষের মধ্যে দেখিনি। নানান অসামান্য গুণের অধিকারী হয়েও, সেই সব গুণের বর্ণনা দিয়ে সমগ্র মানুষটাকে ফুটিয়ে তোলা যায় না। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মে তিনি যে শুদ্ধতা যে অসামান্য দরদ ও দীপ্তির পরিচয় দিয়েছেন ; তাঁর নাট্যপ্রয়াসে যে সাবলীল ছন্দোময়তা ও নিটোল পারফেক্‌শনিজমের নজির রেখে গেছেন ; দেশী-বিদেশী শিল্পকলাবিষয়ক প্রবন্ধে যে অগাধ পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ অনুভূতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর বেশভূষায় চলনে-বলনে এসবের সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল হত। তিনি যেন অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই একটি রুক্ষ, অমার্জিত, আটপৌরে চেহারায় নিজেকে সবার সামনে হাজির করতেন। তাঁর কথার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যেত ঠিকই—সত্যি বলতে কি, বাক্‌পটুতায় তাঁর সমকক্ষ কাউকে দেখিনি—কিন্তু প্রথম সাক্ষাতে সেই বাক্যের ধাক্কায় মানুষ টস্‌কে গেছে, এমন উদাহরণের অভাব নেই।

কমল মজুমদারের অনেক বাতিকের মধ্যে একটা বাতিক ছিল কাউকে না জানিয়ে অকস্মাৎ বাসা পরিবর্তন করা। সেই সব বাসস্থান সচরাচর এমন

জায়গায় হত যে একান্ত উদ্যমশীল ব্যক্তি ছাড়া আর কারুর পক্ষে হঠাৎ সেখানে গিয়ে পড়াটা হত প্রায় অসম্ভব। একবার—তার কিছুদিন আগেই কমলবাবু বিয়ে করেছেন—কোনো একটা কারণে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হতে হয়। গিয়ে দেখি দুটি ঘরের একটি ফ্ল্যাটবাড়ি। তার মধ্যে একটি ঘর সুপ্রশস্ত, অন্যটি অপরিসর। বড় ঘরে আসবাব বলতে একটি কাঠের টুল ও একটি কাঠের ডেস্ক। টুলের উপর একটি টেলিফোন। আর ডেস্কের উপর একটি অর্ধসমাপ্ত বিজ্ঞাপনের ছবি। বিজ্ঞাপনের বিষয় হল—'ছেলে-ছাপ পেপারমিন্ট'। কমলবাবু যে এই ফাঁকে কবে ফ্রী-লান্স বিজ্ঞাপন শিল্পী হয়ে গেছেন সেটা জানা ছিল না। টেলিফোনটা অবশ্য বাড়িওয়ালার; কিন্তু সেটা কেন কমলবাবুর ঘরে থাকবে সে-প্রশ্ন করে কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। আশ্চর্য এই যে, এই পরিবেশে কমলবাবুর পক্ষে কেন জানি বে-মানান মনে হয়নি।

কমলবাবুর সঙ্গে কবে এবং কোথায় প্রথম আলাপ হয় সেটা স্পষ্ট মনে পড়ে না। সম্ভবত ক্যালকাটা গ্রুপের একটি প্রদর্শনীতে। আমি তখন থাকি রাসবিহারী এভিনিউতে ত্রিকোণ পার্কের দক্ষিণে। আর কমলবাবু থাকেন পার্কের উল্টোদিকে সিডলি হাউসের এক তলায়। হেঁটে যাতায়াতে লাগে দু মিনিট। আমার বিশ্বাস আমার পিতৃপরিচয়ই কমলবাবুকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। উপেন্দ্রকিশোর সুকুমারের পরম ভক্ত ছিলেন তিনি। প্রায়ই সন্ধ্যায় আসতেন আড্ডা দিতে। একপেশে আড্ডা, কমলবাবু বক্তা, আমি শ্রোতা। লক্ষ্য করতাম কথার মধ্যে ফরাসী শব্দ এনে সেটা ফরাসী কায়দায় উচ্চারণ করতে পছন্দ করেন। একবার জিগ্যেস করলেন 'ভূর দোইফেলে'র কাছে একটা শিল্পসংগ্রহশালা আছে সেটা সম্বন্ধে জানি কিনা। তখন তাঁকে চেপে ধরতে বললেন বাড়ির গুরুজনদের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি নাকি বাড়িতেই খাটের তলায় ঢুকে ফরাসী শিক্ষা করেছেন। তাঁর চটের থলিতে যে একটা-না-একটা ফরাসী বই সব সময় থাকে সেটা লক্ষ্য করেছিলাম।

আলোচনা—বা মনোলগ—চলত প্রধানত আর্ট নিয়ে। আমি নন্দলাল-বিনোদের ছাত্র ছিলাম, এটা তাঁর চোখে আমাকে কিছুটা জাতে তুলেছিল। কমলবাবুকে তখন সমঝদার হিসেবেই জানি, স্রষ্টা হিসেবে নয়—যদিও এককালে তিনি নাকি 'উষ্ণীশ' নামে একটি পত্রিকা বার করতেন। এবং 'শনৈঃ' নামে নিজের কবিতার একটি সংকলন বার করেছিলেন। সে বই বা

পত্রিকা চোখে দেখিনি।

আর্টের কথা বলতে গিয়ে তাঁর জ্ঞানের বাইরেও যে জিনিসটা মুগ্ধ করত সেটা হল তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। আপাততুচ্ছ দৃশ্যের মধ্যে থেকেও তিনি যে সব ডিটেল্স আহরণ করতেন—যেটা পরে তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছিল—তা ছিল বিস্ময়কর। ক্যানিং-এর ঘাটের বর্ণনা দিতে গিয়ে অজস্র ডিটেলের মধ্যে নৌকার গায়ে আঁকা চোখ, নদীর অস্থির জলে তার প্রতিফলন, এবং সেই জল উছলে উঠে সেই চোখকে জলসিক্ত করার বর্ণনা 'অন্তর্জলি-যাত্রা'র অন্তিম ইমেজ হিসেবে ব্যবহার করার বহু আগে আমি কমলবাবুর মুখে শুনি। তাঁর পরিবেশকে তিনি যেমন তীক্ষ্ণ অনুভূতির সঙ্গে দেখতেন, তেমনি দেখতেন কোনো শিল্পবস্তুকেও। একটি পেন্টিং-এর সমগ্র কাঠামো, এবং সেই সঙ্গে তুলির প্রতিটি টান যেন একই সঙ্গে যাচাই করতে পারতেন।

তখন আমি বিজ্ঞাপনের অফিসে কাজ করি, আর কাজের ফাঁকে ফিল্ম করার স্বপ্ন দেখি। কমলবাবু দেখলাম ফিল্মের ব্যাপারে শু[illegible]ী নন, যথেষ্ট ওয়াকিবহাল বটে। আদিযুগের বহু দিশি, বিলিতি ছবি তাঁর দেখা আছে এবং স্মরণে আছে। 'ঘরে বাইরে' ছবি করার পরিকল্পনা হচ্ছে জেনে কমলবাবু মেতে উঠলেন। চিত্রনাট্য লেখা হচ্ছে, আর কমলবাবু ডিটেল্স জুগিয়ে চলেছেন। তাঁর মতে নিখিলেশ একটি 'ক্রাইস্ট-ফিগার'। 'গ্রামের পথ দিয়ে যেতে যেতে একবার মাথাটাকে কাঁটা ডালে রুখে যেতে দিল। ক্রাউন অফ থর্নস্!' সন্দীপের কিশোর চেলা অমূল্য পুলিশের গুলি খেয়ে ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল; পুকুরের জলে তার মাথা, দেহ সিঁড়ির ধাপে; অকস্মাৎ শান্তিভঙ্গের ফলে অমূল্যর মাথার ভাসমান চুলের পাশে গেঁড়িগুগলি ভেসে উঠল।

কমলবাবুর নিজেরও ফিল্ম করার ইচ্ছে ছিল। সম্ভবত কোনো কোনো বিশেষ কাহিনীর চিত্ররূপ তিনি কল্পনা করতে ভালোবাসতেন। দুটি কাহিনীকে আশ্রয় করে কিছু সময় ও চিন্তাও তিনি ব্যয় করেছিলেন। সেদুটি হল শরৎচন্দ্রের অভাগীর স্বর্গ ও রবীন্দ্রনাথের দেবতার গ্রাস। দুটিরই জন্য নাকি দু হাজারের উপর 'ফ্রেম-স্কেচ' করেছিলেন তিনি। তার মধ্যে অভাগীর স্বর্গ-র জন্য করা খান পঞ্চাশেক স্কেচ আমাকে দেখিয়েছিলেন। কমলবাবুর পরিকল্পিত চিত্ররূপে কাহিনীর সুরু জমিদার গৃহিণীর শবযাত্রা দিয়ে। দুপাশে বনবন, মাঝখানের পথ দিয়ে শবযাত্রা চলেছে কীর্তনের

সঙ্গে। ঝোড়ো বাতাসে কলাপাতা আন্দোলিত হচ্ছে, রাস্তা থেকে খই উড়ে গিয়ে মাঠে পড়ছে।...

ঘরে বাইরের জন্যও নাকি হাজার খানেক (হাজারের কমে কথা বলতেন না তিনি) স্কেচ করেছিলেন, কিন্তু অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তার একটিও দেখান নি।

সেই সময় প্রায় প্রতি শনিবারই একসঙ্গে ফিল্ম দেখতে যাওয়া হত। ছবি সম্বন্ধে কমলবাবুর মতামতও ছিল গতানুগতিকের বাইরে। 'ব্রীফ এনকাউন্টার' দেখে প্রশংসা করেই বললেন, 'ঠিক যেন অরপেনের ছবি'। 'রাশো-মন' দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ; কমলবাবুকে জিগ্যেস করাতে বললেন, 'যেখানে পুলিশটা ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে নদীর পাশে দিয়ে যাচ্ছে, সেই জায়গাটা ভালো'। একদিন কমলবাবুর সঙ্গে মেট্রোতে ঢুকছি, এয়ার কণ্ডিশনের-এর হিমেল দমকার সঙ্গে সঙ্গে একটা গন্ধ এলো নাকে। জিগ্যেস করলাম, 'আপনার থলিতে কী?' কমলবাবু চটের থলে ফাঁক করে দেখালেন—মাংস। গরুর মাংস। সেই প্রথম জানলাম যে তিনি নাকি সম্প্রতি একটি অ্যালসেশিয়ানের মালিক হয়েছেন।

ইতিমধ্যে কমলবাবুর আরো কয়েকটি গুণের পরিচয় পেয়েছি। 'তদন্ত' নামে তিনি একটি গোয়েন্দা পত্রিকা বার করছেন। কথা বলে দেখলাম বিশ্বের গোয়েন্দা সাহিত্য তাঁর নখদর্পণে। এর মধ্যে রিখিয়া থেকে একটা পোস্টকার্ড এলো; একদিকে অপটু হাতে কলমে আঁকা একটি ল্যাণ্ডস্কেপ, অন্যদিকে একটিমাত্র লাইনে লেখা—'উল্টোদিকের ছবিটা আপনার হাসির জন্যই—ক. মজুমদার'। অতি অল্পকালের মধ্যেই কিন্তু আঁকায় আশ্চর্য উন্নতি দেখা গেল। সাদা পোস্টকার্ডে পেন্সিল ও জলরঙে আঁকা নানান চেনা ভঙ্গিমায় মেয়ে পুরুষের ছবি। তলায় একটি করে ক্যাপশন। আরাম কেদারায় এলোচুলে অলসভঙ্গিতে শায়িতা মহিলা, ডান হাত মাথার পিছনে তোলা, ওষ্ঠপ্রান্তে স্মিতহাস্য, দৃষ্টি বাঁয়ে কোনো অদৃশ্য ব্যক্তির প্রতি। ক্যাপশনে মহিলার প্রশ্ন—'আপনি ফুল ভালবাসেন কেন?'

কফি হাউসের স্মৃতির মধ্যে কমলবাবুর কথার ধারের কথাটাই সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে। জনৈক বামপন্থী কবি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য হল—'ভদ্রলোক সোস্থাল কনটেন্ট না থাকলে নস্যি নেন না।' চাষী-মজুরদের হাল সম্পর্কে শহরের মার্কসিস্ট বাবুরা উৎকণ্ঠিত সে কথা চাষী-মজুর জানে কি? কমলবাবুর

ভাষায়, 'ব্যাঙের একটা লাতিন নাম আছে ব্যাঙ তা জানে কি?' কমল-বাবুকেই প্রথম দেখলাম, একজন সাহেবকে 'ওই ফরসা ভদ্রলোকটি' বলে উল্লেখ করতে। তির্যক রসিকতায় কমলবাবুর জুড়ি ছিল না, এবং সেই রসিকতা ব্যক্ত করার ভাষার উপর দখল ছিল সাংঘাতিক। কফি হাউসে আমাদের এক বন্ধু প্রত্যহ নিয়মিত ডবল ডিমের অমলেট খেতেন। কমলবাবু একদিন আর থাকতে না পেরে বললেন, 'ডিমের অতখানি করে খেলে পাঁচটা মেয়েমানুষ রাখতে হয় গো!'

১৯৫৫ সালে পথের পাঁচালী ছবি মুক্তি পাবার পর অনেকবার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও কমলবাবুর মনে ছবিটা দেখা সম্বন্ধে কোনো উৎসাহ সঞ্চার করতে পারিনি। আমি অবিশ্যি নিরুদ্যম হইনি। শেষে একদিন যখন সত্যিই দেখলেন, তখন হঠাৎ যোগাযোগ বন্ধ করে দিলেন। আমারই এক পরিচিতের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় রাস্তায়, তাকে বললেন ছবিতে মাত্র একটি দৃশ্য ভালো লেগেছে—যেখানে অপু-দুর্গা চিনিবাস ময়রার পিছনে ধাওয়া করে। খবরটা শুনে কিঞ্চিৎ অভিমান হয়েছিল; রাশো-মন কেন যে একথায় বাতিল করেছিলেন সেটা ভেবে কোনো সান্ত্বনা পাইনি।

এর বেশ কিছুদিন পরে যখন ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার দেখা হয়, তখন ছবিটির প্রসঙ্গ আর তুলিনি, আর মনেও সেই সম্পর্কে আর কোন উষ্মার ভাব ছিল না; কারণ ততদিনে হৃদয়ঙ্গম করেছি পল্লীগ্রামের জীবন নিয়ে ছবি করে কমলবাবুকে খুশী করার মত ক্ষমতা আমার নেই।

কমল মজুমদারের মানুষ ও ভাষা/আলোক সরকার

'খেলার প্রতিভা' উপন্যাসের শুরুর দিকে কমলকুমার মজুমদার বিদ্যাসাগরের, অর্থাৎ বিদ্যাগাসরের ভাষা, শব্দ ব্যবহারের সূক্ষ্মতা একদিন অন্তত স্বপ্নে দেখবার আকাঙ্ক্ষা করেছেন। কমলকুমারের পাঠকেরা বলা বাহুল্য এই প্রস্তাবে সচকিত হবেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষায় একাগ্রতা এবং অনিবার্যতা কমলবাবুর গদ্যে নেই, এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই নেই ; বিদ্যাসাগরের গদ্যের ঋজু অন্বয়ের দৃঢ়তা তিনি কেবল সচেতনভাবেই উপেক্ষা করতে চান নি, বাংলা-ভাষায় প্রচলিত অন্বয়ের রূপান্তর ঘটিয়ে তিনি এমন এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দিতে চেয়েছেন যা পাঠকদের কাছে অপরিজ্ঞাত এবং তার অনুধাবন নিশ্চিতভাবেই শ্রমসাধ্য। বিদ্যাসাগরের ভাষার অন্বয় প্রাঞ্জল এবং শব্দপ্রয়োগ অমোঘ, স্থিরলক্ষ্য, তা পাঠককে অভীষ্ট অর্থের সঙ্গে অনিবার্যভাবে সংযুক্ত করে, কমলবাবুর গদ্য প্রত্যক্ষত তা করে না। 'কৌরব' পত্রিকায় প্রকাশিত 'খেলার বিচার' নামের গল্পের শুরুতে তিনি ঠাকুরের কাছে ভাষার সরলতার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন, সেই সরলতা যা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাকে সহজভাবে প্রকাশ করতে পারে। 'ঠাকুর করুন, যাহাতে আমরা অতীব গ্রাম্য —আমাদের নিজস্ব জীবনের ঘটনা সরলভাবে লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি।' বলাবাহুল্য কমলবাবুর এই প্রস্তাবও পাঠকদের বিচলিত করবে। সরলতা বলতে, ভাষার প্রকাশের সরলতা বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি কমলবাবুর গদ্য তা কখনোই নয়, এবং সচেতনভাবেই তার বিরোধী।

উক্তি এবং কার্যের এই বিরোধ কমলবাবুর ভাষার প্রসঙ্গে কিন্তু আপাত-ভাবেই সত্য কিংবা শেষ সত্য নয়। এটা আমরা সবাই জানি ভাষার একমাত্র কাজ কেবল ভাবনার প্রকাশ নয়, সৌন্দর্যসৃষ্টিও। কমলবাবু ভাষার ব্যবহার, শব্দের প্রয়োগকে উভয়দিক থেকেই ভাবতে চেয়েছিলেন। যে মানুষদের তিনি লিখতে চেয়েছিলেন, যাদের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করতে চেয়েছিলেন মনে রাখতে হবে তারা 'অতীব সরল', 'অতীব গ্রাম্য'। এই সরল মানুষেরাই তার ভাবনার বিষয়, সাধারণ মানুষেরা নয়। সাধারণ মানুষ ওপর থেকে পাওয়া সংস্কার এবং সংস্কৃতির ফসল, তাদের সাজপোশাক বানানো, ভাবভঙ্গী

বানানো, এমনকি রাগ-অনুরাগ স্বপ্নও বানানো। সাধারণ মানুষ সার্বিক মানুষ। ভাষাও সার্বিক এবং কৃত্রিম—মানুষ তাকে তৈরি ক'রে নিয়েছে, সে রচনার পিছনে কাজ করেছে সার্বিক প্রয়োজন এবং চরিত্র। এই কৃত্রিম ভাষার মধ্যবর্তিতায় কলুষিত সাধারণ মানুষদের জীবনকাহিনী রচনা করা দুরূহ কর্ম নয়। কিন্তু মানুষ যেখানে সরল, যেখানে সে প্রকৃতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ, তার 'বোধিত হওনের ধারা' অকলুষিত, তার উপাদান এবং ভিত অর্থাৎ পটভূমি বা ঐতিহ্য অনাবরণ সেখানে সাকল্যিক উপকরণে তাকে 'বিস্তার' করা কঠিন কাজ। খাঁটি বিশুদ্ধ অকলুষ মানুষ সার্বিক এবং কৃত্রিম ভাষার সহযোগিতায় তাকে কেমন ক'রে বর্ণনা করা যাবে? 'যে এখন আমরা এখানেতে নিজেরে বিস্তারিব ; যাহা ঘটিল, তাহারে নির্মাণ করি ; এবং এই অভিমান ভুয়া না হউক, যে মানে, আমাদের বোধিত হওনের যেমন ধারা, যেমন প্রকৃতি, যেমন উপাদান, যেমন ভিত তাহা এইটিতে উল্লেখিত থাকিবেক ; যে আমরা হই অতীব সরল, যেইটি হয় আমাদের সব।'

কিন্তু উপস্থাপন করতে হবে, এবং এই অকৃত্রিম চেতনাগুলির যেমন ধারা, যেমন প্রকৃতি, যেমন উপাদান, যেমন ভিত তার উপস্থাপনের প্রয়োজনে গ্রহণ করতে হবে ভাষারই মাধ্যম। যে শব্দ কৃত্রিম, যে ভাষারীতি সাকল্যিক এবং যা নির্মিত হয়েছে সামাজিক নিয়ম-নিরুদ্ধ মানুষের ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে, অকলুষিত মানুষের উপস্থাপনের তাগিদ তাকেই আশ্রয় করবে। ভাষার শব্দের এই সীমাবদ্ধ সমস্যা কবি-সাহিত্যিকেরা অনেকদিন ভেবে আসছেন। অন্যভাবে মালার্মে এই সমস্যার কথা উপলব্ধি করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও করেছিলেন। অর্থ দিয়ে আবদ্ধ ভাষার মধ্যবর্তিতায় Ideal Beauty অথবা অমূর্ত সৌন্দর্যের নিকবর্তী হওয়ার সংকল্পে মালার্মে সীমাবদ্ধ ভাষাকে নতুন ক'রে সাজিয়ে নিতে চেয়েছিলেন—যতিচিহ্ন কমিয়ে, নতুন শব্দ সংগ্রহ ক'রে এবং কখনো-কখনো প্রচলিত অন্বয়ের বিধি অমান্য ক'রে তিনি উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও জানতেন মানুষের ভাষা 'অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে', এবং অবিরত ব্যবহারে তার প্রাণশক্তি ক্রমশই এমন ক্ষীণ হয়ে আসছে যে 'পরিস্ফুট তত্ত্ব' ছেড়ে অমূর্ত-লোকে সংগীতের মতন স্বাধীনভাবে পৌঁছবার ক্ষমতা তার আর নেই ('ভাষা ও ছন্দ')। কমল-কুমারকেও এই ভাষার সমস্যা, বলাবাহুল্য ভাবিয়েছিল।

Ideal Beauty যা [illegible] ষ্ট ছিল, রবীন্দ্রনাথের 'ভাবের স্বাধীন

লোক', কমলকুমারের অন্বিষ্ট ছিল Ideal Man। উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে মালার্মে কবিতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগীতের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন, কমলকুমার ভাষার প্রচলিত অন্বয় ভেঙে এবং নিবিষ্ট একক প্রতীক ব্যবহার ক'রে তার Ideal Man-র জীবনযাপন, তার বিশুদ্ধতাকে অভিব্যক্ত করতে চেয়েছেন। কমলকুমারে ভাষার যে প্রাচীনগন্ধী রহস্যময়তা, মনে হয়, তাও একই লক্ষ্যের প্রতি নিবিষ্ট।

মানুষ যেখানে বিশুদ্ধ অকলুষ সেখানেই সে রহস্যময়, উপলব্ধি যেখানে বিশুদ্ধ অকলুষ সেখানেই তা রহস্যময়। মালার্মে যে রহস্যময়তাকেই কাব্যের অন্তর্লীন সত্য হিসেবে জেনেছিলেন, তার মৌল অনুপ্রেরণা ছিল তার অনির্ভর সৌন্দর্যজগতের উপস্থাপনের সংকল্প। রোম্যান্টিকদের মতো তিনি এই রহস্যকে কেবল আলোছায়াময় অবগুণ্ঠিতা সত্তা বলেই চেনেননি, রহস্যকে তিনি নির্মাণ ক'রে নিতে চেয়েছিলেন এবং তার পিছনে কাজ করেছিল তার সচেতন প্রয়াস। এই কারণে তার কাব্যপ্রকরণ এবং শব্দবিন্যাসকে অবশ্যই কৃত্রিমতার আবরণ গ্রহণ করতে হয়েছিল, যেমন কমলকুমারের। কমল মজুমদারও আদর্শ মানুষের সরল অপকট জীবনযাপনের উপস্থাপনার প্রয়োজনে ভাষাকে অতিরিক্ত, এবং কখনো বা আপাত অপ্রয়োজনীয় অলংকার পরিয়েছেন। বিশুদ্ধ অকলুষ মানুষ, রহস্যময় অকপট সরল মানুষের বর্ণনার তাগিদে এটা আবশ্যক ছিল।

প্রাত্যহিকতার গ্লানি থেকে কবিতাকে মুক্ত করতে রোম্যান্টিকরা প্রাচীনতার সাহায্য নিয়েছিলেন, মধ্যযুগ, প্রাচীনকাল, তার আবহাওয়া তাদের উপকরণ-গুলির অন্যতম ছিল। অতীত কখনোই পুরো বাস্তব নয়, তা বাস্তব এবং অবাস্তবের মধ্যবর্তী সেতু, তার অনেকটাই আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত। কমলকুমার ভাষাকে যে প্রাচীনতার মুখোশ পরিয়েছেন, মনে হয়, তার পিছনেও তার তথাকথিত বাস্তবের প্রতি অনীহা কাজ করেছিল। বাস্তব মানুষ সাধারণ মানুষ, সংস্কার এবং ওপর-থেকে-পাওয়া রুচি শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর নিয়ন্ত্রিত, তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বনির্ভর বিশুদ্ধ মানুষ নয়। তারা প্রাত্যহিকতার গ্লানির ভিতর খণ্ডিত। তাদের ঐতিহ্য কোনো ধারাবাহিকতা নয়। এই ঐতিহ্যহীন কৃত্রিম মানুষদের পাশে রেখে, আদিম অপকট স্বাভাবিক মানুষদের কথা বলার প্রয়োজনে কমলকুমার কেবল প্রাচীন পরিবেশই ব্যবহার করেন নি, ভাষাকেও পরিয়েছেন প্রাচীনতার আবরণ।

কমল মজুমদারের শেষদিকের সব রচনাই সাধুভাষায় রচিত। সেই সাধু-ভাষা বিদ্যাসাগরের সাধুভাষা নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের নয়, এমনকি বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তীকালের সাধুভাষাও নয়। সেই ভাষার প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার অথবা রামমোহন রায়-এর নাম। এবং সেই মনে-পড়ার একমাত্র হেতু তাদের ভাষার অস্থিত অন্বয়-বিন্যাস। মৃত্যুঞ্জয় এবং রামমোহনের অপরিণত অন্বয়ের জটিলতা, বলাবাহুল্য, ইচ্ছাকৃত নয়, তা অবিমিশ্র অজ্ঞানতাই, স্বচ্ছ ধারণার অভাব, কমলকুমারের ভাষার জটিল অন্বয় ইচ্ছাকৃত এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। সেই ভাষার প্রসঙ্গে আরো বেশি মনে পড়তে পারে খ্রীষ্টান পাদরীদের নতুন-শেখা বাংলা ভাষারীতির কথা। কিন্তু সেই ভাষা তো এক ধরনের মজার-ই উদ্রেক করে এবং বালা ভাষাভাষী-দের মধ্যে যখন সেই ভাষা উল্লিখিত অথবা ব্যবহৃত হয়, কৌতুকের প্রয়োজনেই হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভূতপত্‌রীর দেশে'র 'কিচ্‌কিন্দের গল্পে' এই ধরনের ভাষার একটা দৃষ্টান্ত আছে এবং আমোদ-কৌতুকের তাগিদেই আছে। 'ধন্যবাদ তোমাকে বাবু, আমি ব্যগ্রভাবে ভরসা ও প্রত্যয় করিতেছি যে ঐ কুলীন উদাহরণ এই আলোকসম্পন্ন সাধারণ ভূতবান উড়িষ্যার কুমার কৃষ্ণ কিচ্‌কিন্দার হইবে অনুগমিত সকল রাজা মহারাজা জমিদার ও যোত্রসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারাই নিজের বন্ধুর এবং হারুন্দে ইত্যাদির মতো বেচারা গরিব এবং ছাড়া-পাওয়া ভদ্রগণের অপেক্ষাকৃত ভালো করিবার নিমিত্তে।' ইংরেজি বাক্য-রীতি এবং শব্দার্থকে সরাসরি বাংলায় আনতে গিয়ে পাদরীরা মহাফাঁপরে পড়েছিলেন, প্রশ্ন হচ্ছে কমলকুমার ইচ্ছে ক'রে কেন সেই ফাঁদে পা দিলেন। কী দরকার ছিল 'ফজল হয় ভালো লোক, কেননা খোদা তার উপর দয়া রাখেন' লেখার। বাংলা বাক্যে অপ্রয়োজনীয় ক্রিয়ার ব্যবহার অত্যাবশ্যক নয়, এবং 'শেষের কবিতা'র 'অমিত রায় ব্যারিস্টার-'র থেকে বুদ্ধদেব বসু এবং আরো অনেকের প্রচেষ্টার বাংলা বাক্য যথাসম্ভব অপ্রয়োজনীয় ক্রিয়াবর্জনের দিকে ঝুঁকেছে। এবং তা হয়ে উঠতে চেয়েছে প্রাত্যহিক বাক্‌ভঙ্গীর কাছাকাছি। কমলকুমার এখানে, এইবাক্যে কেবল আপাত অতি অনাবশ্যক 'হয়' ক্রিয়াটিই ব্যবহার করেন নি। বাঙালীর বাক্‌রীতিকে অমান্য করতে চেয়েছেন। কী ক্ষতি ছিল 'খোদার দয়ায় ফজল ভালো লোক' এই সাদামাঠা বাংলা বাক্য লেখায়? ক্ষতি কি ছিল, দুটি বাক্য পাশাপাশি রেখে পড়লেই আমরা বুঝতে পারি। বুঝতে পারি

অস্বাভাবিকতা কেমন ক'রে আমাদের রহস্যময় গায় ধূসর সবুজ. স্বাভাবিকতায় পৌঁছে দেয়।

মালার্মে, সুধীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, মনে করতেন 'কাব্য রচনা শব্দসাপেক্ষ এ-কথার মানে এমন নয় যে সে-জন্যে ব্যাকরণের বিধি-নিষেধ, অথবা ভাবনার পরিণতি বর্জনীয়, তার তাৎপর্য শুধু এই যে কবিতায় উক্তি ও উপলব্ধি অভিন্ন, তাতে অপরিপক্ক ধারণার স্থান নেই, এবং ভাষার সঙ্গে একেবারে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত ভাব ভাবুকের আয়ত্তে আসে না।' ('শতভিষা', দ্বিচত্বারিংশ সংকলন, অরুণকুমার সরকারকে লেখা চিঠি)। কমলবাবু অন্তত ভাষার অন্বয়ের ক্ষেত্রে ব্যাকরণের বিধিনিষেধ মানেননি, তার কাছে সেটা নিশ্চিতভাবেই বর্জনীয় ছিল যেহেতু ভাব ও ভাষার একাত্মীকরণই ছিল তার অনন্য অন্বিষ্ট। প্রথম বাংলা গদ্যরচয়িতাদের বেলায়, পাদরীদের বেলায় যেটা ছিল অক্ষমতা, তার কাছে সেটি সচেতন প্রয়াস। উক্তি ও উপলব্ধি অভিন্ন জেনে, ভাব ও ভাষার ঐক্যসাধন প্রয়োজনে ভাষার প্রচলিত অন্বয়ের বিধিনিষেধকে অস্বীকার ক'রে তিনি দ্বিতীয় বিধিনিষেধের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। আপাত বিশৃঙ্খলার ভিতর তিনি চেয়েছিলেন শৃঙ্খলাকে, অথবা র‍্যাবো যাকে 'সুশৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা' বলেছিলেন হয়তো এ-প্রয়াস তার কাছাকাছি।

এই যে 'সুশৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা' এর পিছনেও কাজ করেছে, মনে হয়, তার লুপ্ত ঐতিহ্যের প্রতি মোহ অথবা আদিমতার প্রতি আকর্ষণ। আদিমতা অর্থাৎ অকলুষতা যে অর্থে প্রকৃতি অকলুষ। প্রকৃতির প্রয়াস এবং গঠন শৃঙ্খলবিহীন, বন্য, যেহেতু তার প্রয়াস এবং গঠনের পিছনে কোনো বিশ্লেষণী অন্বেষক আগ্রহী চেতনা কাজ করে না, প্রকৃতির যে শৃঙ্খলা তা অন্তর্লীন শৃঙ্খলা, সহজতার স্বাভাবিকতার শৃঙ্খলা। সেই সহজতা, সেই স্বাভাবিকতা বাহিরের প্রসাধনে নিজেকে সাজায় না, কোনো আরোপিত আইনকানুন তার আইনকানুন নয়। যে কোনো নিষ্ঠাবান শিল্প সমালোচকের দৃষ্টিতে প্রকৃতির শিল্প ত্রুটিপূর্ণ, যে কোনো সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে প্রকৃতির প্রয়াস অসংস্কৃত। প্রকৃতি বিশৃঙ্খল কিন্তু এই আপাত বিশৃঙ্খলার মধ্যবর্তিতাতেই অভিব্যক্ত হয় তার অন্তর্লীন সহজতার স্বাভাবিকতার ছন্দ। এই সহজতা এই স্বাভাবিকতা সুশৃঙ্খল সবুজ তাজা। সে তার মৌল লক্ষ্য থেকে কখনো ভ্রষ্ট নয়। আদিম মানুষ, প্রাকৃতিক মানুষদের নিজস্ব কথা 'বিস্তারিতে' তাই কমলবাবু প্রকৃতির

কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শরীরের আপাত বিশৃঙ্খলাকে গ্রহণ করেছিলেন ভাষার বিন্যাসে, এবং তার ভিতর দিয়েই পৌঁছতে চেয়েছিলেন সহজ মানুষের অন্তর্লোকে।'

সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে তৎসম শব্দের, অপ্রচলিত শব্দের প্রাচুর্য আছে, কমলবাবুর গদ্যে সংস্কৃত অথবা ভারী শব্দের ব্যবহার কম, এমনকি আঁকাড়া গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করার দিকে তাঁর ঝোঁক বেশি। এদিক থেকে তাঁর প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে প্রায় জীবনানন্দের কবিতার ভাষার কথা। সুধীন্দ্রনাথের গদ্য স্পষ্ট, তার অন্বয় নিশ্চিত এবং উপলব্ধ যুক্তিনির্ভর ভাবনাকে যথাযথ ও দ্ব্যর্থবিহীনভাবে প্রকাশ করাতেই তার সিদ্ধি। কমলবাবুর গদ্য অস্পষ্ট, তার অন্বয় অপরিচিত, তার ভাবনা মননির্ভর ওপর-থেকে-পাওয়া যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে আদিম সাকল্যিক সহজতার রহস্যময় সবুজ প্রদেশকেই আকাঙ্ক্ষা করে। সুধীন্দ্রনাথের গদ্য মননির্ভর, কমলবাবুর গদ্যের মতোই তা কৃত্রিম, কিন্তু সেই নির্মাণের পিছনে কাজ করেছে শিক্ষিত সংস্কৃত সভ্য মানুষের ভাবনা বিশ্লেষণ। কমলবাবুর গল্প-উপন্যাসে আদিম মানুষেরা তাকে ও-পথ নির্বাচন করতে উৎসাহিত করেনি।

জীবনানন্দ দাশ কবিতায় কখনো-কখনো সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতেন। তৎসম অথবা ভারী শব্দ ব্যবহার করার দিকে তাঁর কোনো অতিরিক্ত ঝোঁক ছিল না। জীবনানন্দ সবসময় সাধু ক্রিয়াপদের সাহায্য নিতেন না, সাধুভাষার, মাঝে-মাঝে নিতেন, মাঝে মাঝে এমনকি পাশাপাশি সাধু এবং চলিত ভাষা ব্যবহার করতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। এই পদ্ধতির ভিতর দিয়ে, সাধুভাষা এবং সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে, এবং আরো অনেক সচেতন নির্মাণ কৌশলে জীবনানন্দ তাঁর কবিতাকে কেবল যে একটা বৈশিষ্ট্য দিতেই সক্ষম হয়েছিলেন তা নয়, কবিতাকে দিতে পেরেছিলেন এক রহস্য-ময়তার আবরণ, যে রহস্যময়তা রোম্যান্টিকদের এমনকি মালার্মেরও অভিষ্ট ছিল। কমলবাবুর ভাষারীতি, ভাষা-বিন্যাসের অন্যতম সূত্র হয়তো এখানে পাওয়া যাবে। যদিও জীবনানন্দর মানুষেরা প্রধানত আধুনিক মানুষ, কমল-বাবুর মানুষেরা আদিম। জীবনানন্দর কবিতার যে রহস্যময়তা তার অনেকটাই কাব্যগত কৌশল, তার লক্ষ্য সৌন্দর্য অথবা আবহাওয়া সৃষ্টি যতোটা, ভাবনা-প্রকাশের ত্বাগিদ ততোটা নয়। কমলকুমারের রহস্যময়তা ভাবনা-প্রকাশের প্রয়োজনে, বিষয়ের চাহিদায় অনিবার্য।

সংবেদনী চিত্রকল্প এবং অপ্রচলিত অন্বয় কমলবাবুর ভাষাকে সাধারণ অর্থে অপরিচিত ও সুদূর ক'রে তুললেও শেষ পর্যন্ত তিনি আন্তর অর্থে বিদ্যাসাগরের সূক্ষ্মতাই কামনা করেছিলেন এবং সরলতাই তাঁর একমাত্র অন্বিষ্ট ছিল। কেবল সেই সূক্ষ্মতার তাৎপর্য আলাদা, সরলতার চরিত্র অন্যরকম। মনে রাখতে হবে বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরই প্রথম, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, প্রাঞ্জল গদ্য রচনা করেন। প্রায় সুধীন্দ্রনাথের মতো বিদ্যাসাগরের গদ্যও লক্ষ্যের দিকে একাগ্র, অতিকথন নয়, দ্ব্যর্থবোধক নয়, অমোঘ এবং যথার্থ। বিদ্যাসাগরের শব্দব্যবহারের বক্তব্যের নিশ্চিত অভিব্যক্তির প্রয়োজনে, যেমন সুধীন্দ্রনাথের, কমলবাবুও অন্যভাবে ভাষা এবং শব্দের যাথার্থ্য এবং অমোঘতা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। উল্লিখিত লেখকের সঙ্গে তার তফাৎ ভাবনাগত, বিষয়গত এবং চরিত্রগত। যে সহজ সাধারণ প্রাকৃতিক মানুষদের কথা তিনি বলতে চেয়েছিলেন তাদের অকলুষতা যাতে কোনোভাবে নষ্ট না হয় সেদিকে তাঁর সচেতন এবং আন্তরিক মনোনিবেশ ছিল। তিনি জানতেন শব্দের অপপ্রয়োগে ঘোয়ো ভাষায় তাদের বর্ণনা করতে গেলে অনেক দূর থেকে তাদের বর্ণনা করা হয়, তাদের দেখতে চাইলে অনেকদূর থেকে দেখা হয়। নিশ্চিত স্থির লক্ষ্য শব্দ চাই। 'হে মীরার প্রভু, হে ঠাকুর, আমাদের ভাষাজ্ঞান অতীব ঘোয়ো, এখানে ঐ 'উল্লাস' শব্দপ্রয়োগে জানি আমাদের পাপ হইল। হায় উহাদের আমরা অনেক দূর হইতে, অনেক জন্মের এদিক হইতে নেহারিলাম! ইহাতে, এই ব্যবহারের, অখণ্ড মহারাজ আমাদের দুষমন বলিতেন। আঃ বিদ্যাসাগর, তোমার সূক্ষ্মতা আমরা একদিন অন্তত স্বপ্নে দেখিব—তবে ঐ পাপ যাইবার ('খেলার প্রতিভা')। 'ঘোয়ো' অর্থাৎ অতি ব্যবহারে রুগ্ন ভাষারীতি শব্দকে পরিত্যাগ করে কমলকুমার মজুমদার ভাষারীতি ও শব্দের সেই সূক্ষ্মতা সেই সরলতা আজীবন অন্বেষণ করেছিলেন যা তার তাজা সবুজ স্বাভাবিক মানুষদের ওপর থেকে পাওয়া শিক্ষা-দীক্ষা রুচি-সংস্কৃতির ভিতরে খণ্ডিত নয় এমন মানুষদের অন্তর্লোককে সরাসরি আবিষ্কার করতে পারে।

হোয়াইট ওয়ে লেড ল নামে একটি সুবিখ্যাত দোকান ছিল কলকাতায়। অত-বড় দোকান এখন আর কলকাতা শহরে একটাও নেই। সেখানে সূচ সুতো থেকে আলমারি কিংবা চটিজুতো থেকে বাইবেল পর্যন্ত সবই পাওয়া যেত। সেই দোকান বাড়িটিই এখন ঘড়িওয়ালা মেট্রোপলিটন বিল্ডিং। নীচে ইউ এস আই এস, কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি ইত্যাদি।

সেই বাড়ির সবচেয়ে উঁচু তলায় একটি ফ্ল্যাটে এক বিকেলবেলা, সদ্য কৈশোর-ছাড়ানো আমরা কয়েকজন সমবেত হয়েছিলাম। সেটা উনিশ শো তিপ্পান্ন সাল, আমি তখন সিটি কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি, দীপক মজুমদার স্কটিশচার্চ কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে; আমার সহপাঠী মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল। দীপকের সহপাঠী আনন্দ বাগচী। শঙ্খ ঘোষ, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আমার চেয়ে দু'এক বছরের সীনিয়ার, দেবেশ রায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সমসাময়িক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে তখন চিনি না। সেই বছর কৃত্তিবাসের প্রতিষ্ঠা।

সেই বছরই আমরা 'হরবোলা' নামের একটি নাটুকে দল গড়েছিলাম। প্রাক্তন হোয়াইট ওয়ে লেড ল বাড়ির ওপরতলার ফ্ল্যাটে সেদিন আমাদের হরবোলার প্রথম দিনের অধিবেশন; অবিকল তারিখটা মনে নেই। আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বা উৎসাহদাতা, বা নাটকের ভাষায় যাঁকে বলে অধিকারী, ছিলেন দিলীপকুমার গুপ্ত, সংক্ষেপে ডি কে, যাঁর অন্য পরিচয় আমাদের কাছে তখন পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল, শুধু তাঁকে জানতাম সিগনেট প্রেসের পরিচালক হিসেবে। ঐ ফ্ল্যাটটি ডি কে'র বোন কল্যাণী মজুমদার ও তাঁর স্বামীর, যাঁর পুরো নাম ভুলে গেছি, শুধু মিঃ মজুমদার বলেই জানতাম।

আমার সংগঠন-প্রতিভা নেই। কৃত্তিবাস পত্রিকা বা হরবোলার জন্য, আমাদের পক্ষ থেকে মূল উদ্যোগ নিয়েছিল দীপক, আমি ছিলাম তার সহচর মাত্র। আরও কয়েকজন ছিল, যেমন ভাস্কর দত্ত, আশুতোষ ঘোষ, উৎপল রায় চৌধুরী ইত্যাদি।...এঁরা আমার বাল্যবন্ধু, সাহিত্যের পাঠকরা এঁদের সঙ্গে পরিচিত নন।

সেইদিনই প্রথম বোধহয় আমি লিফ্‌টে আরোহণ করি। পুরোনো আমলের পেল্লায় লিফ্‌ট আমাদের পৌঁছে দিয়েছিল ফ্ল্যাটের দরজায়, সেখানে সাদা উর্দি পরা এবং মাথায় মুরেঠা বাঁধা বেয়ারা আমাদের সেলাম করে বসবার জায়গা দেখিয়ে দিয়েছিল। একখানি ঘরের আয়তন টেনিস কোর্টের মতন এবং এমনই চাকচিক্যভাবে সাজানো যে আমরা বেশ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের পায়ে ধুলো, প্যান্টের বোতাম সব ক'টা ঠিক-ঠাক আছে কিনা এ সম্পর্কে সব সময় সজাগ থাকতে হয়। সরু থেকে মোটা হয়ে যাওয়া সূক্ষ্ম কাচের গেলাসে অবিলম্বে আমাদের হিমেল সরবৎ পরিবেশন করা হলো, ডি কে আমাদের প্রত্যককে একটি করে নতুন খাতা ও একটি আস্ত পেন্সিল দিলেন এবং জানালেন যে আমাদের নাট্য পরিচালক এখুনি এসে পড়বেন।

তিনি যখন এলেন, প্রথম দর্শনে আমরা খানিকটা হতাশই হলাম। যে-রকম পরিবেশ ও যে-ধরনের আদর-আপ্যায়ন, তাতে মনে হয়েছিল, নাট্য পরিচালক নিশ্চিত হবেন প্রমথেশ বড়ুয়ার মতন রূপবান ও সাহেবী ব্যক্তিত্বময় কেউ। যিনি এলেন তিনি একজন কুচকুচে কালো চেহারার বলিষ্ঠকায় পুরুষ, ধুতি ও পাঞ্জাবী পরা, খুব পরিষ্কার নয়, হাতে একটি চটের তৈরি র‍্যাশন ব্যাগ। তাঁকে অনেকটা আমাদেরই মতন মানুষ দেখে স্বস্তি পাওয়া উচিত ছিল, তবু যে খানিকটা নিরাশ হয়েছিলাম, তার কারণ আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে বোধহয় খানিকটা সুপ্ত স্নবারি থাকে।

তিনি কমলকুমার মজুমদার। সেই প্রথম দেখা। এর আগে শুধু নাট্য-জগৎ কেন কোনো জগতেই তাঁর নাম আমরা শুনিনি। ডি কে এবং অন্যান্যদের খাতির তিনি গ্রহণ করলেন অত্যন্ত বিনীত ভাবে। কার্পেটের ওপর আসন নিয়ে তিনি আমাদের সকলের পরিচয় জানতে চাইলেন। তাঁর ভাষা এই রকম, বাবুটির নাম কী? বাবুটির কী করা হয়? বাবুটির পিতার নাম? থাকা হয় কোথায়? এই ধরনের ভাষা আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বইতে পড়েছি, হঠাৎ কারুর মুখ থেকে শুনলে হকচকিয়ে যেতে হয়ই। কমলকুমারের বয়েস তখন চল্লিশের বেশী নয়।

সেদিন দু' চারটি বই থেকে কিছু পাঠ করে আমাদের কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করা হয়েছিল, আর কিছু না। সেইদিনই, কিংবা আর দু' চারটি অধিবেশনের পর, কমলকুমার ঘোষণা করেছিলেন, এমন কেতাদুরস্ত ফ্ল্যাটে

থিয়েটারের রিহার্সাল চলবে না। বোধহয় তিনি বলেছিলেন, 'এরকম বাঁধানো জায়গায়'।

ডি কে ঐ জায়গাটি ঠিক করেছিলেন শহরের কেন্দ্রস্থলে বলে। সেখান থেকে হরবোলা সরে গেল কিছু দক্ষিণে। এলগিন রোডে, সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়ির প্রায় উল্টো দিকেই, আর. সেনের বিশাল জাহাজ মার্কা প্রাসাদ। সেই বাড়ির ধার ঘেঁষে বড় বড় পাম ও দেবদারু ও রেনট্রি শোভিত খানিকটা মোরাম বিছানো টানা পথ। তার শেষ প্রান্তের গৃহটি সিগনেট প্রেসের। বাড়িটি ইংরেজ-পছন্দ, সামনে পোর্টিকো ও সবুজ ঘাসে ভরা চত্বর, দোতলা।

প্রথম ডানদিকের মস্ত বড় কক্ষটি সিগনেট প্রেসের অফিস এবং ডি কে'র নিজস্ব কাজের ঘর। অসংখ্য দেশী বিদেশী বইতে ঠাসা, এমনকি সংলগ্ন বাথরুমটিতে পর্যন্ত দুটি বইয়ের র‍্যাক। পর পর অনেকগুলি টেব্‌ল পাতা, প্রতি শনি-রবিবার, সেইসব টেবিল ও সোফা-কৌচ সরিয়ে দিয়ে পাতা হয় বিরাট সতরঞ্চি। ডি কে নিজে গাড়ি করে ঘুরে ঘুরে কোনো দিন বহুবাজারের ভীম নাগের দোকান, কোনোদিন বালিগঞ্জের গাঙ্গুরাম থেকে নিয়ে আসেন বাছাই করা সন্দেশ ও সিঙ্গাড়া, সেগুলি অফুরন্ত। এছাড়া মাঝে মাঝেই হাঁক পাড়লে দোতলা থেকে নেমে আসে সুদৃশ্য কাপে তিরিশ বত্রিশ কাপ চা। অন্তত চার পাঁচবার। আর সতরঞ্চির ওপর এদিক ওদিক ছড়ানো থাকতো কয়েকটি গোল্ড ফ্লেকের টিন। আমার বয়েস তখন ছিল উনিশ, কলেজ জীবনে আমি ছিলাম একটি আদর্শবাদী ছোকরা, সিগারেট খাওয়াকেও অন্যায় মনে করতাম। (পরে অবশ্য সব পুষিয়ে নিয়েছি।) কিন্তু আমার বন্ধুবান্ধব কেউ কেউ সেই সিগ্‌রেটের টিন কাত করে এক সঙ্গে দশ বারোটা নিয়ে পকেটে ভরতো।

ডি কে ছিলেন সব দিক থেকেই একজন বড় সাইজের মানুষ। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ছিলেন বিশাল, তাঁর হৃদয়খানা ছিল তাঁর শরীরের চেয়েও বড়। তিনি জমিদারপুত্র ছিলেন না, এক এক সময় উপার্জন করেছেন প্রভূত, এবং ব্যয়ও করেছেন জলের মতন। শেষ জীবনেও তিনি একটি বাড়ি বানাননি বা অঢেল বিষয়সম্পত্তি রেখে যাননি, যতদূর জানি। আমাদের প্রত্যেক দিনের রিহার্সালে তিনি খরচ করতেন অন্তত দুশো টাকা, সেই চব্বিশ বছর আগে। —একটু রাত্তির হলে আমাদের মতন কয়েকজনকে তিনি নিজে গাড়ি চালিয়ে

বাড়ি পৌঁছে দিতেন এলগিন রোড থেকে শ্যামবাজারে। যারা হাওড়া বা বেহালা থেকে আসতো, তাদের পকেটে জোর করে দশপনেরো টাকা গুঁজে দিয়ে খুব মৃদুভাবে বলতেন, ট্যাক্সি নিও। হরবোলার কোনো সদস্য কখনো চাঁদা দেয়নি, কোনো অভিনয় অনুষ্ঠানে টিকিট বিক্রি করা হয়নি, সমস্ত ব্যয় বহন করেছেন ডি কে একলা। সবই শখের জন্য। এসব শৌখিন মানুষ এখন আর একজনও আছে কিনা জানি না। যদিও ডি কে'র চেয়ে হাজার গুণ ধনী অন্তত এক হাজার বাঙালী এখনো আছে কলকাতায়। ডি কে সামন্ততন্ত্রকে ঘৃণা করতেন, কিন্তু মনে মনে তিনি ছিলেন যেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির শৌখিন পুত্র।

তিনি তখন একটি সাহেবী কম্পানির বাঙালী কর্ণধার। তা'ছাড়া সিগনেট প্রেসের কাণ্ডকারখানায় বাংলা সাহিত্য ও প্রকাশক জগতে ঘটিয়ে দিয়েছেন হুলস্থুল। তিনি উদ্যমী পুরুষ হিসেবে পরিচিত। আসলে, তিনি মানুষটি ছিলেন লাজুক। তিনি বাইরের সভা সমিতিতে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়া-আসা করতেন না বিশেষ। নিজের বাড়ির পরিবেশে এক এক সময় মন ও মুখ খুলতেন। এঁর মতন বিখ্যাত আড্ডাবাজ কদাচিৎ মেলে। ডি কে'র সঙ্গে আড্ডায় বসলে মন্ত্রমুগ্ধের মতন আটকে যেতে হতো। তাঁর সঙ্গে প্রথম দিন সাক্ষাৎকারে আমরা গিয়েছিলাম সকাল নটায়, প্রায় উঠেছিলাম দুপুর তিনটেয়—তাও আমরাই আগে থেকে। অথচ উনি ছিলেন খুবই ব্যস্ত লোক।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল, আমাদের প্রতি তাঁর সম্মানবোধ। তখন তাঁর বয়েস আমাদের অন্তত দ্বিগুণ। অথচ, তিনি বহুদিন পর্যন্ত আমাদের সকলকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। সাধারণত ওঁর মতন বয়েসীদের কাছে আমার বয়েসীদের সিগারেট লুকোবার কথা, অথচ তিনি নিজে সরবরাহ করতেন মূল্যবান সিগারেট, আমাদের যুক্তি ও মন্তব্য তিনি শুনতেন মন দিয়ে এবং ব্যবহার ছিল যেন তিনি ও আমরা সমান সমান। অথচ তা হতেই পারে না। আমাদের তুলনায় ডি কে'র সাহিত্যপাঠ ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। ডস্টয়েভস্কি ও ফ্রানৎস কাফকার রচনার বিষয়ে তিনি প্রথম আমাদের আকৃষ্ট করেন। এবং তিনিই ছিলেন অত্যন্ত বেশী রকমের বাঙালী, বাংলা সাহিত্যকে তিনি এমন ভালোবাসতেন যেন এর গায়ে সামান্য আঁচড় লাগলে তাঁর নিজের শরীরে রক্তপাত হতো।

হরবোলাকে নিছক নাটুকে দল করার ইচ্ছে তাঁর একদম ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন, সেখানে সমবেত হয়ে আমরা সকলে সঙ্গীত-সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে অনুরক্ত হবো। কোনো কোনো সন্ধে শুধু আধুনিক শিল্পীদের ছবি বিষয়ে আলোচনায় কেটে যেত। কখনো গান। নাটকের অভিনয়ের জন্য প্রত্যেকের গান গেয়ে গলা সাধা দরকার এই বিশ্বাসে তিনি ডেকে এনেছিলেন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর এক শিষ্য সন্তোষ রায়কে, কিছুদিন পর এসেছিলেন প্রখ্যাত কবি ও গায়ক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, আমাদের বটুকদা। আমার গলায় একদম সুর নেই তবু আমাকে দিয়ে গান গাওয়াবার জন্য ঐ দু'জন কত পণ্ডশ্রম করেছেন। শেষ পর্যন্ত আমি কোরাস দলে কোনোক্রমে পেছনের দিকে স্থান পেয়েছিলাম। বটুকদার কাছ থেকে শেখা গান, 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'—পরবর্তীকালে আমরা পঞ্চাশের কবিরা নিজস্ব ন্যাশনাল অ্যানথেম করে ফেলেছিলমে।

নিজে গান গাইতেন না ডি কে, কিন্তু গান সম্পর্কে গভীর আগ্রহ ছিল তাঁর। তাঁর রেকর্ড সংগ্রহ ছিল দেখবার মতন। তাঁর স্বভাবের অনেক কিছুই বিচিত্র। শুনেছি, তিনি রোজ রাত দুটো পর্যন্ত কাজ করতেন, তারপর স্নান করে খেতে বসতেন রাত তিনটের সময়। যাযাবরের দৃষ্টিপাতের পাণ্ডুলিপি তিনি প্রকাশ না করে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ ভূমিকায় লেখককে মৃত বলে মিথ্যে রটিয়ে দেওয়া তিনি অরুচিকর মনে করেছিলেন। এবং তিনিই অতি তরুণ কবি নরেশ গুহ ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন অতি সম্মানের সঙ্গে।

জীবনানন্দ দাশের কোনো কবিতার বইই যখন পাওয়া যেত না, তখন ডি কে প্রকাশ করলেন 'বনলতা সেন' এবং পরপর কাব্যগ্রন্থগুলি। সেই আমরা প্রথম জীবনানন্দ দাশকে চিনলাম। ছাতা হাতে নিয়ে জীবনানন্দকে দু'একবার আসতে দেখেছি ডি, কে'র কাছে। 'বনলতা সেন'-এর চমৎকার প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায়। যদিও কবি সেই মলাট সম্পর্কে নাকি পরে বলেছিলেন, মুখখানা অনেকটা রাজকুমারী অমৃত কাউরের মতন কি? এ গল্পও ডি কে'র কাছে শোনা।

কমলকুমার মজুমদারও গায়ক নন। কিন্তু তিনি সবসময় গুনগুন করে সুর ভাঁজতেন। এতে কণ্ঠস্বর ভালো থাকে, তিনি বলতেন। ঐ গুনগুনানি ও লবঙ্গ প্রায় নিয়ত তাঁর মুখে। একটি শিশিচ ভর্তি লবঙ্গ প্রতিদিন রাখা

হতো তাঁর সামনে, ফুরিয়ে গেলেই আবার লবঙ্গের জন্য হাঁক। এক সঙ্গে অত লবঙ্গ খেতে আগে কারুকে দেখিনি।

কমলকুমার মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও ডি কে—এই তিনজন এক একদিন এমন সব প্রসঙ্গ তুলতেন যে আমরা থ হয়ে শুনতাম। আই পি টি এ-র স্বর্ণযুগে আমরা ছিলাম বালকমাত্র, বটুকদা বলতেন সেই সময়ের কথা। বটুকদার মুখে সবসময় একটা কৌতুকের হাসি মাখানো থাকতো। তিনি বলতেন ছোট ছোট বাক্য, হঠাৎ হঠাৎ করতেন অন্যের কণ্ঠস্বর নকল কিংবা শুরু করে দিতেন প্রাসঙ্গিক গান। কমলদা ভালোবাসতেন তাঁর বয়সের চেয়েও বেশী আগেকার গল্প বলতে। উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম-হিন্দু ঝগড়ার কাহিনী উনি এমনভাবে বলতেন, যেন ওসব তাঁর নিজের চোখে দেখা। যাঁরা শুধু কমলকুমারের রচনা পড়েছেন, তাঁরা কল্পনাই করতে পারবেন না কমলকুমারের মুখের ভাষা কত সরাসরি ও জীবন্ত। তাঁর মুখের ভাষাকে বলা যায়, কাঁচা বাংলা। হুতোম প্যাঁচার নকশায় কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মুখের ভাষা যেমন জীবন্ত কাঁচা বাংলা। এর মধ্যে খুব সাবলীল ভাবে এসে পড়তো আদি রসাত্মক প্রসঙ্গ। বটুকদা গলাখাঁকারি দিয়ে তখন বলতেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আঠারো বছর বয়েস হলে সবাই বন্ধু। কমলদা এসব কিছু গ্রাহ্যই করেন নি কখনো। সেই সময় আমাদের এক বন্ধুর উপর্যুপরি বাবা ও মা মারা যান। তাঁরা রেখে যান কিছু বিষয়সম্পত্তি। সে বার্তা শুনে কমলদা সহাস্যে বলেছিলেন, এসো, এবার ওকে একটু বখানো যাক! তারপরই 'সধবার একাদশী' কোট করে বলতেন, একজন বড়মানুষের ছেলে বখলে দশজন মাতালের প্রতিপালন হয়। (অথবা, এই মর্মে কিছু।) অবশ্য, খালাসীটোলা নামে এক অলীক প্রমোদস্থানে কমলদার সঙ্গে আমরা যাতায়াত শুরু করেছিলাম এর বেশ কয়েকবছর পরে।

কমলদার সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব ছিলো বিখ্যাত ব্যক্তিদের চরিত্রহননে। একবার তিনি একটি খরগোসের কথা বলেছিলেন ওর গোঁফ অবিকল আশু মুখুজ্যের মতন। তারপর সেই খড়গোসটার কটা বাচ্চা হলো, তার মধ্যে একটার গোঁফ আবার শ্যামাপ্রসাদের মতন হুবহু। তখনকার একজন সাড়াজাগানো তরুণ গদ্যলেখক, আমাদের প্রিয়, তাঁর সম্পর্কে কমলদা বলেছিলেন, ও তো টিপসই দিয়ে মাইনে নেয়। আর একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক সম্পর্কে বলেছিলেন, হ্যাঁ ওমুক তো, ঠিক বুটজুতোর মতন মুখখানা।

ডি কে শুধু গল্প উস্কে দিতেন। হঠাৎ হয়তো বললেন, মনে আছে, বিচিত্রা ভবনের সেই মিটি-এ রবীন্দ্রনাথ···। অমনি কমলদা বা বটুকদা সেইপ্রসঙ্গে নানা ঘটনা বলতে লাগলেন। ডি কে উপভোগ করতে করতে বারবার চিবুক ছোঁয়াতে লাগলেন নিজের বুকে। একেবারে শেষে এমন একটা মন্তব্য করতেন, যাতে হাসিতে ফেটে পড়তাম সবাই। রসিকতা ও বুদ্ধির সমন্বয়ে সব কথাবার্তাই বাঁধা থাকতো খুব উঁচু পর্দায়। এলেবেলে কথা বা স্মল টক কোনো পাত্তাই পেত না। তখনও অবশ্য আমরা কমলদার লেখক-পরিচয় জানতাম না বিশেষ কিছু। জানতাম, উনি ছবি আঁকেন। আমাদের সামনেই অনেক সময় স্কেচ করতেন এবং সেসময় কিছু উড-কাট নিয়ে মগ্ন ছিলেন। কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে কমলদা একদিন এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে হালকা ভাবে বলেছিলেন, এ গোপাল ঘোষ, ছবি এঁকে খায়। জলরঙের ছবি ও স্কেচের জন্য তখন গোপাল ঘোষের খুব নাম। তিনিও হালকা ভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, আপনি তো আর মন দিয়ে ছবি আঁকলেন না কমলবাবু! তাহলে আমাদের ভাত মারতেন!

কিছুদিন পর অরুণকুমার সরকার ও নরেশ গুহর মুখে শুনেছিলাম, কমলদা একসময় সাহিত্যপত্র ও চতুরঙ্গে গল্প লিখতেন। বরাবরই দেখেছি, কবিরাই কমলদার রচনার বেশী অনুরাগী। পরবর্তী কালেও একদল কবিই কমলদাকে নিয়ে খুব হৈ চৈ করেছে। হরবোলায় আমাদের সঙ্গে চেনাশুনো হবার কিছুকাল পরেই প্রকাশিত হয় কমলদার প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা'। তারপর তাঁর একটি গল্প 'ফৌজ-ই-বন্দুক' এবং একটি উপন্যাস 'সুহাসিনী পমেটম' ছাপা হয় কৃত্তিবাসে।

হরবোলা নাট্য সংস্থায় থাকতে থাকতেই আমরা কয়েকজন প্রকাশ করি কবিতার পত্রিকা কৃত্তিবাস, ডি কে'র প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায়। ডি কে-ই আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ঐ পত্রিকায় শুধু তরুণতম কবিদেরই রচনা থাকা উচিত। কিন্তু কৃত্তিবাসের কথা নয়। এখানে শুধু বলি হরবোলার কথা।

আমাদের প্রথম পালা ছিল সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'। এই নাটিকার গানগুলি সুকুমার রায়ই সুর দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই স্বরলিপি উদ্ধার করে প্রতিটি গান শেখানো চলো আমাদের। আমাদের কথাটা প্রকৃত সামগ্রিক অর্থেই ব্যবহার করা হলো। তখনো গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন প্রবল ভাবে দানা বাঁধেনি, বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' সকলকে চমকিত করেছে এবং

'বহুরূপী' দল ধারাবাহিক ভাবে আমাদের রুচি বদলের কাজ করে যাচ্ছে। ভাঙা মঞ্চে শিশির ভাদুড়ী করে যাচ্ছেন তাঁর শেষ অভিনয়গুলি। কমলদার নির্দেশনা আমাদের কাছে সব অর্থে নতুন। মেঝেতে খড়ির দাগ কেটে প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করা তো ছিলই। এ ছাড়া তিনি আমাদের প্রত্যেককে পুরো নাটকটি সব গান সমেত মুখস্থ করিয়ে ছেড়েছিলেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকে একা একা নাটক বলতে পারতাম।

রিহার্সাল চলেছিল ন মাস। নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে। এই নাটকের মধ্যে ছিল অনেক ছোট ছোট নাটক। বাড়ির সামনে মুক্তাঙ্গনে বাঁধা হলো মঞ্চ। মডার্ন ডেকরেটার্স কৃত। সেই মঞ্চও রইলো দেড় মাস। এত দীর্ঘ সময় মঞ্চ বেঁধে রাখা যে কী বিপুল খরচের ব্যাপার, আমরা তখন বুঝিনি। প্রতিদিন স্টেজ রিহার্সাল হয়। একেবারে ত্রুটিহীন না হলে পালা অভিনয়ের তারিখ ঘোষণা করা হবে না। কিন্তু ত্রুটিহীন কার কাছে?

প্রথমদিনই, মঞ্চ বাঁধা সম্পূর্ণ হবার পর কমলদা সেটি পর্যবেক্ষণ করে বললেন, কাটতে হবে।

তক্ষুনি মানে বুঝিনি। পরে বোঝা গেল, কমলদার মতে মঞ্চটি চার ইঞ্চি বেশী উঁচু হয়ে গেছে। ফলে দর্শকদের চোখের সীমারেখা ঠিক থাকবে না। মঞ্চ তো কাটা যায় না, পুরোটা খুলে আবার বানাতে হয়। পাঁচ না দশ হাজার কত টাকা ব্যয়ে যেন গঠিত সেই মঞ্চ ভাঙার প্রস্তাবে আমরা নির্বাক। ডি কে কিন্তু কিছুতেই দমে যান না। একটুক্ষণ চিন্তা করেই বললেন, আর এক কাজ করলে হয়! লরি করে মাটি এনে এনে পুরো চত্বরটাই যদি উঁচু করে দেওয়া যায় চার ইঞ্চি? থিয়েটারের কারণে মাঠ উঁচু করে ফেলার প্রস্তাব এর আগে কেউ কখনো দিয়েছেন কিনা ইতিহাসে লেখা নেই। এটা প্রায় কাজে পরিণত হতে যাচ্ছিল, এমন সময় নীলিমা দেবী, যিনি সিগনেট প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা, আমাদের বন্ধু সুনন্দ গুহঠাকুরতার মা এবং ডি কে'র শ্বশ্রূমাতা, তিনি ডি কে এবং কমলদাকে সহাস্য ধমক দিয়ে বললেন, এসব কী হচ্ছে পাগলামি। মঞ্চ চার ইঞ্চি ছোটবড় হলে কী আসে যায়! পৃথিবী উল্টে যাবে? আপনারা কি অমর-নাটক করতে যাচ্ছেন? হোয়াট্ কন্‌সীট।

ডি কে একবার পরিকল্পনা করেছিলেন-রাবণ মঞ্চে নামবে হেলিকপটার থেকে। কী একটা সামান্য কারণে সেটা বাতিল হয়। তারপর তিনি বললেন, রাবণের কুড়ি হাত হবে কোলাপ্‌সিবল। এমনিতে দুটো হাত, হঠাৎ সে দুটি

উঁচু করলেই ঘট ঘট করে আরও আঠেরোখানা হাত বেরিয়ে পড়বে! কিন্তু তাহলে ন খানা কোলাপ্সিবল মুখেরও ব্যবস্থা রাখতে হয়। এ ভূমিকায় অভিনেতা সুনন্দ ওরফে বুড়ঢা নিজের একাধিক মুখ বিষয়ে আপত্তি তুলে ওটা বানচাল করে দেয়।

কমলদা তাঁর প্রতিভা দেখান পোশাকের ব্যাপারে। পোশাক ভাড়া করার প্রশ্নই ওঠে না। চরিত্র অনুযায়ী পোশাকের তিনি ছবি এঁকে দিলেন। ডি কে বললেন, এই সব পোশাক তৈরি হবে আমাদের চোখের সামনে। চলে এলো দু'তিনজন ওস্তাগর, সেলাইকল সমেত। ঘর্ঘর শব্দে শেলাই হতে লাগলো পোশাক। হঠাৎ মাঝপথে তাদের একজনকে থামিয়ে কমলদা বললেন, সুগ্রীবের পোশাকের জন্য ডামাসেণ্ট ক্লথ চাই। সেটা কী বস্তু কে জানে। ডি কে লোক লাগালেন সারা কলকাতায়। বড়বাজার থেকে অতি-কষ্টে জোগাড় করা গেল, সেটা একটা মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু কাপড়, তাতে তৈরি হলো পোশাক, তা দেখেই কমলদা বললেন, হবে না, চলবে না, বেশী চকচক করবে—বারো আনা গজের লং ক্লথ আনো।

বলাই বাহুল্য, বারো আনা গজে গামছার কাপড়ও পাওয়া যায় না।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল-এর অভিনয় হয়েছিল পরপর দু দিন। তাতে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার সুধীসমাজের বেশ বড় একটি অংশ। দর্শকরা সবাই নির্বাচিত আমন্ত্রিত। ফ্রি পাশ বন্ধ।

পরের নাটক 'মুক্তধারা'। কমলদা রবীন্দ্রভক্ত নন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করতেন দাড়িবাবু। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ধারার মানুষ, ব্রাহ্মদের সম্পর্কে তাঁর জাত-বিরাগ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পর তিনি অনেকখানি ডিঙিয়ে এসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখক হিসেবে মানেন। কিন্তু 'মুক্ত-ধারা' নির্বাচিত হবার পর তিনি বললেন, এর থেকে একটি লাইনও কাটা হবে না। প্রত্যেকের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখা হবে। মুক্তধারা নাটক সম্পূর্ণভাবে আগে কখনো অভিনীত হয়নি, রবীন্দ্রনাথও করেননি। প্রায় পঞ্চান্ন ছাপান্নজন অভিনেতা অভিনেত্রীর দরকার। ডি কে ঠিক করলেন, এই 'মুক্তধারা' নাটকের সম্পূর্ণাঙ্গ অভিনয় হবে।

সামনের জাহাজ মার্কা বাড়িটি আর সেন নামে এক ব্যবসায়ীর। সে বাড়ির মেয়ে দীপান্বিতাকে বিয়ে করেছেন তরুণ রায়। তিনিও দলবল নিয়ে সেই বাড়িতে 'মুক্তধারা' রিহার্সাল দিচ্ছিলেন, আমরা আওয়াজ শুনতে

পেতাম। তরুণ রায় প্রস্তাব দিলেন দুটো দল মিলিয়ে অভিনয় করার—একই নাটক যখন। কমলদা রাজি হলেন না। এছাড়াও, কখনো কালী ব্যানার্জি, কখনো অরূপ গুহঠাকুরতার মতন খ্যাতিমান কয়েকজন এসেছেন, কমলদা নিতে রাজি হননি। তিনি সম্পূর্ণ নতুনদের গড়েপিটে নিতে চাইতেন। আমাদের মধ্যে দীপক মজুমদারের অভিনয় ও গানে যথেষ্ট দক্ষতা ছিল, বাকি সবাই আনাড়ী, কিন্তু সবাই মিলে দারুণ মেতেছিলাম। মুক্তধারার একটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এক ছিপছিপে চেহারার সুন্দরী তরুণী তিনি এখন গৌরী আইয়ুব।

হরবোলা চলাকালীনই ডি কে আর একটি বিরাট কাণ্ড করেছিলেন। সিনেট হলে কবি সম্মেলন। তার আগে কবি সম্মেলন জিনিসটার অতটা চল ছিল না। হঠাৎ ঐ কবি সম্মেলনের চিন্তা ডি কে'র মাথায় কেন এসেছিল, তা বলতে পারবো না আমি, তখনকার কালের প্রতিষ্ঠিত কবিরাই ছিলেন এ ব্যাপারে ডি কে র সহায়তাকারী। অত বড় কবি সম্মেলন, তার আগে তো কখনই নয়, পরেও এ পর্যন্ত আর একটাও হয়নি। সিনেট হল ছিল বোধহয় কলকাতার পেল্লায়তম হল, সেখানে দু'দিন ধরে কবি সম্মেলন দলমত নির্বিশেষে সমস্ত কবির। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ সবাই বেঁচে। যতদূর মনে পড়ে, বুদ্ধদেব বসু তাঁর চমৎকার কণ্ঠস্বরে নিজের অনেকগুলি এবং তাঁর বন্ধু প্রবাসী অমিয় চক্রবর্তীর কয়েকটি কবিতা শুনিয়েছিলেন। জীবনানন্দ দাশ ঝড়ের বেগে পাগলাটে গলায় পর পর অনেকগুলো কবিতা পড়ে গেলেন। কী দারুণ সীরিয়াস মুখ করে তিনি পড়েছিলেন 'সেই সব শিয়ালেরা—'। আর কোনো প্রকাশ্য সভায় তাঁকে আর দেখা যায়নি। দু'দিনের অনুষ্ঠানের প্রায় শতাধিক কবিদের নামের তালিকায় সবচেয়ে শেষের নামটি ছিল আমার।

সেই কবি সম্মেলনের আহ্বায়ক হিসেবে যদিও নাম ছিল আরও দু'জনের, নীহাররঞ্জন রায় ও আবু সয়ীদ আয়ুব—কিন্তু ব্যবস্থাপনা সব ডি কে'রই। ডি কে কোনোদিনই ছোট আকারের কিছু ভাবতে পারতেন না। খরচপত্রও নিশ্চয়ই সব তাঁর পকেটেরই। এবং তিনি প্রত্যেককে বলে দিতেন, মাইক থেকে কতটা দূরে মুখ রাখতে হবে, শব্দের শেষ অক্ষরটির ওপর কেমনভাবে জোর দিতে হবে। এমনকি, তিনি হরবোলার মঞ্চে এই কবি সম্মেলনের একটি প্রাক রিহার্সালেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। কোনোমতে একটা কবিতা পড়ে দিলেই হলো না। প্রতিটি বাক্য ও শব্দ যেন শ্রোতাদের

কাছে ঠিকঠাক পৌঁছোয়, সে জন্য প্রস্তুতি দরকার। ডি কে'র এই উদ্যোগের জন্যই সিনেট হলের অন্তত হাজার পাঁচেক শ্রোতা পিন ফেলার শব্দ না করে সব কবিতা শুনেছিল।

যে-কোনো কারণেই হোক, কমলদা এই কবি সম্মেলনের ব্যাপারটা খুব একটা পছন্দ করেননি। আমাদের নাটকের রিহার্সালের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কিছুদিনের জন্য এই কবি সম্মেলন নিয়ে মাতামাতি করাটা তিনি খুব সুনজরে দেখতেন না। পরে এই জন্য তিনি আমাদের একই পার্ট অন্তত পঞ্চাশবার পুনরুক্তি করিয়ে খুব শাস্তি দিয়েছিলেন।

ডি কে ও কমলদার বন্ধুত্ব ছিল খুবই প্রগাঢ়। কিন্তু বাইরে তার কোনো প্রকাশ ছিল না। দু'জনেই পরস্পরকে বুঝতেন খুব সঠিকভাবে। কমলদা মাঝে মাঝে ডি কে-কে খোঁচা মারতেন বড়লোক-বলে। ডি কে মুচকি মুচকি হাসতেন। কারণ কমলদাও কলকাতার এক বিশিষ্ট বনেদী বাড়ির মানুষ। মাঝে মাঝে একখানা জামেয়ার গায়ে জড়িয়ে আসতেন যার দাম অন্তত আট দশ হাজার টাকা। ওঁদের সেই বন্ধুত্বের মধ্যে হঠাৎ একদিন বজ্রপাত হলো।

কতদিন ধরে মুক্তধারার রিহার্সাল চলেছিল মনে নেই, একবছর তো হবেই। এর মধ্যে সকলেই এক আধ দিন অনুপস্থিত থেকেছে। একমাত্র ডি কে ছাড়া। প্রত্যেকদিন পাঁচ ছ' ঘন্টা ধরে তিনি বসে থাকতেন একটানা। তিনি নিজে অভিনয় করেন না। তিনি নাট্য-পরিচালক নন। অথচ ঐ নাটকই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। কী তীব্র শখ। রিহার্সালের সময় কারুর উচ্চারণ বা ডেলিভারি পছন্দ না হলে তিনি প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলতেন, কমলবাবু।

কমলদা মাঝে মাঝে কিছু দুষ্টুমি করতেন। জিনিসটাকে মজা বলেই ধরতাম। এক একদিন এসেই বলতেন, আজ আধঘন্টা পরেই কিন্তু চলে যাবো। কিন্তু থাকতেন পাঁচ ঘন্টা। আবার কোনোদিন তিনটের সময় আসবো বলে আসতেন সাতটায়। কিন্তু যে-কোনো ব্যবহারই কমলদাকে মানায়। দেরিতে আসা বা তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য তিনি চমকপ্রদ সব কারণ দেখাতেন। যেমন, আজ মশারি কাচতে হলো বাড়িতে। আজ ঠাকুরের শয়ান দিতে হবে, ইত্যাদি। কোনোদিন কমলদা এসে হয়তো ঘোষণা করলেন, সেদিন তিনি এক ঘন্টার বেশী কিছুতেই থাকতে পারবেন না। এক ঘন্টা পরে আমরা বললাম, কই কমলদা, যাবেন না? কমলদা এক ধমক দিয়ে বলতেন, থামো তো! বেশী বাঙালপনা করো না।

মুক্তধারা অভিনয়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। মঞ্চ বাঁধা হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগে, পরিপূর্ণ রিহার্সাল চলছে। ডি কে অত্যন্ত পারফেকশানিস্ট। কারুর সামান্য পদক্ষেপের ত্রুটিও তিনি পছন্দ করেন না। তাছাড়া কমলদা একেবারে শেষ মুহূর্তে দু'একটা মন্ত্রগুপ্তি শিখিয়ে দেন, তাতে এক একটা চরিত্রের ব্যাখ্যা একেবারে বদলে যায়। আমরা তার অপেক্ষায় আছি। অভিনয়ের দিন যত ঘনিয়ে আসে, ততই ডি কে'র মুখচোখ খুব সীরিয়াস হয়ে আসে। যেন সমস্ত পরীক্ষাটা তাঁরই।

অন্য কেউ এতটা নিখুঁতভাবে করতে পারলে ডি কে'র মতন খুশী হতে আর কোনো মানুষকে দেখিনি। সেই জন্য, ডি কে-কে খুশী করবার জন্য, তাঁর মুখের হাসি দেখবার জন্যই আমরা প্রাণপণে খাটতাম।

সেদিন এক শুক্রবার, তার ঠিক দু'দিন বা তিন দিন পরেই আমাদের প্রকাশ্য অভিনয়। কার্ড বিলি করা হয়ে গেছে। সেদিন পূর্ণ রিহার্সাল হবে। কমলদা সেদিন কেন যেন গোড়া থেকেই চঞ্চল। মাঝে মাঝেই বলছেন, আজ তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। পনেরো-কুড়ি মিনিট পর পরই তিনি বলছেন, তোমরা যা ভালো বোঝো করো! আমি যাচ্ছি! একথা শুনে ডি কে চওড়াভাবে হেসে কমলদার দিকে তাকিয়ে থাকেন নিঃশব্দে। আমরা সবাই কমলদার এই খেলাটা জেনে গেছি। কিন্তু কমলদা সেদিন বারবারই ঐ কথাটা বলতে লাগলেন এবং দু একবার যেতে উদ্যত হলেন পর্যন্ত। এক সময় ডি কে জিজ্ঞেস করলেন, কেন, আজ পালাবার কারণটা কী?

কমলদা বললেন, আজ পৌষ সংক্রান্তি, আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে পিঠে খেতে হবে।

ডি কে সেইরকমভাবে হেসে হাঁক দিলেন, গোবিন্দ!

গোবিন্দ ও বাড়ির ভৃত্য। সে অবিলম্বে বহু প্লেট সাজিয়ে নিয়ে এলো। নানা রকমের পিঠে। ডি কে'র সব কিছু খেয়াল থাকে, সেদিন আর সন্দেশ সিঙ্গাড়া নয়, আমাদের জন্য পিঠে এসেছে।

কমলদা তার কিছুই স্পর্শ করলেন না। কমলদা একেবারেই ভোজন-বিলাসী নন। কোনোদিনই উনি খাবার টাবার খান না। সুতরাং আমরা ভেবেছিলাম পিঠের ব্যাপারটা ছুতো। যথারীতি কমলদা শেষ পর্যন্ত থেকেই যাবেন।

কিন্তু সেদিন তিনি মন দিতে পারছিলেন না। রিহার্সালের মাঝে মাঝেই

বলছিলেন, আমি এবার যাই।

ডি কে জিজ্ঞেস করলেন, এবার কেন যাবেন কমলবাবু? পিঠে তো এসেছে।

কমলদা বললেন, ও পিঠে নয়। আমার স্ত্রী পিঠে করেছেন, সেটা খেতে হবে।

—সে তো যখন বাড়ি ফিরবেন, তখনই খেতে পারবেন।

—না, সে একটা ব্যাপার আছে।

কমলদার মুড ছিল না বলেই হয়তো আমরাও সেদিন অভিনয়ে নানা রকম ভুল করছিলাম। ডি কে ক্রমশই বেশী সীরিয়াস হয়ে উঠছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকে কোনো ত্রুটি থাকুক, তিনি চান না।

হঠাৎ রিহার্সালের মাঝপথে কমলদা আবার বললেন, তোমরা করো, আমি চলি।

ডি কে বললেন, আর একটু থাকুন, আর এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

কমলদা বললেন, না, না, আমার আর থাকার উপায় নেই। বুঝলেন না, পিঠে খেতে হবে বাড়িতে গিয়ে—

হঠাৎ যেন মাঠের মধ্যে একটা বোমার বিস্ফোরণ হলো। ডি কে গম্ভীর গর্জনে বললেন, আই হ্যাভ এনাফ্ অব দিস্…। তারপর পেছন ফিরে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে চাপা গলায় বললেন, ননসেন্স্।

আমরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কয়েক মিনিট সত্যিই কোথাও কোনো শব্দ ছিল না। পুরো ব্যাপারটাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবার মতন। তলায় তলায় কোথায় কতখানি টেনশান তৈরি হয়েছিল, ঠিক বুঝিনি। সত্যিই, ডি কে-কে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল ধৈর্যের শেষ সীমায়। আবার একথাও ঠিক, কমলদার গলায় সেদিন আন্তরিকতাও ছিল, তিনি প্রকৃতপক্ষেই চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। সোজাসুজি মাঠটা পার হয়ে এসে কমলদা আমাকে বললেন, বইটা দাও তো, সুনীল।

কমলদার হাতে রোজই একটা করে ফরাসী বই থাকে, যার মধ্যে তিনি টাকা রাখেন। বইটা আমার কাছে ছিল সেদিন। সেটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে তিনি হন্‌হন্ করে বেরিয়ে গেলেন।

দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর এই ঝগড়ার দৃশ্যে আমরা বাক্যহীন স্থাণুবৎ হয়ে রইলাম।

ডি কে ওপরে উঠে গেলেন, কমলদাকে বাধা দেবার কথাও মনে এলো না।

প্রত্যেকদিনই আমরা কমলদার সঙ্গে ফিরি। আমরা সবাই তখন থাকি শ্যামবাজারের দিকে। কমলদা শ্যামবাজার পর্যন্ত এসে তারপর হঠাৎ কোথায় হারিয়ে যান। কিংবা কোনোদিন হঠাৎ তিনি দৌড়ে উঠে পড়েন একটা চলন্ত বাসে। ডি কে যে-সব দিন আমাদের গাড়িতে পৌঁছে দিতে আসতেন, সেদিনও কমলদা কিছুতেই শ্যামবাজার ছাড়িয়ে আর যেতে চাইতেন না কারুর সঙ্গে। অর্থাৎ কমলদা কারুকে তাঁর বাড়ি চেনাতে চাইতেন না। শুনেছিলাম তিনি অজ্ঞাতবাস করতেন। কোন্ রহস্যময় কারণে তিনি তখন করতেন, তা এখনো জানি না। কলকাতা শহরে কেউ তাঁর ঠিকানা জানতো না। সে সময় কমলদার কোনো নির্দিষ্ট জীবিকাও ছিল না। খুব সম্ভবত তিনি সে সময় সিগনেট বুকশপের শিল্পসজ্জার পরামর্শদাতা ছিলেন এবং 'তদন্ত' নামে একটি গোয়েন্দা কাগজ বার করেছিলেন কিছুদিন। সেই পত্রিকায় 'দারোগার দপ্তর' নামে দুর্লভ বইটির পুনর্মুদ্রণ হচ্ছিল মনে আছে, আর কমলদার সম্পাদকীয়-গুলি হতো অনবদ্য।

ডি কে আর সে রাত্রে ওপর থেকে নামলেন না। বুড়ো ওপর থেকে ঘুরে এসে জানালো, এখন ডি কে-কে ঘাঁটাতে গেলে আরও গোলমাল হবে। এদিকে কমলদাও অদৃশ্য হয়ে গেছেন। আমাদের নাটক বন্ধ হয়ে গেল কিনা বুঝতে না পেয়ে আমরা বাকরুদ্ধ অবস্থায় বাড়ি ফিরে এলাম। একটিমাত্র বাক্যের এমন মহান বিবাদের দৃশ্য কবে কে দেখেছে আর!

পরদিন ডি কে'র ছোটভাই মানিক গুপ্ত এসে শ্যামবাজারে দেখা করলেন আমাদের সঙ্গে। মানিকদা বললেন, কী সব ছেলেমানুষী কাণ্ড বলো তো! এখন অভিনয় বন্ধ হয়ে যাবে। সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে। ডি কে সেই থেকে নিজের ঘরে বসে আছে। কারুর সঙ্গে কথা বলছে না। কোথায় কমলবাবু?

আমরাও কম ত্যাঁদোড় ছেলে ছিলাম না। কমলদা অজ্ঞাতবাস করতে চাইলেও আমাদের ফাঁকি দিতে পারেননি। অনেক গোয়েন্দাগিরি করে কমলদার বাড়ি খুঁজে বার করা হলো। কমলদা প্রায়ই শিল্পী সুনীল পালের নাম করতেন। তাঁর গড়া মূর্তি একটু একটু করে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা দেখতেন যেমন যাওয়া-আসার পথে ওঁকে দেখেন এই রকম। আমার কলেজের বন্ধু শিবশম্ভুকে ধরে গেলাম সুনীল পালের বাড়ি। সেটা যশোর রোডের ধারে

পাতিপুকুরে। তিনি বললেন, কমলবাবুর বাড়ি, এই তো পাশেই!

একটি ছোট্ট নতুন একতলা বাড়ি। সংক্ষিপ্ত বাগানের সামনে কাঞ্চন গেট। সেই গেট খুলে ঢুকছি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে। দু'বার তাঁর নাম ধরে ডাকতেই তিনি গেঞ্জি পরে বেরিয়ে এসে সহাস্য সুরে বললেন, এসো, এসো!

আমরা এসে, জাদুঘরের মতন অসংখ্য জিনিসে সাজানো কমলদার বাইরের ঘরে বসলাম গুটি গুটি। কমলদা পাশের ঘরের দরজার দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে দরাজ গলায় বললেন, বড়বৌ, এই সব ছেলেরা এসেছে, ওদের একটু মিষ্টিমুখ করাও।

ডি কে'র ভাই মানিক গুপ্ত একজন ডাকাবুকো লোক। তিনি বললেন, আরে কমলবাবু, আপনার বাড়ি যদি খুঁজে না পেতাম, তাহলে কী হতো বলুন তো! আপনি আর যেতেন না? হাজার খানেক লোককে কার্ড দিয়ে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে—

কমলদা সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে হেসে উঠলেন হা হা করে। তারপর অন্য পাঁচরকম রঙ্গরসিকতা শুরু করলেন এমন যে আমাদের ভয় হলো উনি বোধহয় আসল ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবেন। উনি রাগারাগি করলে বরং আমরা নিশ্চিন্ত হতাম।

এক সময় আমরা বললাম, কমলদা আপনাকে আমরা ধরে নিয়ে যাবো।

কমলদা বিনা বাক্যব্যয়ে জামা পরে এলেন। সদলবলে আমরা এলাম হরবোলায়। বাইরে সিঁড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ডি কে। যেন কিছুই হয়নি, এই ভাবে সহাস্যে কী কমলবাবু বলে এগিয়ে এলেন তিনি। তারপর দুই বন্ধু আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

এরপর চার শনি রবিবার ধরে হয়েছিল মুক্তধারার অভিনয়। কোথাও কোনো কিছুর অভাব ছিল না। খালি চোখে দেখা যায় না, এমন সূক্ষ্ম চিড় কী রয়ে গিয়েছিল? আমরা ঠিক টের পাইনি। মুক্তধারা নাটকে আমার ছিল যন্ত্ররাজ বিভূতির ভূমিকা। অর্থাৎ ভিলেন। গলায় একটা মস্ত গাঁদা ফুলের মালা, নাটকের শেষ দৃশ্যে, কমলদা বলে দিয়েছিলেন, বাঁধ কে ভাঙলে কে ভাঙলে—এই চিৎকার করতে করতে আমি মালাটাকে ছিঁড়ে ফেলবো। আমি ঝোঁকের মাথায় এমন জোরে হাত চালালাম যে সেই ছিন্নমালা উড়তে উড়তে গিয়ে পড়লো দর্শকদের মাঝখানে চিত্রতারকা অরুন্ধতী মুখার্জির

কোলে। হাসির ধুম পড়ে গেল তাই নিয়ে।

এর পরও অবনীন্দ্রনাথের লম্বকর্ণ পালার রিহার্সাল চলেছিল কিছুদিন। তারপর একসময় নিজস্ব নিয়মে হরবোলা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়।

২.

শ্যামবাজার পাঁচ মাথার কাছে ইউনাইটেড কফি হাউস নামে অধুনালুপ্ত একটি সরাইখানাতে একদা আমাদের আড্ডা ছিল। সেখানে কোনো এক রবিবার সকালে কমলকুমার মজুমদার তাঁর প্রথম উপন্যাস আমাদের কয়েক-জনকে উপহার দেন। উপন্যাসটি বেরিয়েছিল একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যপত্রিকার ক্রোড়পত্র হিসেবে, পত্রিকাটির নাম আমরা জানতে পারিনি, কেন না, কমল-কুমার পত্রিকাটি থেকে তাঁর রচনাংশ ছিঁড়ে আলাদা কাগজে নিজে মলাট সেলাই করে একটি সম্পূর্ণ পুস্তক হিসেবেই দিয়েছিলেন আমাদের। উপন্যাসটির নাম অন্তর্জলী যাত্রা, যার শুরুতেই ভোর বেলার বর্ণনা এরকম : আলো ক্রমে আসিতেছে। আকাশ মুক্তা ফলের ন্যায় হিম নীলাভ।

কমলকুমার মজুমদারের রচনার সঙ্গে সেই আমাদের প্রথম পরিচয়। মানুষটিকে এর বছর ক'এক আগে থেমেই চিনি, ১৯৫৩ সালে সিগনেট প্রেসের পরিচালক দিলীপকুমার গুপ্ত (ডি কে নামে পরিচিত ছিলেন ছোট-বড় সকলের কাছে) আমাদের মতন সদ্য কলেজে পড়া ছোকরাদের নিয়ে হরবোলা নামে গড়েছিলেন একটি নাটকের দল, তার পরিচালক হিসেবে আসেন কমলকুমার, সেই সূত্রে তাঁকে আমরা কমলদা বলে ডাকি। কুচকুচে কালো রঙের একজন বলিষ্ঠকায় পুরুষ, ধুতি ও লক্ষ্ণৌয়ের কলিদার পাঞ্জাবি পরা, কণ্ঠস্বর গমগমে। তিনি সর্বক্ষণ এলাচ ও লবঙ্গ খেতেন, অত এলাচ-লবঙ্গ মানুষের সহ্য হবার কথা নয়, পরে জেনেছিলাম, আমাদের কাছ থেকে উঁর মুখের দেশী মদের গন্ধ লুকোবার জন্যই ঐ প্রকার চেষ্টা। হাস্য পরিহাসে, বুদ্ধির প্রাখর্যে ও বাক বৈদগ্ধ্যে অতুলনীয়, কিন্তু কোনো এক রহস্যময় কারণে তিনি একটি সাধারণ চটের থলে ('কাঁধে ঝোলান শান্তিনিকেতনী ঝোলা নয়, যাকে বলা হয় র‍্যাসন ব্যাগ) বহন করতেন সব সময়, যার মধ্যে থাকতো তাঁর সর্বক্ষণ পাঠ্য বইপত্র ও টাকা পয়সা। চটের থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টাকা তুলে এনে ট্রাম বাসের টিকিট কাটতে আমরা আগে কখনো কারুকে দেখিনি। ছিলেন অনুযায়ী তখন তাঁর বয়সে আটত্রিশ, কিন্তু তিনি এমন ভাব করতেন

যেন জন্মেছেন উনবিংশ শতাব্দীতে, শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরদের স্বচক্ষে দেখেছেন। স্কারোঁ নামে এক মধ্যযুগীয় ফরাসী কবির রচনা এখন অনেক ফরাসীই পড়েন না, কিন্তু কমলদা যখন তখন স্কারোঁ কিংবা ভিয়োঁর মতন কবিদের মূল রচনা উদ্ধৃত করতেন, আবার বাংলায় কাঙ্গাল হরিনাথ রচিত 'হারামণি' থেকেও স্তবক উদ্ধার করতেন সাবলীল ভাবে।

আমরা 'হরবোলা' প্রতিষ্ঠানের চ্যাংড়ারা আমাদের মোশান মাষ্টার কমলদার অন্ধ ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম প্রথম দিন থেকেই, কিন্তু তাঁর রচনা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না আমাদের। ক্রমে লোকপরম্পরায় শুনেছিলাম যে একদা উনি লেখক ছিলেন। নরেশ গুহ সিগনেট প্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তখন, তিনি একদিন বলছিলেন, তোমরা জানো না, কমলবাবু এক সময় চমৎকার কয়েকটি ছোট গল্প লিখেছেন 'চতুরঙ্গ' ও 'সাহিত্য পত্রে'। তি কেও বলতেন, কমলবাবু, আপনি আর লেখেন না কেন? কমলদা সে কথা হেসে উড়িয়ে দিতেন। মনে হতো যেন, লেখার ব্যাপারে ওঁর কোনো অভিমান বা বিরাগ জন্মে গেছে। আমরা তখন কবিতা রচনা ব্যাপারে খুব মাতামাতি করছি এবং সদ্য দাঁত ওঠা কুকুর ছানার মতন কামড়ে বেড়াচ্ছি একে তাকে, কমলদা পরিহাস করতেন আমাদের।

'হরবোলা' কয়েক বছরের মধ্যেই উঠে যায় কিন্তু আমরা তখনও কমলদার সঙ্গে ছায়ার মতন লেগে থাকতাম। এই সময় তিনি হঠাৎ আবার লিখতে শুরু করলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস দেখেই আমরা স্তম্ভিত। এরকম বাংলা গদ্য আমাদের কিংবা বাংলা গদ্যের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক দূরে। গুরু-চণ্ডালী শব্দ উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্রও এক চণ্ডাল ও এক ব্রাহ্মণী, এবং বাক্যবন্ধও অতি জটিল, বাংলা ব্যাকরণের কোনো নিয়মের ধার ধারে না। কেউ কেউ বলতে শুরু করলেন, বাংলা গদ্যভঙ্গি ইংরেজী সিনট্যাক্স অনুযায়ী চলে, ফরসী ভাষায় পণ্ডিত কমলকুমার ফরাসী সিনট্যাক্সে বাংলা চালু করছেন। এ কথাও পুরোপুরি সত্যি নয়, ফরাসীতে বিশেষণগুলি কর্তার পরে বসে, লাল ফুলের বদলে ফুল লাল যেরকম, তা ছাড়া ফরাসী ধাতুরূপ ইংরেজীর চেয়ে বেশী কিন্তু সংস্কৃতের মতন। এর চেয়েও বড় কথা, যত দূর জেনেছি, ফরাসী গদ্য ফরাসীদের মুখের ভাষারই অনুসারী, পৃথিবীতে সব ভাষাতেই গদ্য ও মৌখিক ভাষা কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে, কৃত্রিম অলঙ্কারবহুল ভাষা সূক্ষ্ম চিন্তার বাহক না হয়ে বাধা হয়, কিন্তু কমলকুমারের মুখের ভাষার সঙ্গে

তার লিখিত বাক্যের হাজার যোজন ব্যাবধান। তাঁর মুখের ভাষা ছিল খাঁটি মধ্য কলকাতার, অনেক সময় যাকে আমরা বলি কাঁচা বাংলা, (অর্থাৎ অতিশয় পরিপক্ব) এবং সব সময় রঙ্গরস মিশ্রিত। অথচ তাঁর লিখিত গদ্যের একটি বাক্য বার বার না পড়লে অর্থ উদ্ধার করা যায় না। তৎক্ষণাৎ অর্থ বুঝতে না পারলেও তাঁর লেখা, অনেকটা কবিতার মতন বারবার পড়তে ইচ্ছে হয়, প্রতিটি শব্দের প্রতি এমনই মনোযোগ এবং ভিতরে এমনই জাদু।

এর পর প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর অন্য রচনাগুলি, বছরে একটি বা দুটি, কখনো বা দু বছরে একটি, দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি গল্প, 'মতিলাল পাদ্রী' এবং 'তাহাদের কথা', তাঁর উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয় বেশির ভাগই ছোট পত্রিকায়, এক্ষণেই বেশিরভাগ, আমরা কৃত্তিবাসের গোটা একটি সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলাম, তাঁর বড় উপন্যাস 'সুহাসিনীর পমেটম'। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের নাম 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক,' 'শ্যাম নৌকা', 'খেলার প্রতিভা', 'কয়েদখানা', 'রুক্মিণী কুমার'—এর মধ্যে পুস্তকাকারে পাওয়া যায় দু' একটি মাত্র এবং তাঁর 'গল্প সংগ্রহ' এবং 'নিম অন্নপূর্ণা' নামে গ্রন্থ। তবু কমলকুমার মজুমদার বরাবরই রয়ে গেলেন সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য জগৎ থেকে দূরে, বাইরে। আক্ষরিক অর্থেই তিনি একজন আউটস্টাণ্ডিং লেখক। কোনো সংকলনে তাঁর গল্প নেওয়া হয়নি, কোনো সাহিত্য সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি তাঁকে (তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন কি না, সেটা আলাদা কথা), বেশির ভাগ পাঠকের কাছেই তিনি রয়ে গেলেন অজ্ঞাত, সমসাময়িক অনেক লেখক তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন কিন্তু তাঁর রচনা পড়েননি এক লাইনও। নিজের রচনার দুরূহতা বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন তিনি, 'নিম অন্নপূর্ণা' প্রকাশিত হবার পর তিনি রসিকতা করে বলেছিলেন, আমার বই উনত্রিশখানা বিক্রি হয়েছিল, তারপর তিরিশ জনই দোকানে বই ফেরত দিয়ে গেছে। তবু, দিন দিন যেন আরও বেশী দুরূহতার সাধনায় ব্রতী হলেন।

খুব দুর্মুখ ছিলেন, বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটানোর আশ্চর্য প্রতিভা ছিল তাঁর, সমসাময়িকদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু পরবর্তী বয়ঃ-কনিষ্ঠদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একটি ছোট দল, পরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট দল তাঁর লেখা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছে, বিশেষত কবিরা। ওয়েলিংটনের কাছে একটি বাংলা মদের দোকানে কমল-

কুমার মজুমদারের সান্নিধ্যে কেটেছে আমাদের যৌবনের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি বছর। পুরো এক গ্লাস নীট বংলা মদ (৩৫ শক্তি, আজকাল পাওয়া যায় না) এক চুমুকে খেয়ে ফেলে অবিচলিত থাকার মতন দ্বিতীয় মানুষ আমি সারা পৃথিবীতে দেখিনি। এব, ঘন্টার পর ঘন্টাব্যাপী প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে কথাবার্তায় চুম্বকাকৃষ্ট করে রাখার ক্ষমতাই বা কজনের থাকে। বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান ও নতুন চিন্তা, নিজে ছবি আঁকতেন ও খ্যাতনামা চিত্র সমালোচক ছিলেন, গ্রামের জীবন, বিভিন্ন অঞ্চলের লোক শিল্প ও কথা ভাষায় রূপান্তর—এমন কত দিকে ছিল তাঁর আগ্রহ। সাহিত্য তো ছিল তাঁর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত তিনি, শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বাক্যকে তিনি সবচেয়ে বেশী মূল্য দিতেন, আমায় রসে বসে রাখিস মা, শুকনো সন্ন্যাসী করিস নে। ওয়েলিংটনের সেই সান্ধ্য আসর থেকেই তাঁর পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল দুটি স্বল্পজীবী পত্রিকা, একটির নাম 'তদন্ত', যেটি গোয়েন্দা ও অপরাধ কাহিনী বিষয়ক ও আর একটির নাম 'অঙ্ক ভাবনা', যেটির বিষয় গাণিতিক দর্শন। হ্যাঁ, একই ব্যক্তি এই দুটি পত্রিকার কথা চিন্তা করেছিলেন।

তিনি এই পৃথিবীতে ৬৪ বৎসর থেকে গেলেন। শেষ জীবনে তিনি শিক্ষকতা করতেন সাউথ পয়েন্ট স্কুলে, যদিও, শুনেছি, তার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল না। কয়েক বছর খুব কষ্ট পেলেন হাঁপানী রোগে, তাতেও তাঁর তীক্ষ্ণতা ও রসবোধ এক বিন্দু কমেনি, নবীনতর কিছু লেখকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থেকে গেছে বরাবর।

কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস ও গল্পগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই বিষয়ের গভীরতায় অসাধারণ, ঠিক এমন চোখ দিয়ে মানুষের জীবন আর কেউ দেখেননি। ভাষার কঠিন আবরণের জন্য তা পাঠকদের কাছে পৌঁছোয় নি, রচনাগুলি রইলো ভবিষ্যৎ কালের জন্য, ভবিষ্যতের উদ্যমশীল রসভোক্তাদের জন্য।

আমি কমলকুমার মজুমদারকে আমার একটি বই উৎসর্গ করেছি। সেই বইয়ের এক কপি তাঁকে দিতে গিয়ে বলেছিলাম, কমলদা, এ বইটা আপনার বাড়ির কোনো খাট বা টেবিলের পায়া যদি ঠকঠক করে তখন সেই পায়ার নীচে গুঁজে দেবার জন্য বইটা রেখে গেলাম।

'অন্তর্জলীযাত্রা'-র ঘোর বাস্তবতা/অশ্রুকুমার সিকদার

'আমার যেমন পোড়া কপাল এমন যেন আর কারো না হয় ছয় বৎসর সময় বে হয় কিন্তু স্বামী কেমন চক্ষে দেখনু না – শুনেছি তাঁর পঞ্চাশষাটটি বিয়ে, বয়েস আশী বচ্ছরের উপর·· বড় অধর্ম না হোলে কুলীনের ঘরে মেয়েমানুষের জন্ম হয় না আর একজন বলিল ওগো জল তোলাহয়ে থাকে তো চল চল ঘাটে এসে আর বাক্‌চাতুরীতে কাজ নাই —তোর তবু স্বামী বেঁচে আছে আমার যার সঙ্গে বে হয় তাঁর অন্তর্জলি হচ্ছিল।'— জলের ঘাটে নারীদের কথোপকথন, 'আলালের ঘরের দুলাল'।

ভাষা বা চিত্র বিবেচনার বিষয় নয় আজ আমাদের। কমলকুমারের ভাষাগত চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা সকলের প্রশংসা পায়—'যে-চিত্র, তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতা ও দিব্যদৃষ্টিপাতে সম্ভব হয়েছে, যে-চিত্র সত্যের অন্তঃস্থলে ছুটে যায়।' অনায়াস আর সাবলীল তাঁর চিত্রব্যবহার. সেই সব চিত্রকে আশ্রয় করেই তাঁর উপন্যাস গল্প রচিত হয়ে যায়, পেয়ে যায় তাঁর নিজস্ব বাস্তবতার ধর্ম। তাঁর এই চিত্রময়তার সম্বন্ধে চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় অনেক দিন আগে যেমন বলেছিলেন—'চিত্র আনতে গেলে বাইরের সংশ্লে সচেতন হতে হয়, সচেতন হলে যে বস্তুটির সম্বন্ধে সচেতন তার প্রতি দায়িত্ব আসে, দায়িত্ব এলে শুধু বিষয়ীর নয় বিষয়ের কথাও ভাবতে হয়, ফলে আপনা থেকে বাক্‌সংযম আসে এবং একবার বাক্‌সংযম করতে পারলে বিষয়বিষয়ী পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীল হতে দেরি লাগে না।' এইসব গুণেই কমলকুমারের রচনা আশ্চর্যভাবে সচিত্র। আমাদের বিবেচনার বিষয় নয় তাঁর ভাষাও—যা তীব্র বিতর্ক জাগায়। অনেকেই মনে করেন তাঁর রচনা আস্বাদনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক তাঁর ভাষা যে-ভাষা ভয়ঙ্কর সুন্দর, শক্তিশালী, দীপ্তিমণ্ডিত অথচ অসম্ভব দুরূহ। কমলকুমার নিজে মনে করতেন 'ভাষাকে যে আক্রমণ করে সেই ভাষাকে বাঁচায়।' তাঁর কূটস্থ চৈতন্য ব্যঞ্জনায় অন্বেষণ করে, অভীষ্ট লাভের জন্য তিনি গদ্যে যে অভিনবত্ব করেন, মিশ্ররীতির যে ব্যবহার করেন, অনুরাগীর ভাষায় তা 'এক মরিয়া মানসিকতার' হাতিয়ার। তাঁর গদ্য আমাদের

অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ ঘটায়, ভাষার বাহন ও ধারণক্ষমতার বৃদ্ধি করে, বিষয়ের পরিধি প্রসার ঘটায়। সেই কারণে উত্তরসূরি একজন গল্পকার মনে করেন, 'কমলকুমার মজুমদারের ভাষা প্রকরণ এইভাবে আমাদের অনুভূতির সম্প্রসারণ ঘটানোর ফলে বাঙলা গদ্যের বিস্তার ক্ষমতা বহুগুণে বেড়েছে।' অন্যদিকে তুলনাত্মক সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ একজন মনে করেন কমলকুমারের অতি-আধুনিক পরীক্ষামূলক বাক্‌শৈলী বাঙলাভাষা নিয়ে ফুটবল খেলার নামান্তর। ফলে বাঙলা কথাসাহিত্যে তাঁর ভূমিকা 'প্রগতি-বিদ্বেষী, ইতিহাসবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল।' তিনি মনে করেন, কমলকুমারের গদ্য ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্গের মতো দুষ্প্রবেশ্য, সেই ভাষা কিছু কমিউনিকেট করে না। দুই পক্ষে দূরত্ব এইভাবে যতোটা দুরতিক্রম্য মনে হয়, আসলে অবশ্য ততোটা নয়। কারণ, অনুরাগীদের বক্তব্য প্রধানত কমলকুমারের ছোটগল্পের ভাষা নিয়ে, যখন তাঁর ভাষাগতপরীক্ষা ততোটা উন্মার্গগামী হয়ে ওঠে নি। আর বিরোধীদের অভিযোগ আসলে উত্তর পর্বের উপন্যাস বিষয়ে প্রধানত— 'সুহাসিনীর পমেটম', 'শ্যামনৌকা', 'পিঞ্জের বসিয়া শুক' বিষয়ে প্রধানত।

কিন্তু ভাষাচিত্রী বা গদ্যকার কমলকুমারই আজ বিবেচনার বিষয় নয়। অন্তর্জলীযাত্রার মহিমাকীর্তনে যুযুধান দুইপক্ষের মধ্যে সন্ধিস্থাপিত হয়ে যায়। এই প্রথম উপন্যাস রচনাকালে কমলকুমার বাঙলা ভাষার উপর তেমন 'সংগঠিত বলাৎকার' শুরু করেন নি। আজ বিশ্লেষণের বিষয়, চিত্রগুণ ও ভাষার স্বকীয়তায় তিনি 'অন্তর্জলীযাত্রায়, যে 'ঘোর বাস্তবতা' অর্জন করেন, সেই বাস্তবতা। এই বাস্তবতা, যার মধ্যে কমলকুমার গল্পের গল্পত্ব খুঁজে পান, সর্ব-স্বভাবে রিয়ালিটির এই প্রসঙ্গেও একটা অন্য তর্ক এসে যায়। তাঁর অতি-আধুনিক বাক্‌শৈলীর সঙ্গে 'অতি পুরাতন সনাতন হিন্দু চিন্তাধারা' একটা বৈপরীত্য ও বৈষম্য সৃষ্টি করে বাস্তবতার ব্যাঘাত ঘটায় কিনা। আধুনিক মাধ্যম এবং সনাতন বাণী ও পটভূমি যেন পরস্পর বিরোধী। অথচ তৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রাচুর্য, সাধুক্রিয়াপদ, সমাস ও নামধাতুর আতিশয্য 'হরফাশ্রিত সৌন্দর্য,'-এর সন্ধানে পূর্ব প্রচলিত বানানরীতির প্রতি পক্ষপাত এইসব ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বা আর্গেইজম্ তো কাহিনীর সনাতন বিষয় ও পাটভূমির সঙ্গে সামঞ্জস্য রচনার প্রয়োজনেই তিনি ব্যবহার করেন। আবার বিপরীতভাবে যদি ধরেও নিই যে কমলকুমারের গদ্যরীতি বড় বেশি পরীক্ষামূলক ও আধুনিক তাহলেও কি অতীতচারী বিষয়ের বাহন হিসাবে তার

ব্যবহার দোষের হয়? আঙ্গিক ও বিষয়ের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত বৈপরীত্য অনেক সময় যে অপরূপ টেনশন্ সৃষ্টি করে অন্তত বিশ্বসাহিত্যের পাঠকের পক্ষে তা জানার কথা। ধরা যাক হারমান্ ব্রখের The death of Virgil উপন্যাসের কথা। মুমূর্ষু কবির জীবনের শেষ চব্বিশ ঘন্টার স্মৃতিসত্তা মনীষার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ এই উপন্যাসে বিধৃত। দীর্ঘ গীতিকবিতার মতো এই উপন্যাসে স্বপ্নময় প্রতীকের সমাহার যেন এক অসামান্য নক্শা পরিস্ফুট করে তুলেছে। এই উপন্যাস এক 'antique epic হলেও তার রচনাশৈলী একেবারেই আধুনিক। স্বেচ্ছাকৃত বৈপরীত্যে সেই উপন্যাসে যেমন পাই আমরা অপরূপ টেনশন্ তেমনি কমলকুমারের 'অন্তর্জলীযাত্রা'-তেও। গল্পের বস্তুত্ব, উপন্যাসের জোর বাস্তবতা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। বেড়ে যায় বরং।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর পঞ্চম খণ্ডে 'ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য, বলা হয়েছে। 'অন্তর্জলীযাত্রা'-র লেখক ভূমিকায় বলেছেন 'জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন' এবং 'এই গল্প, সেই গল্প ঈশ্বরদর্শন যাত্রার গল্প।' কথামৃতের দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চমুণ্ডীর শ্মশানের কথা পাই, যেখানে ভগবতী নিজে কঠোর তপস্যা করেছিলেন লোকশিক্ষার জন্য সেই পঞ্চমুণ্ডী কথা বারে-বারে আছে আমাদের এই উপন্যাসে। 'কত কটা ডাগর সতীদাহ হল,' তাই গঙ্গা চোখের জলে লোনা হল ; তাই ক্ষুব্ধ গঙ্গা ভাসিয়ে নিল পঞ্চমুণ্ডীর শ্মশান— 'মা গঙ্গার সঙ্গে চালাকি, মা-ই বটে কোম্পানী, ডুবে গেল শালা পঞ্চমুণ্ডী।' পঞ্চমুণ্ডীর ঘাট ডুবে যাওয়ার কারণের কথা যখন বৈজুনাথ বলে তখন তার দীর্ঘশ্বাসে, অসহায় কণ্ঠস্বরে 'গোধূলিলগ্নের অস্পষ্টতা, দূরাগত শঙ্খধ্বনির মায়া, বৎসহারা গাভীর আর্তরবের রেশ ছিল…।' কথামৃতে আরও পড়ি, রামকৃষ্ণ ঈষৎ হেসে নিজের শরীরের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে শরীরটাকে 'খোল' বলেছিলেন। হাটভাতারী খানকী মাগীর দুয়ারের মাটি পুণ্য হয়, কিন্তু পতিতা পতিতাই থাকে ; বৈজুও তেমনি শ্মশানের পুণ্যমাটিতে বাস করে ভাব পায় না, সে ভাবের পাগল—সে বলে, 'খোল বড় ভালোবাসি গো।' এই সব কারণেই কি গ্রন্থের ভূমিকায় কমলকুমার জানিয়ে দেন 'এই গ্রন্থের ভাববিগ্রহ রামকৃষ্ণের…।'

কিন্তু তলিয়ে দেখলে কিছুটা বিপরীত কথাই মনে হয়। রামকৃষ্ণ যখন দেহকে 'খোল' বলেছিলেন, তখন তিনি দেহকে অলীক মায়া-প্রপঞ্চ বলতে চেয়েছিলেন। দেহকে তিনি মূল্য দিতে চান নি, কিন্তু কমলকুমারের নায়ক

বৈজু দেহকে, খোলটাকে বড় ভালোবাসে। সে শবদাহ করে বটে, কিন্তু জ্যান্ত মানুষ চিতায় শোবে এই চিন্তা তার পক্ষে অসহনীয়। অসহনীয়, কারণ সে দেহকে মায়া মিথ্যা, অলীক মরীচিকা মনে করে না। 'দেহ-মায়াবন্ত' বৈজুনাথ বলে, 'কাল শালা যাকে লিয়েছে সে যাক। কিন্তু কেউ কাউকে ঠেলে চিতায় ফেলবে, এটা কি বল?' কথামৃতের তৃতীয় খণ্ডে চিরাগত সত্যকে নতুন করে রামকৃষ্ণ উপদেশ হিসাবে উচ্চারণ করেছেন—'কি জান, ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। জীব, জগৎ বাড়ি-ঘর-দ্বার, ছেলেপিলে, এ সব বাজিকরের ভেলকি।...কিন্তু বাজিকরই সত্য, আর সব অনিত্য। এই আছে, এই নাই।' দেহ যদি নিতান্ত খোল হতো, জীব যদি নিতান্তই বাজিকরের ভেলকি হতো, অনিত্য হতো—তাহলে প্রাণবন্ত যশোবতীর সতীদাহের সম্ভাবনায় বৈজু এত কাতর হতো না। তাই এই উপন্যাস যদি ঈশ্বরদর্শনের গল্প হয়, তাহলে মানুষই যে-ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরদর্শনের গল্প 'অন্তর্জলীযাত্রা'। আমাদের স্নেহের যে নশ্বর জগৎ, সেই জগৎ সম্বন্ধে এক করুণাবাচক আকুলতা রচিত-উপন্যাসের বাক্যপরম্পরার পরতে-পরতে মিশে গেছে। নশ্বর হতে পারে, কিন্তু জীব অলীক নয়, বাজিকরের ভেলকি নয়। তাই জ্যোতিষী অনন্তহরি গঙ্গাতীরে বেলাতটে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান নিয়ে যে অঙ্কপাত করেছিল, বৈজু দেখে সেই ধর্ষিত আঁকের উপর দিয়ে 'একটি ক্ষুদ্রকায়া ব্যাঙ, এই শায়িত ব্রহ্মাণ্ডের উপর দিয়ে লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছে।' বৈজুর চোখে ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে জীবিত একটি ব্যাঙ বড় বলে প্রতীয়মান হয়। আর একটা চূড়ান্ত বাক্য তো রামকৃষ্ণই বলেছিলেন—'মানুষ কি কম গা।' এই উপন্যাসে অতিপুরাতন সনাতন হিন্দু চিন্তাধারা নয়, জাতিধর্মের গোঁড়ামি নয়, মানুষের মহিমা কীর্তিত। আর সেই মহিমাকীর্তনের দায়িত্ব বৈজুর, শ্মশান-চণ্ডাল বৈজুনাথের।

আর কী অর্থে এই উপন্যাসের 'কাব্যবিগ্রহ রামপ্রসাদের'? 'শ্মশান ভাল বাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি'—রামপ্রসাদের গান হৃদয়-শ্মশানের গান, শ্মশানের পটভূমিতেই সেই গানের বৈরাগ্য ও আসক্তির মিশ্র আবেদন যেন যথার্থ রূপ পায়। এই উপন্যাসও শ্মশানের পটভূমিতে রচিত। অনতিদূরে উদার বিশাল প্রবাহিনী গঙ্গা, 'তরল মাতৃমূর্তি যথা'—শ্মশান অস্বস্তিকর নরবসার গন্ধ উদ্দাম, নশ্বরতার চিরসত্য সেখানে প্রতিভাত। সেই শশ্মানে প্রসাদী গান গায় বিজু—

> এবার আমি সার ভেবেছি।
> এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।

যে দেশে রজনী নেই মা সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।

যশোবতীর মনে পড়ে আর একটি প্রসাদী গানের কথা—

নয়ন থাকতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।

মা ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া।

যশোবতীর দিব্যসংস্কারবশে মনে হয় সে-ই রামপ্রসাদকে বেড়া বাঁধায় সাহায্য করেছিল, সীতারামকে তার মনে হয় 'জগজন-চিতচোর-নারায়ণ।' বৈজু গান গেয়ে যখন যশোবতীকে 'বিনিসুতোর মালাগাঁথুনী মালিনী' বলে বিদ্রূপ করে, তখন রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর কথা আমাদের মনে পড়ে। বৈজুও রামপ্রসাদের মতো বারে বারে সতর্ক করে দেয় 'ভাবের ঘরে চুরি ভাল নয়।' রামপ্রসাদী গানের ভাষার মতো বৈজুও রূপকের ভাষায় কথা বলে— 'দেহচিতায় মন পুড়ে গো', 'মানুষ বড অচিন গাছ', মুমূর্ষু সীতারাম মানুষটার জন্য মনে তার করুণা জন্মে, কারণ 'শুকনা ডালে পাখি দুটো বড় হিমসিম খায়'। রামপ্রসাদের পদাবলীর পরতে-পরতে আমরা নশ্বরতাবোধ জনিত কারণে যুগপৎ যে বৈরাগ্য আর আসক্তির মিশ্রানুভূতিতে আবিষ্ট হই, সেই আবেগগভীরতা 'অন্তর্জলীযাত্রা -কেও স্পন্দিত করে।

উপন্যাসের সূত্রপাতে একটি ছবি—'আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিমানীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্বার আমরা, প্রাকৃত জনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে।' এই উষালগ্নের চিত্র। আর উপন্যাসের শেষে আর এক ছবি, কোটালবানে সীতারামের সঙ্গে নববধূ যশোবতী ভেসে যাবার পর—'একটি মাত্র চোখ, হেমলকে প্রতিবিম্বিত চক্ষু সদৃশ, তাঁহার দিকেই, মিলন অভিলাষিনী নববধূর দিকে চাহিয়াছিল, যে চক্ষু কাঠের, কারণ নৌকাগাত্রে অঙ্কিত, তাহা সিন্দুরে অঙ্কিত এবং ক্রমাগত জলোচ্ছ্বাসে তাহা সিক্ত, অশ্রুপাতক্ষম, ফলে কোথাও এখনও মায়া রহিয়া গেল।' এই সূত্রপাত ও উপসংহারের দুই চিত্রলতার মধ্যে আছে এক মায়ার গল্প। 'পশ্চাতে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা অবুম্বরু, ঊর্ধ্বে অম্বর, সম্মুখে স্বামীসোহাগ লালিত যশোবতী, এ কোন ঘোর বাস্তবতা।' এই ঘোর বাস্তবতাকে পূর্ণাঙ্গ ও অকৃত্রিম করে তোলার আয়োজনে গঙ্গা ও যশোবতীর সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে অন্তর্জলীযাত্রী মুমূর্ষু সীতারাম চট্টোপাধ্যায়কে। তার সঙ্গে আছে কুল-পুরোহিত কৃষ্ণপ্রাণ, সীতারামের দুই পুত্র বলরাম ও হরেরাম, কবিরাজ

বিহারীনাথ, জ্যোতিষী অনন্তহরি, যশোবতীর পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ, এক গীতাপাঠক, কীর্তনিয়াদল এবং সর্বোপরি, ভূয়োদর্শী এক 'বাগ্মী-চণ্ডাল' বৈজুনাথ। অতীব প্রাচীন কুলীন ব্রাহ্মণ সীতারাম গঙ্গাতীরের শ্মশানে আনীত হয়েছে আসন্ন মৃত্যুর বিবেচনায় অন্তর্জলীর জন্য। ক্রমাগতই বাত্ময়ী গঙ্গার জলছলাৎ তার বিশীর্ণ পদদ্বয়ে লাগছিল—'বৃদ্ধের দেহে-দেহে কালের নিষ্ঠুর ক্ষতচিহ্ন, অসংখ্য ঘুণাক্ষর, হিজিবিজি।' কপালে চন্দনের প্রলেপে মুখমণ্ডল আরো বীভৎস। নরবসার গন্ধে উদ্দাম শ্মশানে মৃতকল্প সীতারাম।

দুঃসাহসিক মোচ নিয়ে উপস্থিত বৈজুনাথ—শ্মাশানচণ্ডাল।' যে-কমলকুমারকে বলা হয়েছে হিন্দুসংস্কারাচ্ছন্ন, তিনি কিন্তু এই চণ্ডালকেই নায়ক করেছেন এই অসামান্য উপন্যাসের। মৃত্যু দেখে-দেখে, শব দাহ করে-করে, সে মৃত্যু সম্বন্ধে নির্বিকার। নিজের হৃদয়, বৈজু বলে, লোহা কেন, দধীচির অস্থি দিয়ে গড়া, পালোয়ান পালোয়ান বাজ দিয়ে গড়া। তার মাংস শেয়াল কুকুরেও খায় না। "মড়া দেখি দেখি আমি মাটি হইছি গো, আমি তো শব গো, বহুদিন মরে আছি হে···।" নির্বিকার ঈশ্বর সম্বন্ধে সে বলে, "উই যে শালা উপরে, যে শালা সবার ভিতরে, তা কমল মানতে হবেক···সে বড় কঠিন প্রাণ গো, কোন বোধ নাই, কান নাই, হাত নাই···বিকার নাই।" ঈশ্বরের মতো, মৃত্যু বিষয়ে বৈজুরও কোন বিকার নেই। মৃত্যু দেখে সবাই বলে, শত্রুরও যেন মৃত্যু না হয়। কিন্তু বৈজু জানে "অথচক এমনি হয়।" কিন্তু যতোই সে নির্বিকার হোক, সদ্যপিতৃহারা লাউ-ডগা সুন্দর ক্রন্দনরত বালকের বেদনায় তার বজ্রকঠিন মন আর্দ্র হয়। এমনকি বৃদ্ধ সীতারামের জন্যেও তার মনে করুণা জন্মেছিল—"কাঁহাতক বুড়া মানুষটা হিম খাবে গো, আর মড়াবসার, মড়া পুড়ার গন্ধ শুঁকবে··।" সেই নির্বিকার জীবনপ্রেমিক বৈজু "তত্ত্বকথা বেজায়" জানে, কারণ শ্মশানে তার বাস, আর শ্মশান "ই যে মহাটোল বটেক।" কত পণ্ডিত আচার্যের তত্ত্বালোচনা সে শোনে, সে জানে "আত্মার সাকিম কুথাকে।" সে জানে, চিতায় যে কলস ভাঙা হয়, সে আসলে ঘটাকাশ, ভাঙলেই পটাকাশে মিলাবে। আবার নির্বাপিত চিতায় রৌপ্যখণ্ড পেলে বগল বাজিয়ে মহোল্লাসে নৃত্য করে বৈজু। চিতা থেকে কাঠকয়লা তুলে নিয়ে দাঁত মাজে বৈজু একেবারে স্বাভাবিকভাবে। তা দেখে অন্যেরা অস্বস্তিবোধ করে। তাদের অস্বস্তি অনুমান করে এই শাস্ত্রজ্ঞানী চণ্ডাল জবাব দেয়, মৃত্যুতে কিছুই এথমে থাকে না, "তুমিও আবার নাচতে নাচতে লাঙল ধরবে,

ছেলে শুখালে, বউকে বলবে মাই দে না কেনে ?" দ্বিতীয়ত, শব ছেড়ে বাইরে যাওয়া ডোমের নিষেধ বলেই সে দাঁতন খুঁজতে বাইরে যায় না। আর তৃতীয়ত, সতীদাহের পর চিতা নিবলে ব্রাহ্মণেরা যে মৃতার সোনা খুঁজে-খুঁজে বের করে তাতে যদি দোষ না থাকে, তাহলে চিতার কাঠকয়লায় দাঁত মাজলে তার দোষ হবে কেন ?

এই ভাবে সতীদাহের কথাটা উঠে পড়লো। যে বৈজু পরে সতীদাহ নিবারণ করতে আপ্রাণ সচেষ্ট হবে, তার মুখ দিয়ে অসতর্কভাবে যেন সতীদাহের কথাটা প্রথম উচ্চারণ করিয়ে নিলেন কমলকুমার। বৈজু এখনো জানে না, অন্তরালে সতীদাহের এক আয়োজন হতে চলেছে। সতীদাহ নিয়েই এই উপন্যাসের আসল নাটক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিস্তারিতভাবে জানিয়েছিলেন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক মর্মান্তিক সত্য। 'অঘরে অর্পিতা হইলে কন্যা কুলক্ষয়কারিনী হয় ; এজন্য, কন্যার দশা কি হইবেক, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, যেন তেন প্রকারেন, কন্যাকে পাত্রসাৎ করিতে পারিলেই, তাঁহারা (কুলীন ব্রাহ্মণেরা) চরিতার্থ হয়েন। লক্ষ্মীনারায়ণ তাই জ্যোতিষী অনন্তহরির গণনার দিকে উন্মুখভাবে তাকিয়ে আছে। যদি সীতারাম আরো দু-চারটে দিন বেঁচে থাকে, তাহলে গঙ্গাতীরের শ্মশানেই লক্ষ্মীনারায়ণ সীতারামের সঙ্গে কন্যা যশোবতীর বিবাহ দিতে পারবে— যেন তেন প্রকারেন কন্যাকে পাত্রসাৎ করে কুলরক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করবে। পরিণামে যে সদ্যবিবাহিতাকে অচিরেই বিধবা হতে হবে, এবং তাকে যে সতীদাহের চিতায় আরোহণ করতে হতে পারে, এ সব যেন বিবেচনার বিষয় নয়। অবশ্য সীতারামের সঙ্গে তার কন্যাকে পরিণামে সহমৃতা হতে হবে সেটা প্রথমে লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় নি। জ্যোতিষী অনন্তহরি বালুতটে অঙ্কপাত করে জানলো, পূর্ণিমায় 'চাঁদ যখন লাল হবে' তখন সীতারামের প্রাণবায়ু নির্গত হবে। 'কিন্তু একা যাবে না হে। দোসর নেবে...।' এই মুমূর্ষু জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মৃত্যুকালে দোসর নেবে, এই সংবাদ এতোই অবিশ্বাস্য মনে হয় যে বৈজু সমর আহ্বানের ভঙ্গিতে হাত আন্দোলিত করে মহাকৌতুকে বলে, 'দোসর! দোসর বলতে হবে বুঝি আমি! বুড়া বুজ্‌ঝি আমায় লিব্‌বে গো।' শেষ বাক্যটি সে ঝুমুরের ছন্দে বলে মহা উৎসাহে লাফিয়ে উঠেছিল। কন্যাকে সীতারামের সঙ্গে বিয়ে দিলে তাকে যে সহমৃত হতে হবে, সেই কথা স্পষ্ট হয়ে গেলে লক্ষ্মীনারায়ণ একেবারেই যে মানবিক করুণায়,

অপত্যস্নেহে প্লাবিত হয় নি তা নয়। 'বারম্বারই একটি বালিকার, যে তপ্তকাঞ্চননবর্ণা সর্বাংশে লক্ষ্মীপ্রতিমার ন্যায়, তাহার সরল নির্মল মুখমণ্ডল তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিয়া তাঁহাকে সর্বরূপে বিমূঢ় করিয়াছে…।' কিন্তু সে-ও তো প্রথার নিগড়ে বন্দী, তাই অচিরেই অবসাদ সে কাটিয়ে ওঠে। গঙ্গাতীরে আনীত সীতারামের প্রাণবায়ু-নির্গমনের কাল-বিলম্ব সমাচারে সে চোরা আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু অপরাধবোধ থেকে সে স্বভাবতই নিস্তার পায় না। বিবাহের পর সে যশোবতীকে বোঝায় সবই কপাল এবং তাকে সে স্বামীসেবা ও পতিভক্তির পরামর্শ দেয়। তার পুণ্যে যশোবতীর পিতৃকুলের স্বর্গবাস হবে, এমনকি সীতারামেরও পুনর্জন্ম হবে, ইত্যাকার সান্ত্বনাবাক্য সে অসংলগ্নভাবে বলে চলে। কলাপাতা থেকে এক মুষ্ঠি ধান নিয়ে যশোবতী পিতৃঋণ শোধ করতে গিয়ে অশ্রুসংবরণে ব্যর্থ হয়, লক্ষ্মীনারায়ণেরও বুক ফেটে যায়।

সীতারামের সঙ্গে তার কন্যার পরিণয়ে রাজি করানোর জন্যে তার পরিজনবর্গকে অনুরোধ করতে লক্ষ্মীনারায়ণ যখন অনন্তহরিকে বলে, তখন এই প্রস্তাবে বাধা দেয় একমাত্র আয়ুর্বেদিক নাড়ীজ্ঞানী বিহারীনাথ। বিহারীনাথের পেশা মানুষের দেহকে নীরোগ করা, তাই জীবন্ত মানুষকে দাহ করার প্রস্তাবে তার মন সায় দেয় না। জ্যোতিষী অনন্তহরি যখন অনিচ্ছুক বিহারীনাথকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল, তখনই সেখানে যেন দৈব-প্রেরিত হয়ে 'এক নয়নাভিরাম, বাবু, সুন্দর, প্রজাপতি' দেখা দিল। সেই প্রজাপতি দেখে পাত্রীর পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ 'স্তম্ভিত', অনন্তহরি 'অতিশয় আহ্লাদিত', আর বিহারীনাথ 'এই যুক্তিহীন দৈবঘটনাকে প্রীতির চক্ষে না দেখিলেও, এ মহা-আশ্চর্যে তিনি সত্যই হতবাক হইয়াছিলেন।' এই কাজের পক্ষে একের পর এক যুক্তি বিস্তার করে চলে অনন্তহরি। মৃত্যুকালে দোসর নেবার ব্যবস্থার সে পৌরাণিক উদাহরণ দেয়— পাণ্ডুপত্নী মাদ্রীর উদাহরণ। তাছাড়া মৃতকল্প সীতারামের সঙ্গে বিয়ে দিলে কুলীনকন্যার পিতৃকুলের জাতি-কুল-মান রক্ষা পাবে নিশ্চিত। কোম্পানীর রাজত্বে সতীদাহ নিষিদ্ধ ঠিকই, কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ শপথ করে সে মামলা করবে না। অভিজ্ঞতা দিয়ে কবিরাজ জানে, অল্পবয়সী বিধবার দায়িত্ব বাপেরা নিতে চায় না। তাই পিতা লক্ষ্মী-নারায়ণ থেকে জ্যোতিষী অনন্তহরি, পুরোহিত কৃষ্ণপ্রাণ সকলেরই লাভ এই সতীদাহে। কবিরাজ বিহারীনাথ জানে এতজনের স্বার্থ যেখানে জড়িত

সেখানে তার বাধা দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই সে বৈজুর সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও বাধা দেবার বৃথা চেষ্টা আর করে না। আর এই বিবাহ প্রস্তাবে সীতারামের সম্মতি চাওয়া হলে সে মুখমণ্ডলের দাড়ি দেখায়। যেন খেউরি করিয়ে মুখ পরিষ্কার করে দিলেই সে বিয়েতে রাজি।

বৈজুনাথ মৃত্যু সম্বন্ধে নির্বিকার, সে চিতার এক কোণে প্রজ্বলিত কাঠের উপর হাঁড়ি বসিয়ে ভাত ফুটিয়ে নিতে দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু এক সদ্য-যৌবনা নারীর সদ্যবৈধব্যের ও তার সহমৃতা হওয়ার সম্ভাবনায় সে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। জীবনের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তিতে এই মৃত্যুর সম্ভাবনাকে সে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধে উদ্যত হয়। সীতারাম মৃত্যুকালে দোসর নেবে জ্যোতিষীর এই ভবিষ্যৎবাণীকে বৈজু পরিহাস করায় জ্যোতিষী তাকে পরজন্মে কুকুর হয়ে জন্মাতে হবে বলে শাপ দিয়েছিল। উত্তরে জানিয়ে ছিল বৈজু 'সে হড় ভাল হবে গো ঠাকুর—কুকুর হওয়া ঢের ভাল।' অসহায়ভাবে হেসে বৈজু যেন বলতে চেয়েছিল, সতীদাহের আয়োজন করে যে মানুষ, তেমন মানুষ হওয়ার চেয়ে কুকুর হওয়া অনেক ভাল। অনেক পরে যশোবতী একবার তাকে 'কৃমিকীট হয়ে থাকবি' বলে অভিশাপ দিয়েছিল। তখনও বৈজুর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অনুরূপ—'মানুষ্যজনমে গড় করি, আমি আর চাই না কনেবউ··· কৃমিকীট কুকুর হওয়া ভালো গো, তাদের জাগা-ঘরে চুরি নেই, যাতনাও দেয় না হে।' অস্পৃশ্য ডোম চণ্ডাল সে, জাতিভেদস্তরের সব চেয়ে নিচু পর্যায়ে তার অবস্থান। এই অন্ত্যজ বৈজু উপন্যাসের নায়ক। তার হৃদয় বেদনায় দ্রবীভূত হয়, আর তাই উঁচুজাতের নৃশংসতা তাকে ক্ষিপ্ত করে। বামুন কায়েতের সতীর ছায়া তার মাড়ানো নিষেধ—নিচুজাতের লোক বলে সে অসহায়, উঁচুজাতের মানুষ হলে সে লাঠি ঘোরাতো, এদের বীভৎস বিবাহ ও নৃশংস প্রথাকে লাঠির জোরে বন্ধ করে দিত। সতীদাহ বন্ধ করার মানসে সে এই দম্পতির চাঁদোয়া ঘিরে দৌড়াদৌড়ি করে ভয় দেখায়। সীতারাম ভয়ে যশোবতীকে আলিঙ্গন করে। আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে যশোবতী কাজললতা হাতে 'দুষ্টকর্মা চণ্ডালের পথরোধ' করে। যশোবতী প্রশ্ন করে, তার কি মায়া দয়া নেই? হরিণনয়না যশোবতীর সুতপ্ত অশ্রুধারা দেখে, প্রশ্নের উত্তরে বৈজু বলে, 'আমি জাতচাঁড়াল, বলি মায়ামমতা কোথাকে পাব গো, ও সব তো বামুন-কায়েতের ঘরে মরাই মরাই···।' তীব্র বিদ্রূপে সে আঘাত করে সমস্ত বীভৎস আয়োজনকে, ছিঁড়ে ফেলে দেয় মিথ্যা নির্মোক আর উদ্ঘাটিত করে

ভিতরের গূঢ় স্বার্থপরতাকে। কন্যাপক্ষের শোভাযাত্রা আসতে দেখে সে ভয়ংকর ভাবে চেঁচিয়ে বলে, 'ওগো তোমাদের পুণ্যাত্মা বুড়ার কনে আসছে…।' বিবাহ হয়, এমন কি কড়ি খেলাও হয়— পুরাতন উর্ণনাভের মতো হাতখানি দিয়ে সীতারাম ক্রীড়াচ্ছলে যশোবতীর হাত আকর্ষণ করে বিবাহ-বাসরের উপযোগী গান গেয়ে ওঠে বৈজুনাথ – 'বিবাহ এক রক্তের নেশা / বরবউ যেন বাঘের মতো…।' এই বিসদৃশ বাসরে এই গান যে ভয়ংকরভাবে বেমানান, বিদ্রূপাত্মক আয়রনিক, তা সীতারামের সহচরেরাও বুঝতে পারে। এই গান গাওয়ায় কৃষ্ণপ্রাণ প্রভৃতি বাধা দিলে বৈজু আহত হয়ে খুব জ্ঞানী-ন্যাকা ভঙ্গিতে বলে, 'তা বাসরঘরে গোঁফচোমরানো গান হবে না ঠাকুর, এ কি হরিবিষ্ণু গান হবে…।' প্রকারান্তরে সে জানায়, বাসর-জাগার গান নয়, হরিবিষ্ণুর গানই মানানসই হবে। ঠিক এই ঘটনার প্রতিধ্বনি উপন্যাসে পরে আর একবার আমরা পাই। সীতারাম যশোবতীকে গান গাইতে বলায়, যশোবতী বেহাগ রাগিণীতে গান ধরে 'তৃণাদপি সুনীচেন' ইত্যাদি ভক্তিগীতি। সীতারাম এই গান শুনে রেগে গিয়ে তিক্তস্বরে বলে, 'হরিধ্বনি দাও না তার থেকে।' অপ্রস্তুত যশোবতী তখন বিবাহবাসরের উপযোগী গান গান ধরে 'যাই যাই লো আমায় বাঁশীতে কে ডেকেছে।' ঠিক সেই সময়ে, যেন সীতারামের পূর্ব-উক্তির সমর্থনে শ্মশানে 'হরিধ্বনির অট্টরোল উঠিল।' সে যাই হোক, 'বিবাহ এক রক্তের নেশা' গানের অনৌচিত্যের কথা কৃষ্ণপ্রাণ প্রভৃতি বললে আহত বৈজু সজল নেত্রে বলেছিল, 'চাঁড়ালের ঘরে জন্মেছি ঠাকুর, ন্যায় অন্যায় জানি না। তবু তুমি শেখালে গো।' আসলে সহজাত ন্যায়-অন্যায়বোধ তারই আছে। সে দেখিয়ে দেয়, উচ্চবর্ণের ন্যায়-অন্যায়বোধ বিকৃত, অস্বাভাবিক।

মৃতকল্প বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়ে যশোবতী যখন নিদ্রিত তখন 'ভাবের ঘরের চোর কনেবউ'-এর কাছ থেকে সীতারামকে অপহরণ করে বৈজু—কেননা 'ধুক ধুক করা নরদেহ' সে বড় ভালবাসে। জোর করে সীতারামকে নিয়ে অন্তর্ধান করে, গঙ্গার জলে নামতে থাকে, আর বলে "দোসর লাও শালা বুড়ো"। কিন্তু সীতারাম সজোরে তার কণ্ঠ বেষ্টন করলে সে বিপদে পড়ে যায়, অন্যদিকে নিদ্রোত্থিত যশোবতী অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে তাকে আঘাত করতে থাকে। নিরুপায় বৈজু সীতারামকে ফিরিয়ে এনে শুইয়ে দেয় তার শয্যায়, আর তীব্র বিদ্রূপে যশোবতীকে বলে "লাও ঘর কর"। পরে অবুঝের

মতো সীতারাম দুধ খেতে চাইলে যশোবতী অনন্যোপায় হয়ে বুনোদের ঘরে দুধ সংগ্রহে যায়। ফেরার পথে বৈজুর সঙ্গে দেখা। যশোবতী দুধ নিয়ে যাচ্ছে দেখে বৈজু বলে, "এখন বুড়োর গায়ে গত্তি লাগবে বটে…।" আরো মর্মান্তিক বিদ্রূপ পাই উপন্যাসের একেবারে শেষে। শ্মশানে পড়ে থাকা এক নরকপালকে বৈজু তার বউ বলে। সেই নরকপাল নিয়ে যশোবতীর মুখোমুখি হলে যশোবতী ভয় পায়। বৈজু বলে, "বুড়ো যদি তোমার ইহকাল পরকাল হয়, এই বা কি দোষ করলে গো কনেবউ।" এই উপন্যাসের প্রধান বিশিষ্টতা, সংলাপে-বর্ণনায় মর্মান্তিক আয়রনির ব্যবহারে–বিষাক্ত তীরের মতো তা আমাদের বিদ্ধ করে, বিমূঢ় করে। এই আয়রনির ব্যবহারে গড়ে ওঠে এই উপন্যাসের ঘোর বাস্তবতার টেন্‌শন। চম্পক ঈশ্বরীর মতো অনিন্দ্যসুন্দর সালংকারা যশোবতীকে নিয়ে কন্যাযাত্রীর দল যখন শ্মশানে প্রবেশ করছে, তখন অন্য এক শবের চিতা সাজানোর জন্যে একজন কাঠ নিয়ে সেই মিছিলে অজানতে ঢুকে পড়েছে। যখন শোভাযাত্রা আর শবযাত্রা একাকার হয়ে যায় তখন লক্ষ্মীনারায়ণ চাপা মন্তব্য করে 'যত অলুক্ষণে কাণ্ড'। কিন্তু যশোবতীর বিবাহের শোভাযাত্রা এক অর্থে শবযাত্রা-ই। 'ষড়ৈশ্বর্যময়ী দেবীমূর্তি'-র মতো যশোবতীর দিকে তাকাতেই উত্তেজনায় সীতারামের মুখ থেকে গাল-চোষার শব্দ বেরোতে লাগল, লালা গড়াতে শুরু করলো। এই প্রায়-মৃত পাত্রকে দেখে বাজনদারেরা বাজনা ভুলে গেল। 'কেহ ফুঁ দেয়, আবার হিক হয়, কেহ বেতালা ঢাক বাজায়, কাঁসি খন খন বাজিয়া উঠে।' তারপর 'যশোবতী বৃদ্ধকে দেখিয়াই চক্ষু তুলিলেন, সীতারামের পিছনে, নিম্নে প্রবাহিনী-গঙ্গা। দেখিলেন, স্রোতে গলিত দেহে শকুন বসিয়া মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহারই পার্শ্বে চক্রাকারে ঘুরিয়া কাক তাহাকে বিরক্ত করে। মালাবদলের সময় মন্ত্রচালিত পাষাণপ্রতিমা যশোবতীর হস্তধৃত মালা বৃদ্ধের কণ্ঠলগ্ন হল বটে, কিন্তু কাশির ধমকে সীতারামের হাতের মালা যশোবতীর কণ্ঠে ন্যস্ত না হয়ে হাওয়ায় ভেসে গেল এবং বৈজুর ছাগল তার সদ্ব্যবহারে মুখ বাড়াল। বিবাহের পুরোহিত কৃষ্ণপ্রাণ আরো এক রৌপ্যমুদ্রা দাবী করলে পাত্রীর পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ অসুবিধায় পড়ে বিব্রত বোধ করে। বৈজু মন্তব্য করে—"যাঃ শালা—পাকা ঘুটি বুঝি কাঁচে গো"—এবং ধার দিতে চায়। তার মন্তব্য, তার ধার দিতে চাওয়া—সব কিছুর মধ্যেই তার বিদ্রূপ ক্ষুরধার। লক্ষ্মীনারায়ণ ক্ষিপ্ত হয়ে "হারামজাদা ইতর চাঁড়াল" বলে গাল

দেয়। তখন উপদেশ দেয় কৃষ্ণপ্রাণ "কন্যাসম্প্রদানকালে ক্রোধ পরিত্যাজ্য" এবং আরো বলে "একমাত্র মুদ্রার ক্ষেত্রে জাতিবিচার চলে না এতদ্ব্যতীত শ্মশানে উচ্চনীচ ভেদ নাই।" ফলে লক্ষ্মীনারায়ণকে বৈজুর কাছে হাত পাততে হয়। বৈজু যে ভাবে টাকা দেয়, তার মধ্য দিয়েও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার উদ্ধত অবজ্ঞা। বিবাহের পরে সীতারাম নববধূকে গান গাইতে বলায় যশোবতীর পক্ষে হাস্যসংবরণ করা কঠিন হয়। সীতারাম তখন নিজেই গায় 'কি হে বাঁশী বাজায়, বধূ' এবং 'বলি পরাণ বাঁশী ফেলে দাও'—সঙ্গে হাতের ফেরতাই দেয়, তেহাই পড়ে, তারই সঙ্গে মর্মান্তিক আয়রনিক সংবাদ জানিয়ে দেন লেখক, 'সঙ্গে সঙ্গে হিক্কা উঠিল।' সীতারামের প্রস্তাবে স্বামীস্ত্রী চাঁদোয়ার তলায় বসে বাঘবন্দী খেলছে যখন, তখন খেলারই মধ্যে হঠাৎ শ্মশানের নিকট প্রান্ত থেকে ঘোর হরিধ্বনি শোনা যায়।

কেন এই বিদ্রূপ, কেন বারে-বারে এই নির্মম ব্যঙ্গ-পরিহাস? মৃত্যু দেখে-দেখে একদিকে যদিও অনাসক্ত বৈজুনাথ, অন্যদিকে তার অদম্য জীবনকামনা। মৃত্যু তার বড় প্রাণে ব্যথা দেয়—"মড়া দেখতে আমার বেজার নাই, সত্য, কিন্তু কেউ মরছে দেখলে বেজার লাগবে না!" সেই নরবসার গন্ধ-ভয়ংকর শ্মশানে, সদ্যযুবতী কন্যার বিবাহের শোভাযাত্রা, এই বিষম বিবাহের আয়োজন দেখে সে নিজের ললাটে চপেটাঘাত করে। ব্যঙ্গে করুণায়, মর্মান্তিক আর্তনাদে সে বলে "না শালা আমরা কাঁদি না, মুতি— চোখে ত জল নেই।" যশোবতীর দিকে বৈজু তাকায়—'ঘাসে মুখ রাখিয়া হরিণী যেমত চাহিয়া থাকে, সেইরূপ দৃষ্টি দেখিতে পাইয়া সে থ হইয়া গেল।' তার নিত্যকার কাজ চিতা সাজাতে সাজাতে তার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—যশোবতীর দিকে তাকিয়ে সে ঘোষণা করে, এই নারীর চিতা সে কিছুতেই রচনা করতে পারবে না। সমস্ত সত্তা তার এই সতীদাহের বিরুদ্ধতা করতে চায়, কিন্তু উচ্চবর্ণের মানুষগুলির আয়োজনের বিরুদ্ধে, বরং যশোবতীর বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে সে অসহায়। বৈজু কাতর চঞ্চল, প্রায়-অচেতন অবস্থায় প্রশ্ন করে "আমি কি ঘুম।...আমি কি ভূত। না না না...নিশ্চয় প্রেত · না আমি চণ্ডাল? হয়ত আমি চিতা।" উপন্যাসের শেষে যশোবতী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বৈজুকে যখন প্রশ্ন করে "তুমি কে?" তখন এই আধ্যাত্মিক প্রশ্নের জবাবে বৈজু বলে, "শেষ নিঃশ্বাস নিয়ে যে জীব বেঁচে থাকে, আমি সেই জীব গো ..।" দুজনের বারবার সংলাপ পাই আমরা—একদিকে চম্পকবর্ণা সুন্দরী, অন্যদিকে শ্মশান-

পরিচর্যাকারী নরদেহ। বৈজু অনুরোধ করে, অনুনয় করে, ভয় দেখায়। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ পরিহাস তার অস্ত্র। সেই অস্ত্র দিয়ে সে বদ্ধমূল সংস্কারের ভিত্তিতে ভাঙন ধরাতে চায়। পারে না, বারে বারে হেরে যায়। আর হেরে গিয়েও ট্র্যাজিক মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে ওঠে।

'গতরক্যাওলা' বৈজুর হাতে কত লোকের শবদেহ ঠেকা খায়, তার কোনো দরদ নেই—কিন্তু জ্যান্ত কেউ পুড়বে তা সে ভাবতে পারে না। "ওগো বাবু আমি ভাবের পাগল নই—আমি ভবের পাগল। তুমি পুড়বে চচ্চড় করে··· ভাবতে আমার চাঁড়ালের বুক ফাটছে গো···তুমি পালাও না কেনে।" বৈজুর এই আবেদনে যশোবতী সায় না দিলে, বৈজু বলে, যশোবতী না হয় সতী হবে, তার নামে কত মানত, কত নোয়া শাঁখা জমা হবে, অপুত্রকের পুত্র নির্ধনের ধন হবে, সতীর না হয় স্বর্গবাস হবে—কিন্তু তারপরেই ক্ষিপ্ত বিদ্রূপে সে প্রশ্ন করে, "হ্যাঁ গা কনেবউ, স্বগ্‌গটা কেমন গো—দুধ আলতায়?" শ'য়ে শ'য়ে সুন্দরী দেখেছে বৈজু, কিন্তু যশোবতীর মতো এমনটি দেখেনি। যশোবতীর সৌন্দর্যই তাকে এই আয়োজনের অন্যায় সম্বন্ধে আরো তীব্র তীক্ষ্ণভাবে সচেতন করে তুলেছে। অনুনয়ে যখন কাজ হয় না তখন প্রায় ডাকাতের মতো ভয় দেখায় বৈজু। ভুল বুঝে যশোবতী যখন তার দিকে গায়ের অলঙ্কার ছুঁড়ে দেয় তখন ক্ষুব্ধ অসহায়তায় 'মর' বলে সে অন্তর্ধান করে। কারণ সে তো গহনা চায় না, সে যশোবতীকে বাঁচাতে চায় মৃত্যুর আসন্ন আক্রমণ থেকে। বৈজুনাথ এক বিসদৃশ অবৈধ মিথুন দেখেছে, যে-মিথুন অন্যায় যুক্তিহীন, বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধ। সে সর্বপ্রযত্নে তাকে ব্যর্থ করতে উদ্যত। সে কখনো দম্পতির চাঁদোয়ার চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করে মুমূর্ষু বৃদ্ধ ও তার নবযুবতী স্ত্রীকে ভয় দেখায়। কখনো সনির্বন্ধ অনুনয় করে যশোবতীকে বলে—"এ আমি হতে দিব না গো· তুমি পালাও হে, দুনিয়াটা খুব বড় কনেবউ—দুনিয়াট খুব বড় বলতে, আমার কেমন রোমাঞ্চ হচ্ছে হে··· পালাও কনেবউ।" এই লোকচরাচর তার বহুদিনের সাঙাৎ, তার সঙ্গে তার বহুকালের প্রণয়—তাই 'পৃথিবীটা খুব বড়' বলতে সে বাস্তবিকই রোমাঞ্চিত হয়, সেই সুমহান বিরাটত্ব অনুভবে সে কিছুক্ষণের জন্য যেন বীতচেতন হয়। সে আবার যশোবতীর মুখোমুখি হয়, কঠোর প্রাকৃত ভাষায় বলে, ঐ ঘাটের মড়াটাকে সে যে স্বামী ভাবছে সেটা "মিছা মিছাই মিথ্যা হে কঠিন মিথ্যা গো।" মানুষ বড় ডাগর জীব, কাঠের বিড়াল দিয়ে ইঁদুর ধরে, অলীককে

সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করে ; কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি করে কী লাভ। যা মিথ্যা তা মিথ্যাই। তামসিক চণ্ডালের রাজসিক কণ্ঠ, সত্ত্বগুণ দীপ্ত বাক্যালাপের সাহায্যে বারে বারে এইভাবে প্রতিরোধ রচনা করে।

শুধু কথা দিয়ে নয়, কাজেও এই দুর্দান্ত চণ্ডাল একাই প্রতিরোধ নির্মাণ করে। নিদ্রিত যশোবতীর অজ্ঞাতে সীতারামকে গঙ্গায় ডোবাতে গিয়ে সে কার্যগতিকে ব্যর্থ হয়। স্বামীর নোংরা করে ফেলা কাপড় এবং নিজের অশুচিবস্ত্র কেচে যশোবতী যখন নৌকার আড়ালে নগ্ন হয়ে স্নানরতা, তখন সহসা বৈজু এসে উপস্থিত হলে বিমূঢ় যশোবতী ভূততাড়িতের মতো পালাতে উদ্যত হয়। কিন্তু বৈজু 'পরক্ষণেই যশোবতীর সুন্দর রূপলেখা, নশ্বর দেহখানি দুই হস্তে তুলিয়া ধরিল।' বিবস্ত্র অবস্থায়, বিশেষত নীচকুলোদ্ভব পরপুরুষের বাহুবন্ধনে লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে, ব্যথায়, ক্রোধে অপমানে যশোবতী বিহ্বল। বৈজু বলতে থাকে, "এখন তুমি শব ছাড়া কিছু নও।" শব, তাই এই নগ্নিকা সুন্দরী কোনো যৌনচেতনা জাগায় না তার মনে। আবার এই শবকেই সে জীবন দিতে চায় ; বৈজু তাকে বাঁচাবে, যশোবতী অভিশাপ দিতে গেলে সে জানায় দেহচিতায় যার মন পোড়ে তার গায়ে অভিশাপ লাগে না। ক্ষিপ্ত যশোবতী বলে, নিশ্চয় এই দুর্দান্ত চণ্ডালের কোনো অসৎ অভিপ্রায় আছে। যাকে বাঁচানোর জন্য সে সর্বস্ব পণ করেছে তার মুখে এই নিন্দনীয় ইঙ্গিত শুনে বৈজু রাগে অন্ধ হয়—"কি বল্লিস গো কনেবউ, তুমার মনে এই ছিল হে, শ্মশান আমার ঘরনী, আমি তার শ্বশুরঘর, ছি গো ছি, তুমি নারী কি পুরুষ তা আমি জানি না…।" তার মনে স্বয়ং শুকদেব বাস করে। তাই অত্যধিক ঘৃণ্য সামগ্রীর মতোই সে যশোবতীকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। হতাশ হয়ে যায় এইভাবে ব্যর্থশ্রম বৈজুনাথ। তার মনে হয়, 'আমি আমি' বলা আর সাজে না যশোবতীর—"তুমি কার আমি। তুমি তো এক প্রহরের শ্বাসটানা শব ; কাল এতক্ষণ চাঁদ যখন লাল, তখন লয়…।" বেঁচে থাকলে সহমৃতা হওয়ার নিয়তি থেকে যশোবতীর অব্যাহতি নেই বৈজু সে কথা বুঝে গেছে। অথচ যশোবতীর চরিত্রে সন্দেহ করে তাকে কুৎসিত ভাষায় "হারামজাদী নষ্ট খল শচ্চড় মাগী" বলে সীতারাম গালি দিলে, যশোবতী যখন গঙ্গায় আত্মহত্যা করতে উদ্যত, তখন 'গতরক্যাঙলা' বৈজুই তাকে বাঁচায়। বলে, "মরতে পারলে তুমি বাঁচতে"—কিন্তু মরতে দেয় না। মরতে দেয় না, কারণ জীবনের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি তার মজ্জায় মজ্জায়। সীতারামকে ঘিরে যারা শ্মশানে

সমবেত হয়েছিল, যাদের মুখমণ্ডলে কেশে ভস্মকণা, যারা ভূতপূজকের মতো প্রহরের পর প্রহর জেগে ক্লান্ত তাদেরও 'প্রত্যেকের মনে ইদানিং বাস্তবতাকে শ্মশানের ক্ষিপ্রতাকে অগ্রাহ্য করত আপন-আপন গৃহকোণের প্র'তচ্ছবি চিত্রিত হইয়াছিল।' মৃত্যুর সংসর্গে তারা ক্লান্ত, জীবনের স্পর্শ চায়। এমন কি মৃতপ্রায় সীতারামের চাকিকাঠি হস্তগত করা নিয়ে তার পুত্রের যে কুৎসিত বিবাদ তার মধ্যেও হয়তো জীবনের অমোঘ প্রহবমানতারই এক বিকৃত প্রকাশ পাই। জৈব জীবনাবাঙ্ক্ষা এমন কি সংস্কারচ্ছন্ন যশোবতীকেও উদ্বেলিত করে। গঙ্গার জলোচ্ছ্বাসে যশোবতী পুনঃ পুনঃ 'হে কৌন্তেয়, হে কৌন্তেয়' শুনতে পায়; কৃষ্ণ যেমন কৌন্তেয় অর্জুনকে, তেমনি যশোবতীর নিজেকেই নির্বেদ ত্যাগের পরামর্শ দিতে হয়। নিজের মনকে সে শান্ত স্থির করে রাখে বটে, কিন্তু মানসচক্ষে সতীদাহের অনুষ্ঠান – হরিধ্বনি, কাঁসরঘণ্টা, ব্রাহ্মণদের পাঁজীপাঠ, এয়োস্ত্রীগণের অনুষ্ঠান—কল্পনা করতে করতে যশোবতী একবার হতচেতন হয়ে গঙ্গায় প্রায় পতিত হয়।

এই জীবনতৃষ্ণারই এক বৈপরীত্যময়, প্রায় হাস্যকর, আয়রনিক রূপ দেখি মৃতকল্প সীতারামের মধ্যে। উদ্ভিন্নযৌবনা যশোবতীর হেমদেহস্পর্শে বৃদ্ধ সীতারামের গায়ে যেন মাংস লাগল। আবেগের রঙ্গে সে উচ্চারণ করতে থাকে 'বাঁচব বাঁচব', আর তার ফলে মুখের কষ দিয়ে তার লালা নিঃসৃত হয়। বাড়ি জমি সংসারের কথা নতুন করে মনে পড়ে যায় সীতারামের। অক্ষম শরীরে তার যেন জোয়াল ঠেলা ক্ষমতা ফিরে আসে। সীতারাম তার জন্যে কাতর হয়ে কাঁদছে দেখে সেই বার্ধক্যের অশ্রুর মধ্যে যশোবতী 'বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সঙ্গ, বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য, অন্তরঙ্গতা, মিত্রতা'-র স্বাদ পায়। মায়া মমতাবশে জরাজীর্ণ কালাহত স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করলে তাদের দেখে মনে হয় যেন আশ্লেষবদ্ধ পার্বতী পরমেশ্বরের প্রতিচ্ছবি। সেই আলিঙ্গন অবশ্য বৃদ্ধ সহ্য করতে পারে না। সীতারামের হাসির চেষ্টা যেন 'রক্তমন্থনকারী এক অদ্ভুত ধ্বনি, তবু সে হাসতে চায়। সীতারাম ভাবে এ জন্মে হল না, জন্মান্তরে সে যশোবতীকে নিয়ে আবার ঘর বাঁধবে। সে যুবকের মতো স্ত্রীর উরুতে চাপর দিলে 'রমণীর জরায়ু মহানন্দে মহুয়া-বেসামাল নৃত্য করিতে লাগিল।' সীতারাম ভাবে আবার হবে, সে বলে "বউ আমি আবার ঘর পাতব ...।... ছেলে হবে।" বৃদ্ধের এ হেন অহঙ্কারে স্থাবর ও জঙ্গমসমূহ এবং উলুধ্বনি করে। আর এই কথা শুনে 'ব্রীড়াবনত নববধূ মুহূর্তের...জন্য দিক্‌সমূহ এবং ত্রিলোক

লইয়া নিশ্চিন্তে কড়ি-খেলা করিলেন।' সীতারমের যে-জীবনতৃষ্ণা প্রথমে বিরূপতা, পরে কৌতুক জাগায়, পরে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি তা-ই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে আরম্ভ করে। যখন যশোবতীর দিকে তাকিয়ে আর মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়া স্বামীর মন কেমন করে তখন আর কৌতুকবোধে আমরা আচ্ছন্ন হই না। সীতারাম 'রাই জাগো রাই জাগো' ভোরাই গায়। এই বীভৎস পরিবেশেও তার ফুলশয্যা পাতার সাধ মনে জাগে। যশোবতীকে যেন প্রেমে, গভীর মমতায় বলে সে "বউ তুমি আছ বলে বড় বাঁচার সাধ হচ্ছে···।" সীতারাম আয়নায় মুখ দেখতে চায়, আর পৃথিবী দর্শন করে তার ভাল লাগে—মনে হয় বহুদিন পরে এই পৃথিবীকে দেখছে সে। বৈজু বালিয়াড়ির মধ্যে হঠাৎ পড়ে গেলে যশোবতী যখন হাস্য সংবরণে ব্যর্থ হয়, তখন সেই হাসির শব্দে সীতারামের মনে তীব্র ঈর্ষা জাগে, আর তাতে তার 'বার্ধক্য যেন যৌবদশা প্রাপ্ত হইল।' স্বামীর তিরস্কারে অপমানিতা যশোবতীর আত্মহত্যার চেষ্টা বৈজু ব্যর্থ করে দিলে, যশোবতী আবার স-নাথ হয়ে স্বামীর পাশে ঘুমিয়ে পড়ে। যশোবতীর ঘুম ভাঙলে অনুতপ্ত কাতর বৃদ্ধ বলে, "তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না তো" এবং "আমার কেউ নেই।" ফুলশয্যার কথা সে আবার যশোবতীকে মনে করিয়ে দেয় এবং লজ্জিত যশোবতী ফুল তুলতে যায়। এক অদ্ভুত অ্যাম্বিগুইটি, এক অপরূপ দ্ব্যর্থতা উপন্যাসের মর্মে-মর্মে রেখে যান কমলকুমার। জীবনকে ভালোবাসে বলেই সীতারাম-যশোবতীর বিবাহের বিরুদ্ধে সমস্ত সত্তা দিয়ে প্রতিরোধ করে বৈজু. অথচ এই বিবাহ হয় বলেই মরণোন্মুখ সীতারামের মধ্যে শেষ বারের মতো জীবনের প্রতি আসক্তি দুর্নিবার হয়ে ওঠে।

দুশো বছরের পুরোনো পটভূমিকায় লেখা কাব্যব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধশালী এই উপন্যাস পড়তে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'-র কথা মনে পড়ে যায়। হয়তো কাব্যব্যঞ্জনাময় ভাষার জন্যেই প্রধানত। 'ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব মূর্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি! কেশভার আবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশিকৃত, আগুলফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে।' তুলনীয় মনে হয় কমলকুমারের—'অনিন্দ্যসুন্দর একটি সালঙ্কারা কন্যা প্রতীয়মান হইল, ক্রন্দনের ফলে অনেক স্থানের চন্দন মুছিয়াছে, আকর্ণ বিস্তৃতলোচনা রক্তাভ, হলুদ প্রলেপে মুখমণ্ডল ঈষৎ স্বর্ণসবুজ। সর্বলক্ষণে

দেবভাব বর্তমান, ফলে সহজেই মনে হইবে এ যেন বা চম্পকঈশ্বরী, লক্ষ্মী-প্রতিমা।' অথবা কমলকুমারের 'এই মুখমণ্ডলের বর্ণচ্ছটায় উদাত্ত গম্ভীর বেদগান ছিল; এ বেদগানের মধ্যে যেমন আনন্দ, আনন্দের মধ্যে যেমন প্রণাম, প্রণামের মধ্যে যেমন পুষ্পের রহস্য, পুষ্পের রহস্যের মধ্যে যেমন সরলরেখা ···।'

কিন্তু আমাদের বিবেচ্য উপন্যাসে কোনো ঐতিহাসিক কাহিনী নেই, হয়তো এই আধুনিক উপন্যাসে প্রচলিত অর্থে কোনো কাহিনীই নেই। অমোঘ এক কাব্যের মতো তার কাহিনীর কোনো সারাংশ হয় না অন্তত। গল্পের শুরুতে শেষে একই রকম – ঘটনাপ্রবাহ নেই, চমক বা উৎকণ্ঠা নেই। ঘটনাপ্রবাহ বা প্রচলিত অর্থে কাহিনী 'অন্তর্জলীযাত্রা'-য় আমল পায় না। এই উপন্যাসের সমস্ত স্থানিক পটভূমি গঙ্গাতীরবর্তী শ্মশান— এই শ্মশানে স্বাহা-বিরহী লেলিহান শিখা দিঙমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত, সেখানে লক্ষ মায়া ছাই হয়ে যায়, লক্ষ তোড় খার হয়ে যায়। আর এই বালুকাময় শ্মশান ছুঁয়ে গঙ্গাধারা প্রবাহিত—'ইদানীং গঙ্গা, হাস্যময়ী···ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলমুন্থ জামরুও। ক্রমাগত জলজ পানা ভাসিয়া যাইতেছে, নিম্ন আকাশে ডানার হিলমিল, শূন্যতাকে অপহরণ করিতে আপনার সত্তা হারাইতেছে।' 'কপালকুণ্ডলা'র স্থানিক পটভূমি একজায়গায় স্থির নয়। তবু তার আরম্ভ সমুদ্র ও নদী-মোহনা তীরবর্তী বালুতটে—যেখানে 'আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জন আর কদাচিৎ বন্যপশুর রব।' এই উপন্যাসের শেষ গঙ্গাতীরের শশ্মানের প্রেতভূমে,—চৈত্রমাসের বায়ু অপ্রতিহত বেগে গঙ্গাহৃদয়ে প্রধাবিত হইতেছিল; তাগর কারণে তরঙ্গাভিঘাতজনিত কল-কলরব গগন ব্যাপ্ত হইতেছিল।' কাপালিক আর বৈজু দুজনেই যদিও শশ্মান-চারী, নরকপাল দুজনেই হয়তো খেলার সামগ্রী—কিন্তু তারা সগোত্র নয়। উপন্যাসেও তাদের সমান মূল্য নয়।

হয়তো উপন্যাসের পরিণামের বর্ণনার সাদৃশ্যেই একটি উপন্যাস অন্য উপ-ন্যাসটির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। পুষ্পলাবী যশোবতীর সঙ্গে নরকপাল নিয়ে বৈজু যখন কৌতুক পরিহাসময় সংলাপে নিরত সেই সময় হঠাৎ কী যেন শব্দ হল—'বায়ু স্থির, পাখিরা উড়িয়া গেল, ধরিত্রীর বক্ষে কে যেন হাঁটু ডলিতেছে। ত্রিলোক এক হইয়াছে। ওজস্বিনী বিশাল তরল সমতল শ্মশান দাম্ভিকভাবে আসিতেছে, মহাব্যোমে স্ফুলিঙ্গ উদ্যত।' পূর্ণিমায়, চাঁদ যখন লাল, যেদিন

দোসর নিয়ে চিরবিদায়ের কথা সীতারামের, সেদিন অতর্কিতে গুপ্তঘাতকের মতো কোটাল বান এসেছে। যশোবতী, পরিশ্রান্ত ঘর্মাক্ত অশ্বের মতো দ্রুত ছুটেছে—'জলপর্বত আসিতেছে, নিয়ে ফুলশয্যা, আর অপেক্ষমান বৃদ্ধ স্বামী।' বাণবিদ্ধ পাখির মতো কর্কশ করুণস্বরে সীতারামের 'বউ' ডাক শোনা গেল, বৈজুর হাত সজোরে ছাড়িয়ে যশোবতী ছুটলো। কিন্তু ততক্ষণে জলের আলোড়নে তৈজস ছত্রাকার, গুপ্তঘাতক জলস্রোত বৃদ্ধ সীতারামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারপর 'অল্পবয়সী ষড়ৈশ্বর্যশালিনী পতিপ্রাণা কর্তা-কর্তা বলিয়া প্রতিমার কাঠামো ছাড়িয়া জলে লাফ দিলেন। ক্রন্দন করিতে করিতে সন্তরণের বৃথা চেষ্টা করিলেন, দু'একবার কর্তা ডাক শোনা গেল। ইহার পর শুধু রক্তিম উচ্ছ্বাস। কেননা চাঁদ এখন লাল।' সীতারাম দোসর নিয়ে কোটাল বানের তীব্র জলস্রোতে ভেসে গেল। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঘটনাচক্র তাড়িত হয়ে নবকুমার আর কপালকুণ্ডলা, এই নিয়তিতাড়িত দম্পতি গঙ্গার উচ্চতটে এসে দাঁড়িয়েছিল। চৈত্রবায়ুতাড়িত বিশাল তরঙ্গের আঘাতে ভেঙে যাওয়া মৃত্তিকাখণ্ড নিয়ে কপালকুণ্ডলা ঘোর রবে নদীপ্রবাহ মধ্যে পড়ল। 'অন্তর্জলীযাত্রা'-য় স্বামীকে উদ্ধার করতে জলে নেমেছে স্ত্রী, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্যে জলে ঝাঁপ দিয়েছে স্বামী। নবকুমার সন্তরণে অপটু ছিল না। সাঁতার দিয়ে সে কপালকুণ্ডলাকে খুঁজলো। তাকে পেলো না, নিজেও উঠলো না। 'সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?' সীতারাম আর যশোবতী কোথায় গেল? আর 'দেহ-মায়াবন্ত' 'বাগ্দী-চণ্ডাল' বৈজুনাথ, সেই বা কোথায় গেল? কাল যাকে নিয়েছে সেই সীতারামের সঙ্গে নবোঢ়া যশোবতীর এই অদ্ভুত সহমরণ, সে কি অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলো, অথবা যশোবতীকে উদ্ধার করতে গিয়ে সে-ও কি কুটিল ভয়ংকর জলস্রোতে ভেসে গেল?

২৪ মাঘ, বুধবার

সকাল থেকে বেশ অসুস্থ। বৌদিকে একবার বলেছিলেন, প্রশান্ত ব্যানার্জীকে ডাকো। সকালবেলা আর বিছানা থেকে উঠতে পারেননি। রাত্রি দুটোর পর হঠাৎ বলেন, মাথায় লাগছে, মাথায় লাগছে, আমার খিদে পেয়েছে।

বৌদি উঠে কমপ্ল্যান ক'রে আনেন। শুয়ে শুয়ে দু-এক চামচ খান। তারপর আবার ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েন। বৌদি একা সে রাত্রে থাকলেন পাশে।

ভোর পাঁচটা নাগাদ আকাশ একটু ফরসা হয়ে উঠেছে। বললেন, 'মিছরির জল খাবো।' বৌদি বললেন, কমপ্ল্যান খাবে? শুনে বললেন, হ্যাঁ খাবো। বৌদি কমপ্ল্যান ক'রে আনলে, সামান্য একটুখানি খেলেনও। মশারির ভিতর শুয়ে ওইভাবে আচ্ছন্ন হ'য়ে রইলেন সকাল পর্যন্ত।

২৫ মাঘ, বৃহস্পতিবার

বেলা আটটার পর। কমলদার চিকিৎসা করছিলেন গত দেড়বছর ধরে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার এম. গাঙ্গুলী। তাঁর কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়ে কী খাবেন এসব জেনে খবর দিতে এলেন বৌদির ভাই রতন রায়।

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন একটু ভাত দিতে, যদি চটকে খাওয়ানো যায়। সলিড ফুড হিসেবে। ভাত না হ'লে ফলের রস। ডাক্তারবাবু নিজে এলেন না। তিনতলায় আসবেন না জানিয়ে দিলেন। অতটা উঁচুতে উঠতে পারবেন না। বৌদি গিয়ে কমলদাকে বললেন, রতন এসেছে। কমলদা আচ্ছন্নভাবেই বললেন, 'রতন এসেছে, রতন।' আবার চুপ। রতনবাবু চলে গেলেন।

কমলদার মঙ্গলবার থেকে গায়ে একটু জ্বর-জ্বর ছিলোই। একেবারে জ্বর ছাড়েনি কোনো সময়। ডাক্তার বলেছিলেন ভয়ের কিছু নেই, ভাত খাওয়াতে পা'রেন। সকালের দিকে এই আটটার পর একটু আবার কমপ্ল্যান খেলেন। ভাত খেতে চাইছিলেন না। বাড়িতেও রান্না বন্ধ। সকালের দিকে শুদ্ধ

একবার এসে ঘুরে যায়; বেলা বারোটা এরকম হবে। বৌদি হাতের নখ কেটে দিলেন। তখন সামান্য কিছু কথা বলেন। বৌদি বললেন, তুমি আমার কোনো কথা শোনো? তোমার নিজের ইচ্ছে ছাড়া করো না, করতে দাও না। দ্যাখো, কত তোমাকে বললাম বাইরে ঘুরে আসি, তুমি শোনো না। এখন শুনে বললেন, 'না, আমরা বাইরে যাবো। রিখিয়ায় যাবো।' বৌদি বললেন, রিখিয়ায় যাবার কথা কত বলেছি, তখন তুমি শোনো নি।

পায়খানা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো তিনদিন। মঙ্গলবার রাত থেকে কাপড় পেতে দিতে হ'তো বিছানায়। বিছানায় হিসি ক'রে ফেলছিলেন। আচ্ছন্ন হ'য়ে আছেন, বৌদি বললেন তুমি একটু সরো। শুনতে পেলেন না বোধহয়। সেইভাবেই পড়ে আছেন। এবার একটু জোরে বৌদি বললেন। ঠিক শুনতে পেয়েছিলেন। বললেন, 'তুমি আমাকে বকছো কেন? আমি তো এখন ছেলেমানুষের মতো। মা কি ছেলেকে বকে?' বৌদি বললেন, 'তুমি শুনতে পাওনি, তোমাকে আমি সরাতে চাইছিলুম, ভিজে কাপড় থাকলে, গায়ে জ্বর রয়েছে, আমি কি তোমাকে বকতে পারি?' আবার সেই আচ্ছন্ন ঘোরেই বলে চলেন কমলদা, 'আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা..., ক্ষমা।' ক্ষমা, ক্ষমা দুবারই বলেছিলেন। আর দুবার বলেছিলেন সেই ঘোরেই অজয়, অজয়। তারপর একবার 'অনেক করেছে' বলেন।

দুপুরে বৌদি পাশের বাড়ির শম্পাকে দিয়ে ফোনে ধরতে চেষ্টা করেন অজয়কে। তিনটে নাগাদ সাউথ পয়েন্ট স্কুল থেকে ইন্দ্রনাথ আর মালতী সেনগুপ্ত এলেন দেখতে। কী চিকিৎসা হচ্ছে ইত্যাদি সব জিজ্ঞেস করেন। যন্ত্রণায় কমলদা কখনো কখনো বিছানায় উঠে বসার চেষ্টা করেই শুয়ে পড়তেন। সে মুহূর্তেও সেইভাবে হঠাৎ উঠে বসার চেষ্টা করেন। জানানো হ'লো ইন্দ্রনাথ গুহ আর মালতী সেনগুপ্ত এসেছেন খবর নিতে, একথা জানাতেই বলেন, 'এখন স্কুল, এখন স্কুল?' বেশ রেগে বলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন।

আগে যে মেয়েটি কমলদার কাজ করতো, সেই শান্তি সেদিন আসে। শান্তিকে দেখে বৌদি বলেন, বড়ো ভয় করছে, দ্যাখ শান্তি, বাবুর এত ঘাম হচ্ছে কেন? বৌদি আর শান্তি কমলদার ঘাম মুছিয়ে দিতে থাকে। অসম্ভব ঘেমে উঠছিলেন মাঝে মাঝে।

অজয় এলো। শক্তি এলো। ডাক্তার ডাকা হ'লো। বিকেল চারটের পর

ডাক্তার এলেন নীলরতন হাসপাতালের। শুভ, প্রণব, এরাও এলো। শক্তি বললে হাসপাতালে পাঠানো ভালো, বাড়িতে হবে না। বৌদি তাঁর ছোট ভাই আর কমলদার বোনকে ফোন করতে বললেন। ডাক্তার এসেই বললেন, 'ওনাকে পি. জি.-তে নিয়ে যাই, আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করবো।' তারপর কয়েকটি ইন্‌জেকশন দেন।

শান্তি কমলদার ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছিল। শান্তিকে বললেন কমলদা, 'এই তোর মা কোথায় রে?' শান্তি বললো, 'মা ও-ঘরে।' কমলদা বললেন, 'ও-ঘরে মা কী করছে?' শান্তি, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছে।' কমলদা, 'ডাক্তার'। আর কোনো কথা নয়। চোখ বুজে আছে। মঙ্গলবার চোখ আধবোজা হ'য়েছিলো। ঠাণ্ডা লাগলে যেমন হয়। গরম জল দিয়ে চোখ ধোয়ানো চলছিলো। এ-সময়ে শান্তিকে বলেন একবার 'তুই আমার চোখটা খুলে দে।'

কমলদার ছোটবোনের স্বামী এলেন। তখন অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা চলছে। পাঞ্জাবীর হাত কাটা হ'লো, বুকও চিরে ফেলা হ'লো, যাতে পরানো যায়। ডাক্তারবাবু বললেন, 'কুড়ি ফোঁটা জল মুখে দিয়ে দিন।' বৌদি মুখে জল দিতে গেলেন, সব দিতে পারেননি হাত কাঁপছিলো। এবার বৌদির ছোট ভাই ডাক্তার অরুণ মিত্রকে নিয়ে এলেন। ডাক্তার মিত্র এসেই কমলদাকে দেখে বললেন, 'কোন রোগীকে নিয়ে যাচ্ছেন? কী আছে? সিঁড়ি দিয়ে, তিনতলা থেকে নামানো যাবে? পাল্‌স কোথায়?' ডাক্তার মিত্রকে বলা হ'লো, এ-সময় যা ভালো মনে হয় করুন। এই ডাক্তারবাবুও অনেকগুলি ইন্‌জেক্‌শন দিলেন পরপর। অক্সিজেন দেওয়া শুরু হ'লো।

অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা কোনোদিন পছন্দ করতেন না কমলদা। এ নিয়ে উনি বলতেন, ওঁর শরীরে হাঁপানি বহুদিনের। তাছাড়া ওঁর একধরনের বিশ্রী এগ্‌জিমা ছিলো, শক্ত ওষুধ খেলেই র‍্যাশ বেরুতো।

সারারাত অক্সিজেনের নল খুলে ফেলার চেষ্টা করছিলেন নাক থেকে। প্রচুর ঘাম হচ্ছিল। সে রাতে একজন নতুন ডাক্তারবাবুকে রাখা হ'লো ইন্‌জেক্‌শন দেওয়ার জন্যে। রাত বারোটা, ভোর চারটে, সকাল ছ'টায় ইন্‌-জেক্‌শন দেওয়া হ'লো।

রাত্রে বৌদির ভাই রতনবাবু আর ইন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন।

২৬ মাঘ শুক্রবার

ভোর হ'তে চলে গেলেন বৌদির ভাই, তারপর ইন্দ্রনাথ। শুক্রবার, সকাল। সাতটা নাগাদ, উনি বিছানায় নড়াচড়া করছিলেন। বৌদি জিজ্ঞেস করলেন, 'কমপ্ল্যান খাবে ?' বললেন, 'হাঁ খাবো, আমাকে দাও।' বৌদি কমপ্ল্যান ক'রে আনলেন। কয়েক চামচ খেলেন কমলদা। তার ঘন্টাখানেক পর বৌদি আবার জিজ্ঞেস করলেন 'একটু ফলের রস খাবে ?' কমলদা পরিষ্কার গলায় বলেন, 'হ্যাঁ খাবো, দাও।' এই তাঁর শেষকথা। শেষ খাওয়া ওই কমলালেবুর রস।

বৌদির মেজো বোন শিবানী দত্ত এলেন। উনি কয়েক চামচ ফলের রস খাওয়াতে চেষ্টা করলেন। তখন কমলদা কাউকে খুঁজছিলেন মনে হ'লো। বৌদি এসে আবার খাওয়ান দু-এক চামচ। খেলেন।

বৌদির হাতটা ঘষতে ঘষতে চুড়িতে হাত বুলিয়ে বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করছিলেন, ঠিক বৌদি খাওয়াচ্ছে কিনা। বৌদির তালুর ওপর দিক নিজের আঙুল বোলাচ্ছিলেন। সে সময় চোখের কোনে একটু জল এসেছিলো।

এবার ডাক্তার মিত্র এসে বললেন, আমি খেয়াল করিনি কাল চোখটা বন্ধ হ'য়ে আসছে। অনেকগুলো ইন্‌জেকশন দেন। উনি বলেন, আমি জানি ওনার এগ্‌জিমা আছে। সম্ভবত 'ডাকেড্রিন' এধরনের একটা ওষুধ দেন। দিয়ে বলেন, না দিয়ে উপায় নেই।

সকালের ইন্‌জেকশনের জন্যে নার্সের ব্যবস্থা হ'য়েছিলো, যদিও বা সে এলো, আবার সিরিঞ্জ আনতে ভুলে গেল। একটু দেরি হ'লো ইন্‌জেকশন দিতে। নার্স বিছানা ঠিক করলো, চাদর, রবার ক্লথ পাতলো। গায়ের চাপা সরাতে উনি ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেললেন'

এর মিনিট পঁত্রিশ পর নার্স বলে উঠলো, সব শেষ, শেষ হ'য়ে যাচ্ছে। মুখে গঙ্গাজল দিন। কানে ঠাকুরের নাম বলুন। বৌদি গঙ্গাজল দিলেন তিনবার। পাঁচবার থেমে থেমে বললেন কানের কাছে 'মাধব'। উনি পাঁচ-বারই 'মাধব' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস ফেলতে লাগলেন। ওই পাঁচবারই। নার্স বললে বুকটা ঘষে দিন। আস্তে আস্তে ঘষে দিচ্ছিল একজন। নার্স আবার বললে, শক্ত হাতে ঘষে দিন কেউ। শক্ত হাতে ঘষা হ'লো। ওঁর জোরে শ্বাস পড়লো। কণ্ঠার কাছটা কাঁপছিলো। স্তব্ধ হ'য়ে গেল। সময় তখন ছটো বাজতে দশ। ত্রয়োদশী তিথি, শুক্লপক্ষ। শুক্রবার। ২৬ মাঘ ১৩৮৫। কমলদা চলে গেলেন।

পত্রাবলি

খেলার বিচার। কৌরব।
খেলার দৃশ্যাবলী। গাঙ্গেয় পত্র।
অনিত্যের দায়ভাগ। আবর্ত।
বাগান দৈববাণী। গোলকধাঁধা ১/২। গ্রীষ্ম ১৩৮৩-গ্রীষ্ম
রোজনামা। জনসেবক।

ধারাবাহিকভাবে বেরুতে শুরু করে 'জনসেবক' পত্রিকায় ৬ ফাল্গুন ১৩৬৮ সালের রবিবার। প্রথম রবিবার 'সাহিত্যবিচিন্তা' শিরোনামে ছাপা হয় 'রোজনামা'। 'সাহিত্যবিচিন্তা' শিরোনামে অনেকের লেখা ছাপা হ'য়েছে জনসেবক পত্রিকায়। কমলকুমার মজুমদারের এই দীর্ঘ লেখা তার পরের রবিবার অর্থাৎ ১৩ ফাল্গুন থেকে আলাদাভাবে 'রোজনামা' শিরোনামে ছাপা হতে থাকে। ২০ ফাল্গুন, ২৭ ফাল্গুন, ৪ চৈত্র, ১১ চৈত্র, ১৮ চৈত্র, ২ বৈশাখ। এর মধ্যে একটি রবিবার ২৫ চৈত্র, তাঁর লেখা দেখতে পাইনি।

ভাবপ্রকাশ বিষয়ে।
প্রতীক জিজ্ঞাসা।
ঢোক্‌রা কামার।
একটি চিত্রনাট্যের খসড়া : বাংলার টেরাকোটা। কৃত্তিবাস।

আমাদের কথা

দয়াময়ী মজুমদার। কৃত্তিবাস।

কমলবাবু

সত্যজিৎ রায়। সমতট ৪১।

কমল মজুমদারের মানুষ ও ভাষা

আলোক সরকার। সমতট ৪১।

দৈত্যকাহিনী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

'অন্তর্জলী যাত্রা'র ঘোর বাস্তবতা

অশ্রুকুমার সিকদার। প্রত্যক্ষ প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা। মহালয়া ১৩৮৭

শেষ তিনদিন

সুব্রত রুদ্র। ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত